



চেরাণে জ্ঞান শরিফ
ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইম্মান আল-সুরেশ্বরী
শ্রাম: চুনকুটিয়া, পো: শুভাচ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইমান আল-সুরেশ্বরী রচিত গ্রন্থাবলি



১. মারেফতের গোপন কথা

২. মারেফতের বাণী

৩. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ১ম খণ্ড

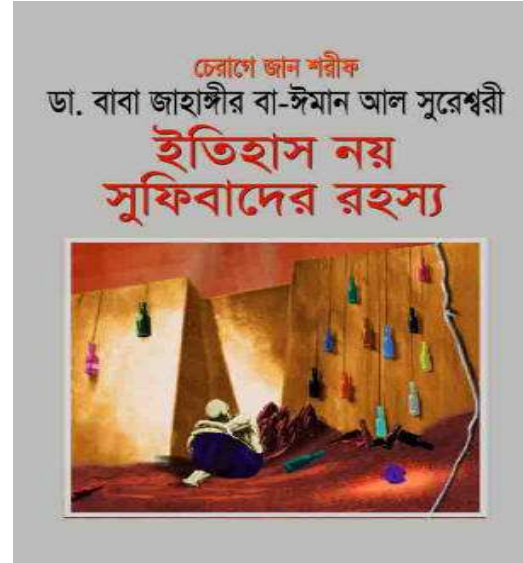
৪. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ২য় খণ্ড

৫. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৩য় খণ্ড

৬. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৪র্থ খণ্ড

৭. সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ- ৫ম খণ্ড

৮. কোরআনুল মাজিদের বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদ- ১ম খণ্ড



ইতিহাস নয় সুফিবাদের রহস্য

আজ হতে সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে থেকে প্রচলিত, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদরহস্যের পরিচয় জানবার মত ও পথকেই বলা হয় সুফিবাদ। জ্ঞানের স্বল্পতায় সুফিবাদটিকে যুগে যুগেই সংকীর্ণতার অবগুণ্ঠনে দ্বিযম্মাণ করেছে এবং সংকীর্ণতার দর্শনের উপর সার্বজনীন সুফিবাদ

দর্শনটির প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। কেয়ামত দর্শনটি না বোঝার দরুনই বারবার হোঁচট খেয়েছে মানবসভ্যতার ইতিহাসে। পাবার দর্শন তথা ভোগের দর্শন এবং হারাবার দর্শন তথা ত্যাগের দর্শন-দুটি দুই প্রান্তে অবস্থান করে। ভোগের দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে ত্যাগের দর্শনটির কথা বলা অনেকটা হাস্যকর। সুফিবাদের দর্শনে বৈষয়িক সুখ ও সম্পদ থাকে না, বরং প্রতিটি ধাপে ধাপে ত্যাগের কোরবানি করে অগ্রসর হতে হয়। সুতরাং এই সুফিবাদী দর্শন খুব কম লোকেই গ্রহণ করে নিতে পারে। বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইসলামি গবেষক এবং সুফিবাদই যে আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ এ-দর্শনের অন্যতম পথিকৃৎ এবং এই সুফিবাদী দর্শনের যিনি জ্বলন্ত সূর্য, আসরায়ে মাজ্জুব, হেরমায়ে আবদাল, জানজিরে বেখুদি, সাগীরে আজম, নূরে তাবাস্‌সুম, নিগাহে সারাপা, দায়ারে লা সানি-এ জাদিদ, শাহ সুফি সাইয়েদ মাওলানা বাবা সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীর নামে এই বইটি উৎসর্গ করে গেলাম।

একটি ঘোষণা

যে কেহ এই বইটি ছাপাইয়া যে কোনো দামে বিক্রি অথবা প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে লেখক ও প্রকাশকের পক্ষ হইতে কোনো প্রকার আপত্তি রহিল না এবং থাকিবেও না। কারণ, এই বইটির মালিকানা লেখক নিজ হইতে সজ্ঞানে সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো দেশের মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান এবং অন্য যে কোনো ধর্মের অনুসারীদেরকে সম্মানভাবে অধিকার দিবার প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া গেলেন। তাছাড়া দৈনিক, সাপ্তাহিক, পার্শ্বিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং যে কোনো সাময়িকীতে এই বইয়ের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লেখকের নামে অথবা যে কোনো কারো নামে ধারাবাহিকভাবে ছাপাইতে পারিবেন। এতে লেখকের বা প্রকাশকের কোনো প্রকার আপত্তি থাকিবে না। যদি কেহ কোনোদিন বইটির মালিকানার মিথ্যা দাবি তোলেন, তাহা হইলে সেই মিথ্যা দাবি সর্বস্থানে, সর্ব আদালতে বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

আরও উল্লেখ থাকে যে, এই বইটি পৃথিবীর যে কোনো দেশের যে কোনো ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপিতে পারিবেন।

কোরান অনুবাদ প্রসঙ্গে

সর্বপ্রথম আমরা বিশাল ৯০ খণ্ডের কোরান তফসিরটির আগে হুবহু অনুবাদটি এই জন্য প্রকাশ করতে চাই যে, আপনারা কোরানের আর দশটি অন্যান্য অনুবাদগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন, দেখতে পাবেন অনুবাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমরা এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে চেষ্ঠা করছি যে, কিছুতেই মনগড়া অনুবাদ করবো না। যা কোরানে আছে তা হুবহু তুলে ধরে পাঠক সমাজকে দেখিয়ে দিতে চাই যে, কোরানের অনুবাদেই কতো গরমিল! এই জন্য যতোটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব সেইটুকু প্রচেষ্ঠা। অনেক অর্থব্যয়ে পৃথিবী বিখ্যাত আরবি ডিকশনারি এবং কোরানের লোগাতসমূহ সংগ্রহ করতে চেষ্ঠা করেছি। যেমন-জে বি হাবা, হেস ওয়েরি, মিলটন, স্টিফিংগাস এবং রহিবাল বাকী প্রণীত আরবি ডিকশনারিগুলি পর্যন্ত কাছে রেখে খুব সাবধানে অনুবাদ করেছি। তারই নমুনা হিসাবে সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ-এর দ্বিতীয় খণ্ডে একটি মাত্র কোরআনের সূরা নজমের অনুবাদ তুলে ধরার পর অনেকেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। যদি আপনারা মনে করেন যে, এ রকম একটি কোরানের অনুবাদ-গ্রন্থের খুবই প্রয়োজন তা হলে আমাদেরকে সাধ্যমত আর্থিক

সাহায্য করতে পারেন অথবা কোরবানির পণ্ডর চামড়ার মূল্যটি
সাদকাকল্পে দান করতে পারেন।

লেখকের কিংবদন্তীতুল্য অপর রচনাটি হলো কুরআনুল কারীমের শব্দভিত্তিক
অনুবাদ ও তফসির তাফসীরে কুরআনুল কারীম আত্‌তাহহীম আল আসরী
আল মুনায্ভার আল আসাসীল উলুম আল জাদীদ ওয়া আল ফালসাফা আল
ইসলামীয়া মিন মুফাস্সেরে জাম্মান-

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইম্মান আল-সুরেশ্বরী

৯০ (নব্বই) খণ্ডে সমাপ্ত

(পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কুরআনের তফসির)

[বি. দ্র.- আর্থিক সাহায্য ছাড়া একার পক্ষে ছাপানো অসম্ভব।]

ডা. বাবা জাহাঙ্গীর বা-ইম্মান আল-সুরেশ্বরী রচিত গ্রন্থাবলি
বইগুলো এবং ডা. বাবা জাহাঙ্গীর প্রদত্ত ওয়াজের ক্যাসেট, অডিও ও
ভিডিও সিডি খুচরা এবং পাইকারি পাওয়ার ঠিকানা :

সুফিবাদ প্রকাশনালয়
প্রযুক্তি : বে-ইম্মান হোমিও হল
১০৮ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (২য় তলা) ঢাকা-১২০৫।
মোবাইল-০১৭১১১২৮১৬৯

লেখকের প্রকাশিত বইয়ের প্রাপ্তিস্থান
বই বিচিত্রা, ৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা।

র‍্যামন পাবলিশার্স, ২৬ বাংলাবাজার, ঢাকা।

বইপত্র, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

একুশে, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

পাঠক সমাবেশ, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

বিদিত, আজিজ মার্কেট, শাহবাগ ঢাকা।

ক্যামেলট বুক স্টল, কমলাপুর রেল স্টেশন, ঢাকা।

সৃজনী, কমলাপুর রেল স্টেশন, ঢাকা।

সাগর পাবলিশার্স, বেইলী রোড, ঢাকা।

বিদ্যা ভবন, বেইলী রোড, ঢাকা।

সূফী বুক ডিপো, ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা।

সুমন লাইব্রেরী, নিউ মার্কেট, ঢাকা।

গ্রন্থকলি, নিউ মার্কেট, ঢাকা।

বুক মার্ট, নিউ মার্কেট, ঢাকা।

নিউ বুক সোসাইটি, নিউ মার্কেট, ঢাকা।

এ. বি. বুকস, নিউ মার্কেট, ঢাকা।

বুক স্টল, নিউ মার্কেট, ঢাকা।

কাশফী, শান্তিনগর, ঢাকা।

ঢাকা লাইব্রেরী ও স্টেশনারী, শান্তিনগর, ঢাকা।

উত্তরের অপরাগতায়

ইসলাম ধর্ম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান, না কি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-দর্শন? যিশুখ্রিস্ট কি খ্রিস্টান, না মুসলমান ছিলেন? যিশুখ্রিস্ট কি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করেছেন, না ইসলাম ধর্ম? মুসা কি ইহুদি ধর্ম, না ইসলাম ধর্ম প্রচার করে গেছেন? ইসলাম ধর্মের আরম্ভ কি মোহাম্মদ হতে, না প্রথম মানব আদম হতে? যদি আদম হতে ইসলাম ধর্মের শুরু হয়ে থাকে তবে কেন প্রচার করা হয় যে, মোহাম্মদ হতে ইসলাম ধর্মের আরম্ভ? প্রত্যেক জাতির জন্য রসূল পাঠানো হয়েছে সেই জাতির ভাষায়-কোরানের এই চিরন্তন ঘোষণায় কী বুঝাতে চেয়েছে? সেই অনেক অনেক জাতিতে পাঠানো অনেক অনেক রসূলেরা অনেক অনেক ভাষায় কি ইসলাম ধর্ম প্রচার করে যান নি? আল্লাহর রসূলেরা কি ইসলাম ধর্ম প্রচার না করে অনেক ধর্ম প্রচার করেছেন, নাকি একটিমাত্র ইসলাম ধর্মই প্রচার করে গেছেন? মুসাকে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিত পুরুষ তথা অবতার বলে ইহুদিরা যেমন প্রচার করেন, তেমনি যিশুখ্রিস্টকে খ্রিস্টানরা, মোহাম্মদকে মুসলমানেরা, বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধকে, হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণকে, পার্শ্বরা জরথ্রাসকে, শিখেরা গুরু নানককে : এভাবে সবাই তাদের অবতারকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা

করে কোন ধরনের মজা পায়? এর ফলে কি মারামারি, হানাহানি উঁকিঝুঁকি দেয় না? সার্বজনীনতার বাণী কি সংকীর্ণতার যুপকার্ঠে মনের অজান্তে কাটা হচ্ছে না? এই প্রশ্নগুলো অধম লেখকের নয়, বরং অনেকেই অধম লেখককে প্রশ্ন করেন। উত্তরের অপারগতায় ছাপার অঙ্করে সবার কাছে তুলে ধরলাম। আর সেই সঙ্গে বাবা জ্ঞান শরীফ শাহ সুরেশ্বরী রচিত এই বইগুলো পড়তে অনুরোধ করলাম : ১. সিররে হক জামে নূর, ২. নূরে হক গঞ্জ নূর, ৩. মাতলাউল উলুম, ৪. লতায়োফে সাফিয়া, ৫. আইনাইন, ৬. সফিনা-এ সফর।

একটি বৈষয়িক দুঃখ

আমার (লেখকের) বাড়িতে আসা-যাওয়ার মাত্র একটি পথ, যে পথ দিয়ে আড়াই শত বছর ধরে আমার পূর্বপুরুষ সবাই যাতায়াত করতেন। সেই পথটি তিন বছর পূর্বে সহসা একদিন মাত্র একজন জোর করে বন্ধ করে দিল। দুই-দুইটি চেয়ারম্যানের কাছে নালিশ করলাম এবং আশ্বাসও পেলাম। গ্রামবাসী সবাই অবাক বিস্ময়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন, কিন্তু আজও পথটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। চাচাদের বাড়ির ওপর দিয়ে আমরা এবং ভক্তবৃন্দ যাতায়াত করছি। কিন্তু

কতদিন এভাবে চলবে? সবাইকে এই দুঃখজনক বিষয়টি এ জন্য জানিয়ে রাখলাম যে, হয়তো কেউ না কেউ একদিন বিষয়টি সুরাহা করার জন্য মানবিক কারণে এগিয়ে আসবেন। সত্য বলতে কি, আমরা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির বলেই এ রকমটি করতে পেরেছে। কলঙ্কজনক ইতিহাস হয়ে থাক পাঠক ও ভক্তবৃন্দের কাছে আমার গ্রাম চুনকুটিয়া। সবাই জানুক একজন ক্ষুদ্র গবেষকের জন্মভূমির একটি বৈষয়িক দুঃখ। সবাই জানুক গবেষকের পিতা, কেরাণীগঞ্জ উপজেলার প্রথম এম. এ., বি. টি. মরহুম হেলাল উদ্দিন আহমদের বাড়ির একমাত্র রাস্তাটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, যে রাস্তা দিয়ে বাবার বন্ধু পল্লীকবি জসিম উদ্দিন আর শিক্ষাগুরু ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এ বাড়িতে এসেছিলেন। কবি জসিম উদ্দিনের লিখা দু'টো লাইন বাবার কবরে আজও স্থিতি হয়ে আছে—

কঠিন জীবন-পথের অক্লান্ত সৈনিক
হেলাল ঘুমায় হেথা চির-নিভীক।

যারা আমাদের প্রকাশনার জন্য সাহায্য করতে চান তাদের জন্য বলছি

যদি আপনারা মনে করেন যে, সুফিবাদের উপর রচিত বইগুলোর ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন এবং সুফিবাদই দিতে পারে অস্থির জীবনে একটু আত্মার শান্তি, তা হলে আপনারা আমাদেরকে আর্থিক সাহায্য করতে পারেন। সেই সাহায্যটি যদি কোরবানির চামড়ার দামটি হয় তা হলে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারবো। কোরবানির চামড়াটি আপনার জন্য যেমন নাজায়েজ সে রকম আমাদের জন্য ডবল নাজায়েজ। কিছু আপনাদের ছোট ছোট দানে আমরা আরও প্রচার করতে পারবো। আমরা ইতিমধ্যেই আখাউড়ায় অবস্থিত কল্লা শহিদের মাজারের ঊরস শরিফে এক হাজার বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছি। আমার ছোট ছেলে বেদম ওয়ারসীকে অনেকেই বইয়ের দাম দিতে চেয়েছেন, কিছু দাম না নিয়ে আর্থিক সাহায্য করার আবেদন জানিয়েছে। বেদম ওয়ারসী বাংলাদেশের অনেক মাজার জেয়ারত করতে যায়। আমার কিছু ভক্ত সঙ্গে নিয়ে বইয়ের বোঝা নিজেরাই বহন করে মতলবের বেলতলীতে অবস্থিত হজরত বাবা সোলায়মান

শাহ আবদুহর মাজার, বাস্তারামপুরে অবস্থিত হজরত বাবা রাহাত আলী শাহের মাজার, হজরত বাবা গণি শাহের মাজার, নবীনগরের দুবাচাইলের জিন্দা ওলি হযরত বাবা মোখলেস শাহ, শ্রীনগরের ফুলকুটির বাবা আবদুল শাহ, সিরাজদিখানের নিয়ামতউদ্দিন মস্তান (নিমুটান শাহ), বাবা টান মস্তান, ভাওরভিটির জুফকিরের মাজার, বাঘাইরের জিওন ফকির, ভাগনার জুব্বার ফকির, দাগনভূঞার শাহা পীর চিশতী নিজামী, সেনবাগের গাজী বাবার মাজার, রায়পুরার মিসকিন শাহ, মীরেরসরাইর আমানটুলী দরবার, বগুড়ার মহাস্থান গড়, জয়পুরহাটের কালাই থানায় অবস্থিত বাবা গফুর শাহ চিশতী, ক্রেতলালের শাহ জামালের মাজার, কুষ্টিয়ার লালন শাহ, পাঞ্জু শাহ, খোদা বকশ, মহীন শাহ, দুদ্দু শাহ, রাজশাহীর বাবা শাহ মখদুম, বাঘার বাবা দানেশমন্ড, টাপাইনবাবগঞ্জের সোনা মসজিদের বাবা নিয়ামত শাহের মাজার, কাহালুর বাবা কালু শাহ, নরসিংদীর বাবা কাবুল শাহ, বাবা দেওয়ান শরিফ, বাবা পেশোয়ারী, বাবা ইউসুফ

চিশতী, বাবা কফিল উদ্দিন শাহ, মনোহরদীর বাবা মোজাফ্ফর মস্তান (পাগলা মৌলভী), বেলাবোর বাবা শাহ ইরানীর মাজার, কুলিয়ার চরের বাবা আবু আলী আখতার শাহ কলন্ডর, ডেরবের

কালিকাসাহের বাবা সিরাজ মস্তান, শিবপুরের গরীবুল্লাহ কারী, বরমীর রাজামাটির গরীবুল্লাহ শাহ সিরাজী, টঙ্কীর পাগারের বাবা হায়দার শাহ, বারইচার বুলবুল শাহ, শিবপুর থানা সংলগ্ন বাবা নিধুমিয়া শাহ, নরসিংদীর লক্ষঘাটের কাছেই পাগলা মৌলবীর মাজার, আড়াই হাজারের বেনজীর হক চিশতী, পটুয়াখালীর কলাপাড়ার নিশানবাড়িয়া দরবার শরিফ, নুরুল্লাপুরের সানাল ফকির, বাইমাহাটির দাগন শিকদার, বাস্তার পরান ফকির, শুজাপুরের বাকী মৌলবী, ঝিটকার কসের শাহ, জিন্দা শাহ, রশীদ শাহ, বাঠুইমুড়ির আফা পাগলা, মানতার কানু পরামানিক, বজার নগরের পাঁচু ফকির, কুকুরহাটির তবিবুর রহমান, আলালপুরের বাবা সালাম ফকির, সাতকানিয়ার মীর্জাখিল দরবার শরিফ, কাঞ্চন নগর দরবার শরিফ, কয়ারশাহী দরবার শরিফ, আউলিয়াপুরের বাবা কালু শাহ দেওয়ান, আমতলীর কুতুবপুর দরবার শরিফ, পটুয়াখালীর হক দরবার শরিফ, মীর্জাপুরের গোড়াই খানকা শরিফ, কিশোরগঞ্জের বাউতি শরিফ, বগুড়ার ঠনঠনিয়া দরবার শরিফ, পটিয়ার আমীর ভাণ্ডার শরিফ, কুমিল্লার দারুল আমান দরবার শরিফ, সিরাজগঞ্জের ওয়ারসী দরবার শরিফ, সিরাজদিখানের দরবারে শাহী কদমী, এভাবে বহু পীর সাহেবদের মাজারে ওরসের সময় বিনামূল্যে বই বিতরণ করে চলছি। যারা কেবলমাত্র ফকিরি

লাইনের তাদের হাতেই তুলে দিচ্ছি। এভাবে সারা বাংলাদেশে বই বিতরণ করতে গেলে কতো বইয়ের প্রয়োজন তা আপনারা ভালো করেই বুঝতে পারেন। ফকিরদের কথা ফকিরেরাই বোঝে, অন্যরা হাসে। তাই ফকিরি লাইনে যারা বিশ্বাসী এবং ভক্ত যদি মনে করেন যে, বইগুলোর প্রচার হওয়া প্রয়োজন তাহলে কি কিছু দান কিছু খয়রাত চাইবার সামান্য অধিকারটি দাবি করতে পারি না? এতগুলো কথা বলার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, যার যার বিবেকের উপর একটি হাল্কা বোঝার দায়িত্ব মনে করিয়ে দেওয়া।

যাঁদের আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে সব সময় মনে করি

প্রথমতই আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি পরম পূজনীয় শাহ সুফি সৈয়দ সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীকে, যিনি আমার আপন মেঝে চাচা। আমি বাল্যকালে আমার জন্মদাতা, কেরানীগঞ্জ উপজেলার প্রথম এম. এ., বি.টি হেলাল উদ্দিন আহমদকে আজ হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে হারিয়েছি। সুফিবাদের উপর ধ্যান-ধারণার উৎসাহটি পেয়েছি এবং হাঁটি হাঁটি পায়ে সুফিবাদের দিকে অগ্রসর

হয়েছি যঁার কারণে, তিনি আমার জগতগুরু আপন চাচা শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী।

আমার একটি খারাপ অভ্যাস ছিল, আর সেই খারাপ অভ্যাসটি হলো, প্রতিদিন দশ-পনের ঘণ্টা লেখাপড়া করতাম। এই জন্য আমাকে আমার বন্ধুরা বইয়ের পোকাও বলত। আমি প্রচণ্ডভাবে নিরপেক্ষ একজন মানুষ। সত্যসন্ধানের পথে কোনো মতবাদের সাইনবোর্ড আমার কাঁধে তুলতে দেই নাই। তবে যুক্তির পেছনেও যে অনেক বোবা যুক্তি দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে, সেটা বিশেষ রহমত ছাড়া জানা যায় না। ইহদি ধর্মের মোল্লা-মুফতিরা যিগুকে শুলীতে চড়িয়ে বলেছিল যে, আমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি মৃতকে জীবিত করতে পার; কিন্তু এবার আমরা তোমাকে শুলীতে চড়িয়েছি এবং আমাদের এই শুলী হতে যদি বেরিয়ে আসতে পার তবেই ধরে নিব, তুমি সত্য নবী। কিন্তু যিগু সেই শুলী হতে বেরিয়ে আসেন নি। এই যুক্তিটিতে যুক্তি আছে বটে, কিন্তু সত্যটি নাই। কেন নাই? যদি সত্যিই যিগু সেই শুলী হতে বেরিয়ে আসতেন তাহলে সবাই মুসলমান হয়ে যেত এবং সবাই মুসলমান হয়ে গেলে আল্লাহ পাকের ‘তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছি’-কথাটির সৌন্দর্য আর থাকে না। অথচ যুক্তির কথাগুলোর বাঁধন বড় শক্ত। এবং এই যুক্তির শক্ত বাঁধনের ফাঁদে পড়ে অনেকেই ইমান হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু এই

শক্ত যুক্তির ডেতরে যে বিন্দুমাত্র সত্য নাই, বরং যুক্তির ডুগডুগি বাজিয়ে, যুক্তির ডেলকিবাজি দেখিয়ে, যুক্তির যাদু দেখিয়ে হিপনোটাইজ করে ফেলে। পূর্বজন্মের কর্মফলের উপর ভিত্তি করেই তকদিরটি দাঁড়িয়ে আছে। এই তকদির যে স্থানের উপযুক্ত সেখানেই নিষে যাবে। এটাই তকদিরে মোবরাম তথা যে তকদিরের আর বদল হয় না।

শাহ সুফি সৈয়দ সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীর মত একজন ইসলাম গবেষক এবং গুরু এই পৃথিবীতে কখনই পাওয়া যায়। তাঁর রচিত কোরানের তফসির তিন খণ্ডে বাজারে পাওয়া যায়। তফসিরটির নাম দিয়েছেন কোরান দর্শন। কত গভীর চিন্তার প্রতিফলন ঘটতে পারে তারই এক বিস্ময়কর নিদর্শন হলো এই রচনা। আমি অধম তাঁর মুরিদ হই নাই সত্য, কিন্তু উনিই আমার প্রথম শিক্ষাগুরু। শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ১৯১৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ কাজিম উদ্দিন চিশতী এবং মাতা বেগম ইয়ারন নেছা। উনি পর্দা গ্রহণ করেন তথা ইন্তেকাল করেন ২০০৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর। আমরা অনেকই জানি, মহানবীর আবির্ভাব ও পর্দাগ্রহণ ১২ই রবিউল আউয়াল। মওলাউল আলা বাবা সৈয়দ জান শরীফ শাহ সুরেশ্বরীর জন্ম ও ওফাত দিবসটি ২রা অগ্রহায়ণ। আমরা জানি, বেগম রোকেয়ার জন্ম এবং মৃত্যুদিবসটি ৯

ডিসেম্বর। কিন্তু চোখের সামনে বাস্তবে দেখতে পেলাম, একই দিনে জন্ম এবং মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটে গেল শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমেদ চিশতীর জীবনে।

তারপর আমি স্মরণ করি গাউসুল আজম বাবা ভাণ্ডারীর আওলাদ শাহ সুফি সৈয়দ মজিবুল বশর সাহেবকে। তাঁর ভালোবাসার ছোট খাট ঘটনাগুলো কোনদিন কোনকালেও ভুলতে পারি না। আমার স্বী বাবা ভাণ্ডারীর গোলাম এবং খেলাফত পেয়েছিল। বাবা ভাণ্ডারীর আওলাদ গাউসুল আজম বাবা মজিবুল বশরের কদম মোবারকে যদি অধমের স্থান হয় তো জীবন সার্থক মনে করব।

একটি আবেদন

আমরা মোরাকাবা-মোশাহেদার তথা ধ্যানসাধনার একটি স্কুল খুলেছি নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের নৌকাঘাটা গ্রামে। সম্ভবত বাংলাদেশের কোনো পীর-ফকির এ রকম একটি স্কুল খোলেন নি। আপনাদের, বিশেষ করে সুফিবাদে বিশ্বাসীদের নিকট আর্থিক সাহায্য কামনা করি।

কেরানিগঞ্জ উপজেলার অতি উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণকারী আমার শিক্ষাপ্তরু
জনাব লুৎফর রহমান চৌধুরী এম. এ (ইংরেজি), এল. এল. বি.-কে
সামান্য একটি রচনার পাশেই রেখে দিলাম

পরম পূজনীয়। পীরপূজারী। সুফিবাদের আদর্শে জীবন ও দর্শন অবগাহন
করেছেন। লা-মোকামে খোদার অবস্থান, এটা সবারই কমবেশি জানা। কিন্তু
জিন ও মানুষ নামক দু'টো প্রাণীর মাঝেই যে খোদা জাতরূপে লুকিয়ে আছেন,
এটা বোঝা কষ্টকর। যারা বুঝতে পারেন তারা সুফিবাদে আসতে বাধ্য।
কোরানে খোদা বলেন যে, আমরা তোমাদের জীবন রগের (শাহারগের)
নিকটেই আছি। এই থাকার জন্যই মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। খোদা কখনো
অন্য কোনো জীব-জন্তুর শাহারগের নিকটে থাকেন না এবং থাকবার আইনটি
কোরানের একটি আয়াতেও নাই। এমনকি পাহাড়-পর্বত, নদী আর সাগরের
নিকটে আছেন, খোদা এ কথাটিও বলেন নি। আর সমস্ত সৃষ্টিরাজ্য, তা যতই
বিশাল ও ব্যাপক হোক না কেন, খোদা নিকটেই আছেন-এ কথাটি বলা হয়
নি। তাই সমস্ত সৃষ্টিরাজ্য সীফাত তথা গুণাবলি। খোদার এই জাত ও সীফাতের
ফর্মুলাটি জানা না থাকলে কেমন করে ইসলাম গবেষক হয় এবং পীর-ফকির
হয় তা আমাদের জানা নাই।

নফস তথা প্রাণ তথা জীবাত্মা আর রুহ তথা পরমাত্মা দু'টো সম্পূর্ণ
আলাদা বিষয়। ইহা কখনোই এবং কোনো অবস্থাতেই এক বিষয় নয়।
কারণ, নফস তথা প্রাণ তথা জীবাত্মা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু রুহ

তথা পরমাত্মার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার কথাটি কোরান বলে নি। নফস জন্মগ্রহণ করে, তাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। যে নফসটি জন্মগ্রহণ করে সেই নফসটি জন্ম দিতেও পারে। নফস জন্মমৃত্যুর অধীন যেহেতু, সেইহেতু বিশ্রাম, পরিশ্রম, ক্লান্তি, অবসাদ, ঘুম, খাদ্য-পানীয় গ্রহণ, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি লোভনীয় বিষয়গুলো আর্কৈপ্তে তথা গিরায় গিরায় বাঁধা থাকে। রুহ তথা পরমাত্মা এই জাতীয় সর্বপ্রকার ঝুটঝামেলা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। আবার মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করাটা মোটেই ধ্বংস হওয়া নয়, বরং পরিবর্তন। নফসটি তথা প্রাণটি তথা জীবাত্মাটি দেহ নয় তথা শরীর নয়, বরং নফসটিকে তথা প্রাণটিকে তথা জীবাত্মাটিকে ধারণ করার পাত্র হলো শরীর। এই পাত্র হতে নফস তথা প্রাণটি বিদায় গ্রহণ করলে পাত্রটি সংগে সংগে নামধারণ করে লাশ। সুতরাং লাশটি মেজাজি কবরে যায় এবং হিন্দুদের লাশটি শ্মশানে যায়। মেজাজি কবরে আজাব হয় বলে মানতে হয়। কিন্তু নফস তথা প্রাণটিকে যে পাত্রটি ধারণ করে আছে সে পাত্রটি তথা জীবন্ত দেহটিকেই প্রতিদিন কবরের আজাব ভোগ করতে হয়। এই ভেদ-রহস্যগুলো যিনি বা যারা জানতে পেরেছেন তারা সুফিবাদে আসতে বাধ্য। সুতরাং জনাব লুৎফর রহমান চৌধুরী এসব বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী। তাই উনি অধম লিখকের শিক্ষাপ্তর।

আমি (লিখক) মোরাকাবার ধ্যানসাধনা করার একটি ফর্মুলা দিয়েছি।
আমার এই ফর্মুলা অনুসরণ করে মাত্র একশত বিশ (১২০) দিন
ধ্যানসাধনা করে দেখুন, রহস্যলোকের কিছু না কিছু দেখতে পাবেন।
যদি কিছুই না পান তো আমার সামনে এসে মন্থুক বলে যা মনে চায়
গালাগালি করবেন। আমি মাথা নিচু করে থাকবো। একজন খাস ওহাবি
আলেম আমার এ রকম কথা শুনে ধ্যানসাধনায় বসে গেলেন। অবশেষে
একটানা একটি বছর ধ্যানসাধনা করে সেকি করুণ কান্না! আমার এই
রকম চাঁছাছোলা কথাগুলো পরম শ্রদ্ধেয় শাহ সুফি সলিমুল্লাহ সাহেবের
কাছে ভাল লাগে বলেই তিনি ধ্যানসাধনা করার কথাটি বললেন।
আল্লাহপাক উনাকে ধ্যানসাধনা করার সময় ও সুযোগ এবং বিশেষ
রহমত দান করুন, এই কামনাই করি

হজরত বাবা শরফুদ্দিন বু আলী শাহ কলঙ্কর পানিপথির ফারসি ভাষায় রচিত
দিওয়ান হতে সামান্য কিছু অংশ তুলে ধরলাম

তলে ধরলাম এ জন্যই যে এই বিশাল দিওয়ান-টির মূল ফারসি ভাষা,
বাংলায় উদ্ভাষণ এবং অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে গেলে বিরাট তথা
চারপ্তন বইটির আকার ধারণ করে এবং ইহা ছাপাতে গেলে অর্থের
প্রয়োজন হয় এবং এই দিওয়ান-টি বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করে
বই আকারে প্রকাশ করলে ওহাবীদের চিত্তাধারার ওপর একটি প্রচণ্ড
আঘাত আসবে। তাই যারা সফিবাদে বিশ্বাসী তথা ফকির লাইনের
অনুসারী তাদের কাছে অনুরোধ করে গেলাম, তারা যদি আর্থিক সাহায্য
এবং কোরবানির পুস্তক চান্ডাটি বিক্রির টাকা দান করেন তা হলে
আমরা একে একে দিওয়ান-এ আমির খসরু, দিওয়ান-এ শামসেত্তাবিজ,
দিওয়ান-এ কতবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি ইত্যাদি মহামূল্যবান গ্রন্থগুলো
বাংলায় অনুবাদ করে প্রচার করার আশা রাখি।

হাস্তে দার সিনায়ে মা জল জানানায়ে মা
বুত পরশুম দিল মাসাত সানাম খানায়ে মা।

আমার বুক আমার মাগুকের নুরে ভরপুর। বুত পরশুম তথা আমি
কেবলই পীরপূজা করি। কেননা আমার হৃদয়টি হলো, তথা অন্তরটি
হলো, পীরপূজার সনমখানা।

গুফতে উখান্দা জানানে গারিয়া ট কারদাম বদরশ
বু আলী হাস্তে মাগার আশিকে দিওয়ানায়ে মা।

যখন আমি মাগুকের দরজায় লুটিয়ে পড়লাম তখনই আমার মাগুক
বললেন : বু আলী আমারই প্রেমিক, আমারই দিওয়ানা।

আযানে সুরি কে বাহ মাহবুর দারম
খাবার না বদ কেলামুন কদতবিন বা।

মি নাহানজাদ বু আলী হারগিজ খোদা আন্দার খুদি
তু হামি খোদাই বারি দার কাবায়ে বাজ আসনামোরা।

আমি ও আমার মাগুকের মাঝে যে গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে উহা
কেলামুন কদতবিনও জানে না।

হে বু আলী, খোদাকে খুদির মাঝে কখনও সম্পূর্ণ ধরে রাখা যায় না,
তাই তো খুদিকে পুনরায় কাবার দিকে নিয়ে যেতে চায়।

কলন্দর বু আলী আজাদে গাশ্তান
নাদানাম রুসমেও রাহ কুফুর দীনেরা।
ধর্ম ও কুফুরির মত ও পথের আম্মার আর কোনো দরকার নাই, যখন বু
আলী কলন্দর মুক্তি পেল।

ভূমিকা

সুফিবাদের ইতিহাস লিখছি না, লিখছি সুফিবাদের রহস্য। সুফিবাদের
ইতিহাস একটু পরিশ্রম, একটু অধ্যয়ন করলেই লিখা যায়। কিন্তু
সুফিবাদের রহস্যটি লিখা চাটুখানি কথা নয়। সুফিবাদের রহস্যের
প্রায় প্রতিটি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা না থাকলে লিখা
যায় না। রহস্যময় বিষয়ের ভেতরে ঢুকতে হলে রহস্যের বিষয়গুলোর
উপর মোটামুটি একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হয়। যে লিখকের ধারণা
যত স্বচ্ছ হয় ততই রহস্যগুলো ফুটে উঠে। নয়তো অনুমানের ঢিল ছুঁড়ে
লিখতে হয় এবং পাঠকদেরকেও অনুমানের দেশে নিয়ে যায়। যদিও
সুফিবাদের রহস্য ভাষায় লিখে ফুটিয়ে তোলা যায় না, তবে

মোটামুটি একটি ধারণা দেওয়া যায়। এই ধারণাটি দেবার জন্যই আমাদের এই লিখনি। সুফিদের আচার-আচরণে, চলনে-বলনে এবং দর্শনে সার্বজনীন ভাবটি যদি ফুটে না ওঠে, যদি কোনো বিশেষ দল ও গোষ্ঠীর জন্য দর্শনটি দাঁড়িয়ে যায়, তা হলে উহা সুফিবাদ থাকে না। সুফির ধর্মই হল সুফিবাদ এবং প্রধান পরিচয়টি হল সুফি। সংকীর্ণতার অন্ধ গলিতে সুফিরা বাস করতে পারেন না। প্রাচীর আর দেয়াল সুফিদের সার্বজনীন দর্শনটিকে বেঁধে দিতে পারে না। বেঁধে দিতে গেলেও হিতে বিপরীত হয়। দেখা যায়, দেয়াল তথা প্রাচীরটিও সার্বজনীনতার আলোকে আলোকিত হয়ে যায়।

মোরাকাবার ধ্যানসাধনা ছাড়া সুফিবাদের রহস্য বোঝাটা অসম্ভব। নির্জনে গুরুর দেওয়া নির্দেশ মতো মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করতে হয়। সাধক যখন মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করে চলে, এই সাধনার পথ দিয়েই ধাপে ধাপে রহস্যলোকের পরিচয় ঘটতে থাকে। এই রহস্যলোকের পরিচয়গুলো সাধকের ধ্যানসাধনার গভীরতার উপর নির্ভর করে। ধ্যানসাধনার গভীরতা যত বেশি, রহস্যলোকের দরজাগুলো ততই খুলতে থাকে। তবে একটি কথা সত্য যে, সুফিবাদে যা কিছু অর্জিত হয় ধ্যানসাধনার মাধ্যমে, উহা নিরোট নগদ। বাকির কারবার সুফিবাদে নাই। মরে যাবার পর পাবার কথাটি সুফিবাদে একদম অচল। তাই আমরা

দেখতে পাই, মহানবী হেরাণ্ডহায় যে পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করেছেন উহাতে যা কিছু পাবার নগদই

পেয়েছেন : মহানবী বাকিতে নবুয়ত পান নি, বরং নগদই পেয়েছেন ; কোরান বাকিতে নাজিল হয় নি, বরং নগদই নাজিল হয়েছে ; জিবরিল আম্বিনের দর্শন বাকিতে হয় নি, বরং নগদই হয়েছে। সুতরাং যা কিছু পাবার তা নগদই পেয়েছেন। এ জন্য বিশ্ববিখ্যাত ওলি হযরত শরফুদ্দিন বু আলী শাহ কলন্ডর পানিপথি বলেছেন, ‘আসো, বসো, মুরিদ হও-তারপর মাত্র ১২০ দিন আমার কথা মতো মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করো; এবং এই ১২০ দিনের ধ্যানসাধনাটি করে যদি তুমি কিছুই দেখতে না পাও তা হলে দুই হাতে দুইটা পাথর নিয়ে আমার মাজারে ছুঁড়ে মেরে দিয়ে বলে

দিও : কলন্ডর মিথ্যুক।’ অবশ্য এই ১২০ দিনের মোরাকাবায় কামেল হওয়া যায় না, কিন্তু রহস্যলোকের কিছু না কিছু অবশ্যই দর্শন হয় : যেমন, ধোঁয়া দেখলেই আগুনের কথাটি মনে করিয়ে দেয়। বু আলী শাহ কলন্ডরের দেয়া মোরাকাবাটি এতই ভয়ঙ্কর যে কেহই আজ পর্যন্ত বিফল হয় নি। আরও মনে রাখা দরকার যে, এই ধ্যানসাধনা করার যিনি বা যারা উপযুক্ত নহে অথচ মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করতে এসেছে তাদেরকে কোনো না কোনো উছিলায় ধ্যানসাধনা হতে উঠিয়ে দেয়া হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, কেউ

১০/১৫ দিন মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করার পর রাতের অন্ধকারে ঝুল হতে পালিয়ে গেছে। আবার অনেকেই অসুস্থতার কারণে এবং অন্যান্য বিভিন্ন কারণে ধ্যানসাধনাটি করতে পারে নি। আপনি যত বড় প্রতিজ্ঞা নিয়েই ধ্যানসাধনাটি করার জন্য এগিয়ে আসুন না কেন, যদি তকদিরে লিখা না থাকে তা হলে এগিয়ে যাওয়াটা অসম্ভব।

মহানবী বলেছেন, ‘নামাজ বেহেশতের চাবি এবং নামাজের চাবি হলো তাহারত তথা পবিত্রতা’। শ্রদ্ধেয় আলেম-উলামারা ‘নামাজ বেহেশতের চাবি’ কথাটি প্রচার করেন, কিন্তু নামাজের চাবি যে তাহারত তথা পবিত্রতা ইহা ভুলেও প্রচার করেন না। বেহেশতের চাবি যে রকম নামাজ ঠিক সে রকম নামাজের চাবিও তাহারত তথা পবিত্রতা। পবিত্রতা না থাকলে নামাজ শুদ্ধ হয় না এবং অশুদ্ধ নামাজ বেহেশতের চাবি হতে পারে না। এই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কোরান-হাদিস দিয়ে তুলে ধরা যায়। তবে এক কথায়, যে নামাজ পড়ার মধ্যে আর খান্নাসরুপী শয়তানটি থাকতে পারে না, সেই নামাজই হল তাহারত তথা পবিত্রতা। এই রকম নামাজ যাঁরা পড়তে পারেন তাদেরকেই নফসে মোৎমায়েন্নার

অধিকারী করা হয়েছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদটি কোরান দিয়েছে।

অনেকেই সুফি দর্শন লিখতে গিয়ে এমন এমন এবং মারাত্মক ভুল করে বসেন যা তাদের জানা নাই। প্রতিটি মানুষের নফসের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে আল্লাহ পাক পরীক্ষা করার জন্য দিয়েছেন উহাকে তাড়িয়ে দেবার কথাটি বেমানান ভুলে গিয়ে নফসকেই তাড়িয়ে দেবার কথাটি লিখে বসে। নফস মানেই হলো আমি, কিন্তু খান্নাসরূপী শয়তানটি মোটেও আমি নহি। সুতরাং আমি তথা আপন নফস পবিত্র, কিন্তু আপন নফসের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটি পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে উহা অপবিত্র। এবং উহাকেই আমিত্ব বলা হয়। উহাকেই অন্য ভাষায় হাশ্বি, খুদি, ইগো, অহম ইত্যাদি নাম দেওয়া হয়েছে। এই খান্নাসরূপী শয়তানটিকে প্রাচীনকালের মুনি-ঋষিরা খান্নাস না বলে ‘মায়্যা’ বলতেন। এই মায়্যাই বন্ধন। সুতরাং আমাদের কর্ম তখনই বন্ধন হয়, যখন আমাদের কর্মের উপর খান্নাস তথা মায়্যা নামক বিষয়টি ভর করে, তখনই কর্ম কলুষিত হয়। অন্যথায় কর্ম বন্ধন নয়, বরং ইবাদত। এই খান্নাস তথা মায়্যাকে পরিত্যাগ করার জন্যই এত ধর্ম-উপদেশ, এত ধর্মীয় অনুষ্ঠান, এত ধর্মীয় চিল্লাচিল্লি, এত ধর্মীয় ওয়াজ নছিয়ত এত ধর্মীয় গজল আর

কাণ্ডয়ালির কান্নাকাটি ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মীয় উপদেশের একমাত্র উদ্দেশ্যটি হলো, আপনার ডেতর যে খান্নাস তথা মায়াটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে উহা হতে পরিত্রাণ লাভ করা। এই একটিমাত্র উপদেশ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপদেশ ধর্মীয় দর্শনে আছে বলে আমার মনে হয় না। খাবার প্লেটটি যতই সুন্দর ও যতই দামি হোক না কেন, যদি সামান্য ধূলাবালিও ঐ প্লেটে থাকে তো পরিষ্কার করেই প্লেটে খাদ্য রাখা হয়। তদ্রূপ মানুষের দিলের প্লেটটি পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর রহমত চেলে দেবার প্রশ্নই উঠে না। দিলের প্লেটটি যখন খান্নাস নামক ময়লায় আচ্ছন্ন থাকে তখন আল্লাহর রহমত চেলে দেবার বিধান রাখা হয় নি। দিলের অপরিষ্কার প্লেটটির নাম হলো নফসে আন্নারা। সাধক যখন দিলের প্লেটটি পরিষ্কার করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যায় তখন দিলের প্লেটটির নাম হয় নফসে লাউয়াম্মা তথা সংগ্রামরত নফস, জিহাদে লিপ্ত নফস। যখন দিলের প্লেটটি একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তখনই দিলের প্লেটটি নামধারণ করে নফসে মোৎমায়েন্না তথা পরিতৃপ্ত এবং পবিত্র নফস। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির রাজ্যে মাত্র দুইটি স্থানে জাতরূপে তথা খাসসুল খাসরূপে অবস্থান করেন। একটি জ্বিনের অন্তর এবং অপরটি মানুষের অন্তর। এই দুইটি অন্তর ছাড়া সর্বস্থানে আল্লাহ পাক সেফাতরূপে বিরাজ করেন। সৃষ্টিরাজ্যের বাহিরে লা-মোকামে আল্লাহর অবস্থানটির কথা

সবাই কমবেশি জানে, কিন্তু জ্বিনের অন্তর এবং মানুষের অন্তরেও যে তিনি জাতরূপে অবস্থান করেন সেটা অনেকেই বুঝতে পারে না। ‘আমরা তোমাদের জীবন রংগের নিকটেই আছি’, এই নিকটে থাকার জন্যেই জাতরূপে থাকার কথাটি বলা হয়েছে। কেউ বোঝে, কেউ বোঝে না। বোঝাটাও তকদির, না বোঝাটাও তকদির। সুতরাং পূর্বজন্মের কর্মফল দ্বারাই তকদিরটি নির্ধারণ করা হয়।

এবার আমরা সেই বিখ্যাত হাদিসটির বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। আমি বিশ্বাস করতে চাই যে, মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই কতিপয় শ্রদ্ধেয় আলেম-উলামারা ‘নামাজ বেহেশতের চাবি’ বলে উল্লেখ করেন। হাদিসটির একটি অংশ তুলে ধরেন এবং অপর অংশটি এড়িয়ে যান। অথচ আকারে হাদিসটি ছোট। এখন আমরা হাদিসটি পুরোপুরি তুলে ধরি। প্রথমে আরবি ভাষাটি বাংলা অক্ষরে তুলে ধরলাম : ‘আন জাবেরিন কালা কালা রসুলুল্লাহে (দ:), “ম্লেফতাহল জান্নাতে আস-সালাতু ওয়া ম্লেফতাহ সালাতিত তহরা।” হজরত জাবের (রা.) বলেছেন যে, রসুলুল্লাহ বলেছেন, “জান্নাতের চাবিটি হলো নামাজ এবং নামাজের চাবিটি হল পবিত্রতা।” এখন নামাজের চাবিটি যে পবিত্রতা এই কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ পাঠক বুঝতে পারতেন যে সেই নামাজই জান্নাতের চাবি হতে পারে যে নামাজের

পবিত্রতা আছে। নামাজের পবিত্রতা শব্দটি আছে বলেই লোক দেখানো নামাজের কথাটিও আসে। লোক দেখানো নামাজের নামাজিকে ওয়াইল নামক জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে, এই কথাটি কোরানেই বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, নামাজের পবিত্রতা বলতে কী বুঝায়? দিলের পবিত্রতাই আসল এবং একমাত্র পবিত্রতা। শরীরের উপর শতচ্ছিন্ন

শত তালি-মারা পোশাকটি পরেও নামাজ আদায় করা যায়। আল্লাহ পাক শতচ্ছিন্ন শত তালি-মারা পোশাকটি দেখেন না, বরং হৃদয়ের পবিত্রতাটাই দেখেন। হৃদয়ের পবিত্রতা তখনই হয় যখন হৃদয়ের অভ্যন্তরের খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আমি এবং খান্নাসরূপী শয়তান উভয়ে একত্রে বসবাস করা পর্যন্ত হৃদয়ে পবিত্রতা আসে না। তাই কোরানের সূরা মোমিনের ষাট নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন, ‘তুমি একা ডাকো, ডাকের জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাবে।’ আমি এবং খান্নাসরূপী শয়তান উভয়ে একত্রে হৃদয়ে বাস করলে দুইজন হয়ে যায়। দুইজনের আরবি শব্দটি হলো ‘উদউনা’। খান্নাসরূপী শয়তানকে তাড়িয়ে দিতে পারলেই একা হওয়া যায়। একা হয়ে যাবার আরবি শব্দটি হল ‘উদউনি’। সুতরাং বলা হয়েছে, ‘ফা কালা রাব্বুকুম উদউনি আস্তা জেবলাকুম’, অর্থাৎ ‘সুতরাং তোমাদের রব বললেন, একা ডাকো, ডাকের জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাবে।’ একা না

হতে পারলে তথা ‘উদউনি’ না হলে হাজার ডাকেও জবাবটি পাই না। সুতরাং আমার ভেতর যে পর্যন্ত খান্নাসরূপী শয়তান অবস্থান করে সেই পর্যন্ত আমার ডাক, আমার নামাজ, আমার এবাদত-বন্দেগির পবিত্রতা থাকে না। তাই নামাজের পবিত্রতাটি হল আমার ভেতরের খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেওয়া। অন্যথায় মনগড়া কথা বলে, মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে মনগড়া তৃপ্তি পাওয়া যায়, কিন্তু আসল বিষয়টি হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হয়। সত্য অপ্রিয় হলেও সত্য এবং সত্যটিকে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে উদ্ধার করা যায় না। নামাজ যে রকম বেহেশতের চাবি ঠিক সেই রকমভাবেই নামাজের চাবিটি হল পবিত্রতা তথা তাহারাত। নামাজটিতে পবিত্রতা তথা তাহারাতের শর্তটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

সুফিবাদ বিষয়টি নিরেট একটি অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়। যাহা বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিয়ে লিখলেও বুঝানো যায় না। খুব বেশি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ছবিতে বাঘ-সিংহ দেখার মতো বুঝানো যেতে পারে, কিন্তু বনের আসল বাঘ ও সিংহ দেখতে হলে চিড়িয়াখানায় যেতে হয়। সুফিবাদের আসল পরিচয়টি একটি মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে মানুষটি সুফিবাদের রহস্য জানবার জন্য নির্জনে বছরের পর

বছর মোরাকাবা-মোশাহেদার ধ্যানসাধনায় মগ্ন আছেন তিনিই কেবল সুফিবাদের রহস্যটি বুঝতে পারেন। মোরাকাবার ধ্যানসাধনা ছাড়া সুফিবাদের উপর এক বস্তা ভালো ভালো কথা জানা যায় এবং অন্যকে বুঝানো যায়, কিন্তু আসল রহস্যটি জানা যায় না। মহানবী হেরাণ্ডহায় পনেরটি বছর প্রাকটিকাল মোরাকাবার ধ্যানসাধনা করে তাঁর উন্মতদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে গেছেন। এই মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করা বড়ই কষ্টকর, বড়ই ধৈর্যের বিষয়। মনের অসীম একাগ্রতা এবং দৃঢ় প্রত্যয় না থাকলে ধ্যানসাধনাটি করা যায় না। সুতরাং সুফিবাদ মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমরা বুখারি শরিফ-এর পঁচানব্বই নম্বর হাদিসটিতে দেখতে পাই যে আসহাবে সুফফার একজন জলিল কদরের সাহাবা হজরত আবু হোরায়রা (রা.) প্রকাশ্যে বলে গেছেন যে তিনি (আবু হোরায়রা) মহানবীর কাছ থেকে দুই প্রকার জ্ঞান অর্জন করেছেন : একটি প্রকাশ্য এবং অপরটি গোপনীয়। উনি বলেছেন যে, প্রকাশ্য জ্ঞানটি, যাহা আমি মহানবী হতে পেয়েছি, উহা প্রকাশ করে দিলাম এবং গোপনীয় জ্ঞানটি প্রকাশ করতে গেলেই কাটা যাইবে আমার এই গলা। মহানবীর চাচা এবং সাহাবা ইবনে

আব্বাসও (রা.) বলেছেন যে, এই গোপন জ্ঞানটি প্রকাশ্যে প্রচার করা যায় না। ইহা সিনা-ব-সিনার গোপন জ্ঞান। যিনি এই গোপন জ্ঞান তথা এলম্মে লাদুনি হাসিল করতে পেরেছেন তার সহবতে থেকেই এই জ্ঞান অর্জন করতে হয়। ইহাকেই গুরু এবং শিষ্যের জ্ঞানদান ও জ্ঞানগ্রহণ করা বুঝায়। ফারসিতে ইহাকেই পীর ও মুরিদের জ্ঞানদান ও অর্জন করার বিষয়টি বলা হয়েছে। সুফিবাদের রহস্যের জ্ঞান অর্জন করার জন্যই গুরু ধরতে হয়। গুরু রহস্যের জ্ঞান তথা এলম্মে লাদুনি কী করে এবং কেমন করে অর্জন করা যায় তার দিকনির্দেশনা দেবেন। তাবিজতুহা, ঝাড়ফুক, পড়াপানি ইত্যাদি আল্লাহর ওলিদের অনেক সময় দিতে দেখা যায়, কিন্তু ইহা সুফিবাদ নয়। এই জন্য আল্লাম্বা ইকবাল সুফিবাদের জ্ঞানকে ফেরেশ্তা রাজ্যের বিজ্ঞান এবং লা মোকাম্মের জ্ঞান তথা এলম্ম ব বলেছেন। আল্লাম্বা ইকবাল বলেছেন, ‘ইয়ে হিকমতে মালাকুতি ইয়ে ইলম্মে লাহতি।’ আল্লাম্বা ইকবাল অন্যত্র বলেছেন যে, ইলম্মে লাদুনি বাহিরে পাওয়া যায় না, বরং আপন দেহ-মনেই জাগ্রত হয়। আপন দেহটিই হল মিল্লের জিকির, সব রহস্যের পাত্র, মেরাজে গমন করার বোরাক এবং অত্যন্ত গোপনীয় বিষয়ের একমাত্র

পার। ‘ইয়ে যিকরে মিন্ন, ইয়ে শাবী, ইয়ে বোররাক, ইয়ে বেসারুর।’

আল্লামা ইকবাল বলেন, নিজের ভেতর এই জ্ঞান পাওয়া যায় যখন নিজেকে এই জ্ঞান পাওয়ার আগ্রহী করে তোলে। তা ছাড়া সুফিবাদের রহস্যের কিছুই বুঝা যায় না। ‘তেরী খুদিকা নিগেবা নেহী তো কুছবি নেহী, দিলগু নিগা মুসলমা নেহি তো কুচভি নেহী।’ আল্লামা ইকবাল বলেন, তোমার ভেতরে যে খান্নাসরূপী আম্মিতুটি আছে উহা সরিয়ে দাও তা হলে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেবেন। সুফিবাদের আদর্শে আম্মিরি ভাবটি থাকে না এবং আম্মিটিকে বিত্ত-বৈভবের কাছে বিক্রি করে দিও না। ‘উঠানা শিনা জারা ম্যায় যারেন দেখেগা, তেরা তারিকা আম্মিরি নেহী, ফকিরী হয়। খুদি না বেচে গরিবী মে নান্ন পয়দা কার।’ সুফিবাদের উপর এই রকম রহস্যপূর্ণ কথাগুলো আল্লামা ইকবাল লিখে গেছেন বলেই এবং দাড়ি রাখার সূন্নতটি পালন করার আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার দরুন সেই দিনের এক হাজার আলেম কাকের ফতোয়াটি দিয়েছিল। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল নবীবংশের দাবিদার মাওলানা হুসায়েন আহম্মদ মাদানি সর্বপ্রথম কাকের ফতোয়াটি দিয়েছিল। এই জন্য আল্লামা ইকবাল অনেকটা টিটকারির ভাষায় বলেছিলেন যে, ‘ইচে বু আবু লাহাবিস্ত’ তথা ‘আপনার মধ্যে মহানবীর আপন চাচা আবু লাহাবের গন্ধ পাইতেছি।’

গুরুর কাছে শিষ্য তথা পীরের কাছে মুরিদ যাবে রহস্যের জ্ঞান অর্জন করার জন্য। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক বিষয়গুলো পুরনো ঢাকার সদরঘাটের ফুটপাথ হতে দশ টাকা দিয়ে দিনিয়াত শিক্ষা নামক বই হতে অনেক কিছু জ্ঞান যায়। গুরু যদি শিষ্যকে কেমন করে রহস্যের জ্ঞান অর্জন করতে হবে বলে দিতে না পারেন তা হলে গুরু বলা যায় না। ধর্মীয় অনেক প্রকার পুস্তক পাঠ করলেই তো অনেক কিছু জ্ঞান যায়। এইজন্যই এক মহাপুরুষ বলেছেন যে, যে ধর্মে অধ্যত্মবাদ নাই উহা তো ধর্মই নহে। ওহাবি মতবাদ সুন্দর সুন্দর লোভনীয় চমকম্বারা কথা শুনিতে অধ্যত্মবাদ বর্জিত কাঠধর্মের কাঠ অনুষ্ঠান পালন করার কথাটি প্রচার করে। সুতরাং অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় যে, নির্জনে একটি ঘরে একশত বিশ দিন মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করলেই সুফিবাদের সামান্য রহস্য পরিষ্কার বোঝা যায় এবং তা জীবিত থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু ওহাবি মতবাদের দর্শনটি হল বাকি তথা মরে যাবার পর পাবার কথা। নগদ নয় বাকি। যে দুনিয়াতে অন্ধ, সে মরার পরও অন্ধই থাকবে—ইহা কোরানেরই কথা।

প্রাণ তথা আত্মাকে আরবি ভাষায় নফস বলা হয়। রুহ প্রাণও নয়, আত্মাও নয় এবং ইংরেজি ভাষায় স্পিরিটও নয়। এক কথায় রুহ হলো আল্লাহর আদেশ তথা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর আদেশ আল্লাহ হতে

আলাদা নয় বলেই রুহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে-এই কথাটি কোরানে একবারও বলা হয় নাই। রুহ বিষয়টি কোরানে সর্বমোট সতেরোবার উল্লেখ করা হয়েছে। রুহ কোনো মানুষের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন ফেরেস্টাদের পাহারা দেবার কথাটি বলা হয়েছে। প্রাণ তথা আত্মা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে। তাই কোরান বলছে, ‘কুল্লু নফসুন জায়েকাতুল মউত’, তথা ‘প্রত্যেক নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।’ লক্ষ করার বিষয়টি হলো, নফস মৃত্যুতে ধ্বংস হয়ে যাবার কথাটি বলা হয় নি, বরং বলা হয়েছে স্বাদ গ্রহণ করবে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং স্বাদ গ্রহণ করা দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। তরকারিতে লবণ হল কি না,

মা-বোনেরা তরকারির সামান্য সূরা চেখে দেখেন। নফস তথা প্রাণেরও মৃত্যুর স্বাদটি চেখে দেখবার কথাটি বলা হয়েছে। রুহের ব্যাপারে এই রকম মৃত্যু চেখে দেখার কথাটি একবারও বলা হয় নাই। আরও মজার বিষয়টি হলো, যা আমরা খুব বেশি একটা খেয়াল করি না সেই বিষয়টি হলো-ফেরেস্টাদেরকে নফস তথা প্রাণ তথা আত্মা এবং রুহ তথা আল্লাহর আদেশ তথা আল্লাহ তথা পরমাত্মা এই দুইটির একটিও দেওয়া হয় নি। ফেরেস্টা উচ্চশক্তি ও বিরাট ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে, কিন্তু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব নয়। জীব কথাটি বলাও ঠিক মনে হচ্ছে না, কারণ নফস থাকলেই জীব হয়। কোনো ফেরেস্ট

রাই নফসও নাই রুহও নাই। সুতরাং ফেরেস্টাদেরকে জীবের আওতায় আনাই যায় না। ফেরেস্টারা হলো আল্লাহর সেফাতি নূরের তৈরি তথা গুণবাচক নূরের তৈরি। জাত নূরের বিন্দু পরিমাণ অবস্থান বা স্থিতি কোনো ফেরেস্টাকে দেওয়া হয় নি। তাই আমরা দেখতে পাই জিবরাইল ফেরেস্টাকে সৃষ্টির শেষ সীমায় তথা সিদরাতুল মুনতাহার দাঁড়িয়ে থাকতে। লা-মোকামে তথা আল্লাহর জাত নূরে নূরময় অবস্থানটিতে এক পা-ও অগ্রসর হবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। সুতরাং ফেরেস্টারা হলো আল্লাহর মহাপবিত্র সেফাতি নূরের তৈরি মহাপবিত্র রোবট (?)। কারণ

নফসের উপস্থিতি না থাকলে ভালো-মন্দ বিচার করার অধিকারটি থাকে না। সুতরাং ফেরেস্টারা কেবলমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন করে যান। জিবরাইল ফেরেস্টাকে রুহুল আমিনও বলা হয়। যদিও রুহ নাই, অথচ রুহুল আমিন। অনেকটা অন্ধ ছেলের নাম পদ্বলোচন। এখানে এসেই ইসলামের গবেষকেরা এবং পীর সাহেবেরা বিষয়টিকে লেজে-গোবরে করে ছাড়ে। অনেকে মনে করেন এবং মনে করাটা অনেকটা স্বাভাবিক এবং সুস্বাদু দৃষ্টির দর্শনের অভাবে ফেরেস্টা জিবরাইলের নাম রুহুল আমিন হওয়াতে মনে করেন যে রুহ আছে। আসলে কোনো ফেরেস্টাকেই রুহ দেওয়া হয় নাই এবং নফসও দেওয়া হয় নাই। রুহকে আমরা বাংলা ভাষায় পরমাত্মা বলে থাকি। এই পরমাত্মাটি

আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের মাঝে একমাত্র জ্বীন এবং মানুষকেই দেওয়া হয়েছে। মানুষ যখন নিজের ‘জীবন রংগের কাছেই আল্লাহ আছেন’-কে মোরাকাবার ধ্যানসাধনার মাধ্যমে জাগ্রত করে তোলেন তখনই সেই মানুষটিকে বলা হয় ইনসানে কাম্মেল তথা পরিপূর্ণ মানব তথা আদম। আল্লাহর সুরতে আদমকে তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু এই কথাটি বলা হয় নি যে মানুষকে আল্লাহর সুরতে তৈরি করা হয়েছে বা বানানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলছেন যে ইয়া নবী, আইয়ুহান নবী, একমাত্র আপনিই বলে দিন যে, আমি তোমাদের মতো বাশার। কিন্তু কোরানের একটি স্থানেও বলা হয় নি যে আমি তোমাদেরই মতো ইনসান তথা মানুষ। এই বিষয়টিও একটি সাংঘাতিক বিষয়। গবেষণা করতে গিয়ে অনেক সময় লেজে-গোবরের অবস্থাটি দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই যে কোরান বলছে, কাফেরেরা আল্লাহকে ঢেকে রাখে। কোরানের অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক মহাফাঁপরে পড়ে যায়। অনুবাদক ভাবে যে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে কাফেরেরা কী করে ঢেকে রাখতে পারে! তাই অনুবাদক ঠিক এর সম্পূর্ণ উল্টা অনুবাদ করে থাকেন এবং এই কথাটি লিখে ফেলেন যে, আল্লাহ কাফেরদেরকে ঢেকে রাখেন। আল্লাহ যদি কাফেরদেরকে ঢেকেই রাখেন তো কুফরি করবে কারা? কাফেররাই তো কুফরি করে। সুতরাং সব কাফেরদেরকেই যদি আল্লাহ ঢেকে রাখেন তো কুফরি

করার কেউ থাকে না। কোরানে বলা হয়েছে যে আল্লাহ জিকিরকে হেফাজত করে রাখেন। অনুবাদক ইহা না লিখে অনুবাদ করেন, আল্লাহ কোরানকে হেফাজত করে রাখেন। কোরান ও কেতাব শব্দ দুটো তো অনেকবারই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে জিকির শব্দটিকে অনুবাদক কোরান অর্থে ব্যবহার করেন। প্রশ্ন আসে, কেন কোরানের অনুবাদটি হবহ রাখা হয় নি? এ রকমভাবে কোরানে বহু আয়াতের শব্দগুলো এক রকম আর অনুবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। অনুবাদক হবহ অনুবাদ করে যদি এর অর্থ বুঝতে না পারে তো সোজা পাঠকদেরকে বলে দিলেই হয়—এই আয়াতের অর্থ আমার জানা নাই। এই দুঃখটি নিয়েই অধম লেখক কোরানের পনেরো পারা হবহ অনুবাদ করে বই আকারে প্রকাশ করেছি এবং দিনে দিনেই এর চাহিদা বাড়ছে। কারণ আমি লিখে দিয়েছি যে, অন্য আট-দশটি কোরানের অনুবাদ সামনে রেখে আমার অনুবাদটি পড়ুন তবেই সব ডেদ-রহস্যগুলো পরিষ্কার পাঠকের চোখে ধরা পড়বে। এই পনেরো পারা কোরানের হবহ অনুবাদ করতে গিয়ে বহুবার আমাকে লিখতে হয়েছে যে এই আয়াতটির অর্থ আমার জানা নাই।

পরিশেষে পাঠকদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ রইলো, আপনারা রূহ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে হলে শাহ সুফি সৈয়দ

মাতলানা সদরউদ্দিন আহমদ চিশতির রচিত মসজিদ দর্শন বইটি পড়ুন। সুফিবাদ বিষয়টির পরিষ্কার ধারণা দিতে পারে উনারই রচিত কেবলা ও সালাত, সিয়াম দর্শন, কোরবানি, ইসলাম ধর্মের মতভেদের কারণ এবং তিন খণ্ডে রচিত কোরানের তাফসির কোরান দর্শন।

বাবা জ্ঞান শরিফ শাহ সুরেশ্বরী কেবলায়ে কাবার উর্দু ভাষায় রচিত সিররে হক জাম্মে নূর, মাতলাউল উলুম, আইনাইন, লতায়েফে শাফিয়া-র সাদেক নূরী কর্তৃক অনুবাদগুলো পড়লে সুফিবাদের উপর আরও পরিষ্কার ধারণা হবে।

সূচিপত্র
নফস ও রূহ ৫৭
শয়তান ৬৫
তকদিরের বিধান ৭৬
যিশুর আত্মবলিদান ৮৯
জমিদার অতুল চন্দ্র চক্রবর্তীর দৃষ্টান্ত ৯২
ম্নেজাজি আর হাকিকি ৯৭
রহস্যলোকের জ্ঞান ১০৭
জড়বাদী চার্বাক ১১০
খাজা বাবার বইভিত্তিক আলোচনা ১১৪
ম্নেজাজি কাবা ও আবরাহা ১২২
ধর্মের মূল সত্য ১৩৩
রোজার হাকিকত ১৩৮

রহস্যের জ্ঞান লাভের উপায় মোরাকাবা ১৪৩

রোজা সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা ১৫০

নফস ও রহ নিয়ে আরও কিছু কথা ১৫৬

জাকাতের হাকিকত ১৬০

শেষ কথা : মোরাকাবা ১৯০

ইতিহাস নয় সুফিবাদের রহস্য বইটি প্রকাশে যারা আর্থিক সহযোগিতা
করেছেন তাদের নামের তালিকা ২০৩

শাহ সুফি লকবপ্রাপ্তদের নামের তালিকা ২০৭

নফ্‌স ও রূহ

যে কোনো ভাষা শিখতে হলে সেই ভাষার অক্ষরপরিচয় জানতে হবে, শিখতে হবে, নতুবা ভাষাশিক্ষাটি সম্ভবপর নয়। প্রথমে অক্ষরপরিচয়, তারপর শব্দচয়ন এবং তারপর বাক্য। ইসলাম ধর্মটি জানতে হলে

প্রথমেই কিছু সূত্র, যাকে আমরা ফর্মুলা বলি, সেটা জানতে হবে। এই প্রাথমিক সূত্র বা ফর্মুলাগুলো জানা না থাকলে ভুল করা বা হওয়াটা স্বাভাবিক বলে অধম লিখক মনে করে। যেমন ধরুন, নফস এবং রুহের পার্থক্যটি জানা দরকার। নফসের বাংলা অনুবাদ জীবাত্মা এবং রুহের বাংলা অনুবাদ পরমাত্মা। নফস তথা জীবাত্মা সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু রুহ তথা পরমাত্মা সৃষ্টির বহির্ভূত, তথা এক কথায় স্রষ্টা স্বয়ং, তথা আল্লাহ স্বয়ং। সুতরাং নফস এবং রুহের পার্থক্যটি বিরাট। নফস তথা জীবাত্মা মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে, তথা নফসের মরণ অবধারিত; কিন্তু রুহকে মৃত্যুর সামনে দাঁড়াতে হয় না। জন্মগ্রহণ করলেই মরতে হয়। নফস তথা জীবাত্মা জন্মগ্রহণ করে, তাই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু রুহ তথা পরমাত্মা হল আল্লাহর আদেশ। আল্লাহর আদেশের জন্ম নাই, তাই মরণের প্রশ্নই উঠে না। জন্ম-মৃত্যু থাকলে ঘুম, বিশ্রাম, পরিশ্রম ইত্যাদি বিষয়গুলো আসে এবং এই রকম বিষয়গুলো নফসের জন্য তথা জীবাত্মার জন্য নির্ধারিত; কিন্তু রুহ তথা পরমাত্মার বেলায় এগুলোর একটিও দরকার হয় না। কারণ পরমাত্মা জন্ম-মৃত্যুর ধারে কাছেও নাই। তাই রুহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এমন কথাটি কোরানের কোথাও নাই এবং সূত্র অনুযায়ী থাকতে পারে না। জন্ম-মৃত্যুর সুখ ও দুঃখ ভোগ করে নফস, কারণ নফস সৃষ্টি। নফস বিভ্রমের আর হতাশার বহু ধাপের বহু তির্যক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে, কিন্তু রুহ এসব বিষয়ের ধারে

কাছেও নাই। রোগী ডাক্তারের কাছে যায় চিকিৎসার জন্য। অভাব চাহিদার প্রশ্ন তোলে। অভাব বিবেকের আদর্শ নষ্ট করতে চায়। বিবেকের আদর্শ নষ্ট হতে দিতে চায় না সহজেই কেউ। কিন্তু অভাব এমন একটি মারাত্মক রোগ যে, আদর্শের শরীরে পচনের ক্যান্সার ধরিয়ে দিতে চায়। আবার যদি অভাবের সঙ্গে লোভটি প্রবল আকার ধারণ করে তা হলে মানুষকে পশুর চেয়েও নিচে নামিয়ে দেয়। উলঙ্গ শরীর ঢাকা যায়, কিন্তু অভাব আর লোভের শরীর ঢাকা যায় না; কমবেশি মানুষের চোখে ধরা পড়ে যায়। সুতরাং নফস তথা জীবাত্মা জন্ম-মৃত্যু, দুঃখ-যাতনার অধীন বলে মৃত্যু নামক ঘটনাটি ঘটে গেলে মাগফেরাত চাওয়ার প্রশ্নটি আসে। তাই নফসের জন্য মাগফেরাত চাইতে হয়। রুহ এত সব বালান্মুসিবত, ধানাইপানাই, ছলাকলা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাই রুহের মাগফেরাত চাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মাগফেরাত চাইতে হয় নফসের জন্য, রুহের জন্য নয়; কারণ রুহ মৃত্যুবরণ করেন না। অথচ হাটেঘাটে, বাজারে মহল্লায়, ঘরেবাইরে আলেম-উলামা, মুফতি-মাওলানা, পীর-ফকির, বড় বড় ইসলাম গবেষকের দলকে রেডিও-টেলিভিশনে, ওয়াজ মাহফিল ও ভাষণে সবাইকে নিয়ে রুহের মাগফেরাত চাইতে দেখি। সামান্য লজ্জাও নাই। শরমের শর এদের চৈতন্য ফুটা করতে পারে না। বুঝবো না, জানবো না-র বুলেট প্রফ জ্যাকেট পরে বসে আছে, অথচ নিজেদেরকে কত বড় আলেম,পণ্ডিত,

মুফতি বলে জাহির করে যাচ্ছে! আম জনতাও ভুল করতে বাধ্য। কারণ এসব আলেম-উলামারা অন্ধ, আর জনতা তো আরও অন্ধ। এক অন্ধ আর এক অন্ধকে রাস্তা দেখাতে গেলে যা হয় তাই হয়ে আছে দেখছি। গর্তে পড়ে আছে। উঠে আসার চেষ্টা ও তাগিদ নাই। এদেরকে যতই বোঝানো হোক না কেন যে, রুহের মাগফেরাত চাওয়াটা একটা মারাত্মক ভুল, বরং নফসের মাগফেরাত চাইতে হবে বলে যত উপদেশই দেন না কেন, কাজে আসে না। সুতরাং রুহের মাগফেরাত চাইতে বললে কোরানের সূত্রটি তথা ফরুলিটিই ভুল হয়ে যায়। এই মারাত্মক ভুলটি মেনে নিয়ে আমাদেরকে আজ হতে বলতে হবে, নফসের মাগফেরাত চাও, রুহের নহে। যিনি মারা যান তার জন্য মাগফেরাত, যিনি রুগী তার জন্য ডাক্তার। পাক কোরান রুহ বিষয়টি মাত্র সতেরোবার উল্লেখ করছেন এবং সতেরোবারই রুহকে সৃজনীশক্তির অধিকারীরূপে দেখতে পাই। তারপরও অনেকে রুহকে পাঁচ-মারা ভাষার গোলক-ধাঁধায় ফেলে দেবার জন্য লিখে থাকেন ‘নূরানি মাখলুক’ তথা সহজ ভাষায় নূরের সৃষ্টিজীব। আবার অনেকে তো আরও আজব জিনিস তৈরি করে রুহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করেন। রুহে হায়ওয়ানি হল পাঁচটি ভাগের একটি ভাগ। রুহে হায়ওয়ানি বলতে গবেষক কী বোঝাতে চেয়েছেন এবং গবেষক নিজেই কি রুহ বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন কি-না, যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ হায়ওয়ান বলতে বুঝায় পশু। পশুর মাঝে রুহের অবস্থান, এও কি

সম্ভব! এমন আজগুবি এমন গাঁজাখুরি কথাবার্তাও শুনতে হয় এবং পড়তে হয়। পশুর মধ্যে রুহ তথা রুহে হাযওয়ানি কথাটি পাক কোরানের রুহ বিষয়ে সতেরবার উল্লেখের মাঝে একটিবার উচ্চারণ করা তো দূরে থাক, নামগন্ধটি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। অথচ কেমন করে রুহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে বই লিখে অন্ধ জনতার পাতে অন্ধ গবেষক তুলে দিলেন! পরিণতি কী হয়? এক কানা আর এক কানাকে পথ দেখাতে গিয়ে গর্তে পড়ে এবং জনতা গর্তে পড়ে গেছে। তাই বলতে হয় যে, অন্ধ কখনোই সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না। এসব গবেষকদের সামান্য লজ্জা শরমও নাই। বরং ভুলটি ধরিয়ে দিলে মেনে নেওয়া তো দূরে থাক, বরং এটা সেটা বলে কথার ধুম্রজাল তৈরি করতে চায়। আরও মজার কথাটি হল, ফেরেস্টা জিবরিলকে বলা হয় রুহুল আম্বিন। গবেষক আগাম্বাথা কিছুই না ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন যে, যেহেতু রুহুল আম্বিন নামটি জিবরিল ফেরেস্টাকে দেওয়া হয়েছে সেই হেতু ফেরেস্টা সৃষ্টিজীব। তবে ফেরেস্টাকে তো মাটি অথবা আগুন দিয়ে তৈরি করা হয় নি বরং নূর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, সুতরাং রুহ বলতে নূরানি মাখলুক লিখে ফেলেন। অথচ সবাই কমবেশি জানেন যে, ফেরেস্টাদেরকে আল্লাহ পাক নূর দিয়ে তৈরি করেছেন। গবেষক বলেন না অথবা জানেন না যে, আল্লাহ পাক ফেরেস্টাদেরকে সেফাতি নূর তথা গুণাবলির নূর দিয়ে তৈরি করেছেন। আল্লাহর জাত নূর দিয়ে ফেরেস্টা

াদেরকে তৈরি করা হয় নি। যদি আল্লাহর জ্ঞাত নূর তথা আসল নূর তথা
মূল নূর দিয়ে ফেরেশ্তাদের তৈরি করতেন
তাহলে সেফাতি নূরের তৈরি জিবরিল ফেরেশ্তাকে সিদ্দরাতুল মোন্তাহা
পর্যন্ত এসে দাঁড়াতে হতো না এবং মহানবীকে বলতেন না যে, সিদ্দরাতুল
মোনতাহা হতে এক পা এগিয়ে গেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে পুড়ে শেষ
হয়ে যাবেন। এখানেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ফেরেশ্তা জিবরিল যদিও
নূরের তৈরি কিন্তু সেই নূর সেফাতি নূর তথা গুণাবলি নূর। জ্ঞাতি নূরের
তৈরি নয় তথা আসল নূর বা মূল নূরের তৈরি নয়। জ্ঞাতি নূরের তৈরি
হলে জিবরিল ফেরেশ্তাকে থামতে হতো না এবং খেমে যাবার কথাটি
থাকতো না। তা ছাড়া এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, কোনো ফেরেশ্তা
কেই নফস দিয়ে তৈরি করা হয় নি। পাক কোরান একবারও বলে না
যে, নফস দিয়ে ফেরেশ্তাদের তৈরি করা হয়েছে। অথচ কোরান বলেছে
যে, জীবকুলের প্রত্যেকটিকে নফস দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। আবার
প্রত্যেক জীবকে নফস দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কিন্তু প্রত্যেক জীবকে
নফস এবং নফসের সঙ্গে রূহ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বলা হয় নি। বলা
হয়েছে যে, কেবলমাত্র দুইটি জীবকে নফস এবং রূহ দেওয়া হয়েছে;
সেই জীব দুইটি হলো : একটি জ্বিন, অপরটি মানুষ। যেহেতু মানুষকে
নফসের সাথে রূহ দেওয়া হয়েছে তাই মানুষ হল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব,
যাকে আমরা আশরাফুল মাখলুকাত বলি। মানুষের সঙ্গে নফস এবং রূহ

দুইটি মিশিয়ে তথা সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে, তাই সমস্ত ফেরেশতাদের বলতে হয়েছে যে, আদমকে যে জ্ঞানদান করা হয়েছে সেই জ্ঞানটি আমাদের জ্ঞান নাই। ফেরেশতারা এই কথা বলতে বাধ্য কারণ ফেরেশতাদের নফসও নাই, রুহও নাই। দুইটির একটিও নাই। আদমের নফস উন্নত; কারণ আদমের নফসের সঙ্গে রুহ আছে, তথা স্রষ্টা স্বয়ং আছেন, তথা আল্লাহ স্বয়ং আদমের সঙ্গে আছেন। যেহেতু আদমের সঙ্গে আল্লাহ আছেন সেইহেতু ফেরেশতারা বলতে বাধ্য যে, আদমকে যে জ্ঞানদান করা হয়েছে উহা আমাদের জ্ঞান নাই। যেহেতু আদম নফস এবং রুহের অধিকারী তাই আদমকে সেজদা দেবার আদেশ করা হয়েছে। ফেরেশতাদের নফস এবং রুহ দুইটির একটিও নাই তাই জিবরিল ফেরেশতার নিছক নামটি রুহুল আমিন। ছেলের চোখ নাই, দুইটি চোখের একটিও নাই, অথচ নাম রাখা হয়েছে পদ্মলোচন তথা পদ্মের মতো সুন্দর চোখ। চোখই নাই, পদ্ম শব্দটি তো অনেক পরে, অথচ নাম রাখা হলো পদ্মলোচন! জিবরিল ফেরেশতার রুহ এবং নফস দুইটির একটিও নাই, অথচ নাম রাখা হয়েছে রুহুল আমিন। রুহই নাই অথচ রুহুল আমিন। কী চমৎকার মিথি কথা!

কোনো ফেরেশতাকে নফস এবং রুহ দেওয়া হয় নি, সুতরাং ফেরেশতাদের নফসও নাই, রুহও নাই। সুতরাং মানুষের সঙ্গে এবং যে কোনো জীবের সঙ্গে সামান্য তুলনাই দেওয়া যায় না। কেউ যদি তুলনা দিতে চান তা

হলে সেটা তার একান্ত নিজস্ব মত। যে ফেরেস্‌তাদের নফস এবং রুহ দুইটির একটিও নাই, সেই ফেরেস্‌তাদের থেকে আল্লাহ রসুল নির্বাচন করেন। কোরানের সূরা ফাতির-এ তো প্রথমেই বলে দেওয়া হলো যে, আল্লাহ ফেরেস্‌তাদের থেকে রসুল নির্বাচন করেন। আবার কোরানের সূরা হজ্জ-এ বলা হল যে, ফেরেস্‌তাদের থেকে এবং মানুষ হতে রসুল নির্বাচন করা হয়। রসুল মানুষ হতে যেমন নির্বাচন করা হয়, তেমনি রসুল ফেরেস্‌তাদের থেকেও নির্বাচন করা হয়। ভালো করে লক্ষ করুন, ফেরেস্‌তাদের জ্ঞানের কিছু মানুষের জ্ঞানের সঙ্গে তুলনাই চলে না। কারণ ফেরেস্‌তাদের সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছে যে, আমাদের জ্ঞান মানুষের জ্ঞানের সঙ্গে তুলনাই চলে না, তথা একবাক্যে বলা যায় যে, অল্প জ্ঞানের অধিকারী হয়েও ফেরেস্‌তাদের থেকে রসুল নির্বাচন করা হয়। তা হলে রসুল ফেরেস্‌তা এবং রসুল মানুষ, কিছু কোরানের কোথাও এই কথাটি একটি বারও বলা হয় নি যে, নবী ফেরেস্‌তাদের থেকে নির্বাচন করা হয়। ফেরেস্‌তাদের থেকে নবী বানানো হয়, এমন কথাটি কোরানে একবারও বলা হয় নি। নবীর কথাটি যখনই আসে তখনই মানুষ হতে নবী বানাবার কথাটি পাই, কিছু ফেরেস্‌তাদের থেকে নবী বানাবার কথাটি নাই। ফেরেস্‌তার মানুষ হতে নিম্নমানের বলেই ফেরেস্‌তাদের থেকে নবী বানাবার কথাটি কোরানে একবারও নাই। অথচ রসুল বানাবার কথাটি

যখনই আসে তখনই ফেরেশ্তাদের কথাটি পাই, নবী বানাবার সম্ময়
ফেরেশ্তাদের নাম

উধাঙ হয়ে যায়। তখন কেবলই মানুষ হতে নবী নির্বাচন করার
ঘোষণাটি পাই। যেহেতু ফেরেশ্তাদের থেকে কোনো নবী বানাবার
কথাটি কোরানে নাই এবং যেহেতু ফেরেশ্তাদের থেকে রসূল বানাবার
কথাটি কোরানে আছে সেইহেতু রসূল হতে নবী উন্নতমানের;
উন্নতমানের এ জন্যই বলছি যে, নবী কেবলমাত্র মানুষ হতে বানানো
হয়। যদি বলা হতো, ফেরেশ্তারা মানুষ হতে শ্রেষ্ঠ, তা হলে রসূলকেই
উন্নতমানের বলা যেত। তা হলে ইহা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, রসূল ছোট
এবং নবী বড়।

মোরাকাবা তথা নির্জনে ধ্যানসাধনায় সাধক যখন মগ্ন হলে থাকেন
তখনই আল্লাহর রহমতরূপে সাধকের ভেতরের বীজরূপী রূহটি জেগে
উঠে এবং মানব আকারের রূপটি ধারণ করে তথা আপন পীরের
রূপধারণ করে দর্শন দান করেন এবং এই দর্শন দানটি একটি বিশেষ
রহমত এবং এই বিশেষ দানটি করা হয় রহিমরূপটি ধারণ করে। কারণ
সাধক আশ্রিতের তিলে তিলে কোরবানি কবার বিশেষ ধৈর্যধারণ করেই
এই রহমতরূপী দানটি লাভ করতে পেরেছে। এখানে রহমানরূপের দান
নয়, কারণ রহমানরূপী দানটি হল সাধারণ দান। এই দান ক্রমার পর
দান। তাই দানটি করা হয় রহিমরূপ ধারণ করে। ক্রমার পর যে দানটি

করা হয় উহা রহিমরূপী দান। তাই গফুরর রহিম। গফুরর রহমান হয় না। ক্রমার পর রহিম আর ক্রমার আগে রহমান। তাই রহিম হল বিশেষ আর রহমান হলো সাধারণ। তাই কোরানে কোথাও গফুরর রহমান নাই, বরং গফুরর রহিম। আপন পীরের রূপটি ধারণ করেই জাগ্রত রূহ সর্বপ্রথম দর্শনদান করেন। তাই পীরের ধ্যান করতেই হবে। পীরের ধ্যান ছাড়া সাধনাই হয় না। হতে পারে না। নিরাকারের ধ্যান হয় না। তাই প্রথমে সাকাররূপের তথা আপন পীরের রূপটি ধ্যান করতে হয়। তাই মুজাদ্দের আল ফেসানী বলেন, মাতলাউল উলুম কেতাবের ছিয়াশি পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে এই বলে যে, পীরে তাস্ত আউয়াল মাবুদ তাস্ত, তথা ‘তোমার আপনা পীরই হলেন প্রথম মাবুদ’। লক্ষ করার বিষয়টি হলো, এখানে কিছু বলা হয় নি যে, ‘পীরে তাস্ত আখের মাবুদ তাস্ত’ তথা ‘তোমার পীরই হলেন তোমার শেষ মাবুদ’। কারণ পীর হলেন প্রথম মাবুদ এবং সাধনার শেষ পর্যায়ে পীর আর থাকেন না বরং আপনাকে আপনি দেখে এবং এটাই শেষ মাবুদ। শেষ মাবুদে আর মাবুদও থাকে না। থাকে কেবল আমি। এখানে এসেই সাধক বলে ফেলেন, আনাল হক, তথা ‘আমিই একমাত্র সত্য।’ এখানেই আপনাকে দর্শন করেন, এবং এখানেই রবরূপী প্রতিপালকের পরিচয়টি লাভ করেন, এবং এখানেই তৌহিদ।

বাহিরে দর্শন লাভ করলেও ইহা সাধকের ভেতর হতে আগমন। বাহিরে কিছু পাবার বিধান নাই। যা কিছু পাবার তা সাধকের ভেতর হতে আগমন করে। ডিম্বের বাইরে বাচ্চা পাবার বিধান নাই। ডিম্ব অনেক রূপে যেমন খাওয়া যায়, তেমনি বাচ্চা পাবার আশা করলে ডিম্বের ভেতর হতেই পেতে হবে। ডিম্বের বাহিরে যারা বাচ্চা খোঁজে তাদেরকে হতাশ হতে হয় এবং হতাশ হওয়াটাই তকদির। এই হতাশার তকদির নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে মুরিদ করতে যেয়ো না, বরং হাসিমুখে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ো। আল্লাহর হাতে কেন ছেড়ে দেব, বলে যদি কেউ তোমাকে প্রশ্ন করে তা হলে কোনো উত্তর দিয়ো না। যদিও উত্তরটি সাধকের ভালভাবে জানা থাকে। কিছু উত্তর পাবার জন্য তোমাকে অনেক রকম প্যাচমার্কা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে পারে, কিছু তোমাকে এখানে এসে ধৈর্যধারণ করতেই হবে, অথবা সোজা বলে দেবে, ‘ইহার উত্তর আমার জানা নাই।’ যে তোমাকে বার বার প্রশ্ন করে নাজেহাল করতে চাইবে, সে কখনো সাধক হতে আসে না অথবা আসবে না।

কোরানে বলা হয়েছে যে, রুহ যখন নাজেল করা হয় তথা রুহ যখন সাধকের ধ্যানসাধনার মাধ্যমে উদ্ভাসিত হয় তথা জাগ্রত হয়, তখন সেই জাগ্রত রুহের মর্যাদাটিকে সম্মুখত রাখার জন্য ফেরেস্টাদেরকে নাজেল করা হয়। অবশ্য কোরানে প্রথমে ফেরেস্টা এবং পরে রুহ নাজেলের

কথাটি বলা হয়েছে। একটু ভালো করে খেয়াল করুন যে, ফেরেস্টাদের নাজেল করার পর রুহ নাজেল করা হয় না বলে কেন বলা হলো না যে, নফস নাজেল করা হয়? নফস কখনো নাজেল করে না, বরং রুহ নাজেলের কথাটি পাই। রুহ আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর হুকুম আল্লাহ হতে আলাদা নহে। নফস নাজেল কথাটি কেন বলা হলো না? কেন বলা হলো যে, ‘আমরা ফেরেস্টা এবং রুহ নাজেল করি’? তাই রুহ আর নফসের পার্থক্যটি সর্বপ্রথম জানতে হবে। এই পার্থক্যটি জানার নামই হল ইসলামের প্রাথমিক সূত্র বা ফর্মুলা জানা। এই পার্থক্যের ফর্মুলাটি জানা না থাকলে ইসলাম গবেষক কী লিখবেন? কী জানাবেন? উল্টাপাল্টা এটাসেটা লিখে মোটা মোটা বই বানিয়ে পাঠকদেরকে কী উপহার দেবেন? লিখার স্বাধীনতা অবশ্যই থাকতে হবে এবং ভুলভ্রান্তি অবশ্যই থাকবে, কিন্তু গবেষকের একটি নৈতিক দায়িত্ববোধ থাকা উচিত।

রুহকে ভাগ করা হয় নি। রুহ একবচন। রুহ ওয়াহেদ। রুহ সব মানুষের মধ্যে থাকতে বহুবচন মনে হবে। আসলে রুহ একবচন। রুহের প্রকারভেদ নাই। অথচ নফসের প্রকারভেদ আছে। রক্তের শ্বেতকণিকার কোনো ভাগ করা যায় না। যদিও প্রত্যেকের শরীরে রক্তের শ্বেতকণিকাটি আছে, কিন্তু শ্বেতকণিকার ভাগ হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান এখনও রক্তের শ্বেতকণিকার সূক্ষ্ম ভাগটি করে দেখাতে পারে নি। তবে

কোনোদিন কেউ ভাগ করে দেখাতে পারে কি না জানি না; কারণ জ্ঞানরাজ্যে ভেটো নাই এবং নির্ভুল সিদ্ধান্তটি দেওয়া যায় না; কারণ এখানে নির্ভুল কথাটি আপেক্ষিক, সর্বজনীন নয়।

নফস তথা জীবাত্মার ভাগ আছে। বিভাজনই নফসের বৈশিষ্ট্য। কোরানে আমরা রুহের ভাগ করতে দেখি না। বিভাজন রুহের মধ্যে নাই। রুহ কেবল মাত্র রুহই। ইহার ভাগও নাই, বৈশিষ্ট্যও নাই। অথচ রুহের তথা পরমাত্মার পরিচয় জানা নাই বলে রুহকে পাঁচ ভাগ করে। একটি ভাগ এমনই অখাদ্য ভাগ, এমনই নোংরা চিন্তাধারা হতে আগত যে, রুহকে পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে ‘রুহে হায়ওয়ানি’ বলা হয়। এইসব অখাদ্যমার্কা কথাবার্তা একদম অজ্ঞতা হতে জন্মায়। কিছুই জানে না, অথচ জানবার পায়তারা, জানবার ধমক, জানবার গাঙ্গীর্যটি জাহির এমনভাবে করে যে, সাধারণ মানুষ শুধু নয় বিদ্বান ব্যক্তিরও অনুসরণ করে। তখন এইসব দশচক্র নামক খপ্পরে ভগবানকে ভূত মনে হয়। যেটি আসল সেটাকেই নকল মনে হয়। অনেক সময় চোখ কপালে তুলে বলে ‘এই কথা তো নূতন শুনলাম!’

নফস তথা জীবাত্মাটিকে মোটামুটি তিনভাগ করা হয়। যেমন নফসে আত্মারা, নফসে লাউয়াম্মা এবং নফসে মোৎমায়েল্লা। অনেকে আবার নফসে মুলহেম্মার ও নফসে ওয়াহেদ নামক আরও দুটো ভাগ করে। নদী

পার হয়ে সাগরে আসলেই লোনা জল দেখতে পায় এবং এই লোনা জল কাছে এবং দূরে সর্বস্থানেই অবস্থান করে, কারণ সাগর মানেই লোনা জল। কোরানে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে কেয়ামতের সময়, এই ঘোষণাটি দেবার পরপরই আল্লাহ কেন নফসে লাউয়াম্মার কসম খাচ্ছেন? কোথায় সমগ্র সৃষ্টি, আর কোথায় জ্বিন এবং ইনসানের নফসে লাউয়াম্মা? নফসে আন্নারা এবং নফসে মোৎমায়েন্নার কসম না খেয়ে কেন আল্লাহ নফসে লাউয়াম্মার কসম খাচ্ছেন? যে নফস সংগ্রামরত, যে নফস অবিরাম যুদ্ধ করে যাচ্ছে, যে নফস ধ্যানসাধনায় মগ্ন হয়ে নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা খানাসরুপী শয়তানটিকে তাড়াবার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে, সেই নফসে লাউয়াম্মার কসম কেন আল্লাহ খাচ্ছেন? কোথায় সমগ্র সৃষ্টির ধ্বংস, আর কোথায় নফসে লাউয়াম্মার কসম! তাহলে কেয়ামত বলতে বিরাট একটি রহস্য লুকিয়ে আছে, যা আমরা ধরতে পেরেও ধরতে পারছি না। সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যের গুণাবলি একটি মানবদেহে বর্তমান। যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে একটি দেহে। তা হলে কি সমগ্র সৃষ্টি বলতে একটি দেহকে বুঝিয়েছে? না হলে নফসের একটি বিশেষ অবস্থানের কসম কেন খেতে যাবেন? এখানে কি দেহটিকেই সমগ্র সৃষ্টির প্রতীকরূপে তুলে ধরেছেন? তা না হলে নফসের একটি বিশেষ পর্যায় নফসে লাউয়াম্মার কসম কেন খাবেন? তা হলে কি দেহের বিনাশই কেয়ামত? দেহের বিনাশটিই যদি কেয়ামত হয়ে থাকে

তা হলে চিন্তার জগতে কি আলোড়নের সূচনা হয় না? কেয়ামত বলতে কি একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখতে পাই না? তা হলে এই কেয়ামতের সঙ্গে সঙ্গে উঠানোর কথাটি দিয়ে কী বুঝাতে চেয়েছেন? কেয়ামতের সাথে সাথে যদি উঠানোই হয়ে থাকে তা হলে পুনর্জন্ম আছে। পুনর্জন্মবাদকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়? পুনর্জন্মবাদ কথাটি বললেই অন্য ধর্মদর্শনের সঙ্গে মিলে যাবার ভয়? দেহটি হলো জীবাত্মার পোশাক মাত্র। দেহের পোশাক যেমন কাপড়, আর সেই কাপড় ছিঁড়ে গেলে ফেলে দিয়ে নূতন আর একটি কাপড় পরিধান করি, সে রকম কি জীবাত্মা দেহ নামক পোশাকটি পুরনো হয়ে গেলে ফেলে দিয়ে নূতন আর একটি দেহপোশাক গ্রহণ করে? এই বর্জন আর গ্রহণের নামই কি পুনর্জন্মবাদ? এই ধর্মদর্শনটি মানা অথবা না মানাটাও তকদির। উলঙ্গ করেও যদি বুঝাতে চাই তবু মানা না মানা তকদিরের লিখন। ইহা খণ্ডাবার ক্লমতা কারো নাই, কারণ আল্লাহর আইনের কোনো বদল হয় না। যদিও কোরানে স্বয়ং আল্লাহ পাক মাত্র একটি বার তাঁর দেওয়া আইনটিকে মাত্র কিছুকালের জন্য বদলিয়ে ফেলেছিলেন। তাই ওলিরাবা অবশ্যই আল্লাহর গুণে গুণাবিত নতুবা ওলিই হতে পারেন না, তাই ওলিরাবা মাঝেমাঝে আইন বদলিয়ে ফেলেন। যেমন, আল্লাহ আশুনকে নির্দেশ দিলেন এই বলে যে, হে আশুন তোমার তকদির বদলাও এবং ইব্রাহিমের উপর শান্তির রূপ ধারণ কর। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হারখার করে

দেবার তকদির হলো আগুনের, তাই এই অমোঘ তকদিরটি আল্লাহর বন্ধুর জন্য বদলিয়ে দিলেন। আল্লাহ তাঁর বন্ধু ইব্রাহিমকে ভালবাসেন, আর ভালবাসায় যে কখনো কখনো আইনও বদলিয়ে দেওয়া হয় (অবশ্য সাময়িক) তারই জ্বলন্ত উদাহরণ, শত্রু দলিলটি তুলে ধরলেন এ জন্য যে, আল্লাহর বন্ধুর জন্য আল্লাহ নিজেই হেফাজতকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। আল্লাহর বন্ধু ইউনুসকে দুইটি মাছে গিলে ফেলে এবং অনেক পানির গভীরে বাতাস আর খাদ্য বিহনে মাসের পর মাস বাঁচিয়ে রাখলেন এবং অবশেষে বালুচরে বন্দি করিয়ে বন্ধু ইউনুসকে ফেলে রেখে গেলেন। ইহা আল্লাহর বন্ধুর জন্য ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমটি প্রচলিত আইনের সঙ্গে মিলে না বলেই মানুষ এর নাম দিয়েছে অলৌকিক তথা মোজেজা বা কারামত। আমি যে বিষয়টি নিয়ে সামান্য আলোচনা করলাম ইহাও মানা না-মানাটি নির্ভর করে তকদিরের উপর। তকদিরে লিখা থাকলে মানবেন, আর লিখা না থাকলে মানার প্রশ্নই উঠে না। আপনি হয়তো জানেন না যে, চরম পর্যায়ের দর্শনে আপনি একটি জীবন্ত পুতুল। স্বয়ং স্রষ্টা যেমনে নাচাবেন, আপনাকে অবশ্যই তেমনি নাচতে হবে। মন ও বিবেক মানতে চাইবে না। বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে। কিন্তু কোনো লাভ নাই। ফাঁসির আসামীর মত বারোটা এক মিনিটে আপনাকে ঝুলে যেতে হবে।

শয়তান

জ্বিন এবং মানুষের নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই এই উভয় প্রাণীর নফসটিকে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। জ্বিন এবং মানুষের নফস ছাড়া আর কোথাও খান্নাসরূপী শয়তানটিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় নি, তাই অন্য কোনো প্রাণীতে এবং সমগ্র সৃষ্টিরাজ্যে খান্নাসরূপী শয়তানের থাকবার অনুমতি তথা পারমিশন দেওয়া হয় নি। যেহেতু খান্নাসরূপী শয়তানটিকে সৃষ্টিরাজ্য এবং প্রাণীকুলের কোথাও থাকবার অনুমতি দেওয়া হয় নি সেই হেতু খান্নাস, শয়তান, ইবলিস এবং মরদুদকে আর কোথাও পাওয়া যায় না এবং পাবার প্রশ্নই উঠে না, কারণ তা হলে অঙ্কের আসল ফর্মুলাটি হারিয়ে যায়। হাকিকি শয়তান তথা আসল শয়তান যদিও একটি, কিন্তু রূপ ও গুণের প্রশ্নে চারটি। এক একটি বিষয়ে এক একটি বিশেষ গুণের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি বিষয়ের রূপ ও গুণের প্রশ্নে শয়তানের যে বিশেষ রূপটি থাকার প্রয়োজন এবং সঠিক সেটিই মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য রূপটি থাকতে পারে না এবং থাকার প্রশ্নই উঠে না এবং বলপ্রয়োগ করলে কোরানিক ফর্মুলাটি নষ্ট হয়ে যায়। যেমন ‘শয়তোয়ানুর রাজিমন’ হবে। এখানে জোর করে ইবলিসুর রাজিমন বলাই যায় না। বলতে গেলেই বাক্য এবং ভাব-দর্শনের মিলটি থাকবে

না এবং সমস্ত বিষয়টা ওলট পালট হতে বাধ্য। তখনই বিষয়টি হবে মনগড়া, বানোয়াট এবং বিকৃত। কেবল ইবলিসুর রাজিমনই নয়, বরং মরদুদুর রাজিমন অথবা খান্নাসুর রাজিমনও হবে না এবং হতেই পারে না। জোর করে বসাতে গেলেই ভুল হবে এবং সমস্ত বিষয়টা জগাখিচুরি পাকানো হবে। আবার ‘ফাসা জাদু ইল্লা ইবলিস’ হতেই হবে। ফাসাজাদু ইল্লা শয়তান বললেই ভুল হবে। বাক্যের ভাব ও দর্শন আর থাকবে না। অন্য আরও যে দুইটি রূপ ও গুণ আছে উহাও কোরানের এই বাক্যে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন ফাসাজাদু ইল্লা মরদুদ অথবা ফাসাজাদু ইল্লা খান্নাস বললেও ভুল হবে। কারণ বাক্যের ভাবধারার সঙ্গে আর মিলটি পাওয়া যাবে না। সুতরাং কোরানের প্রতিটি বাক্যের ভেতর সঠিক ভাব প্রকাশের ফর্মুলাটি লুকিয়ে আছে। এই ফর্মুলাগুলো ভালোভাবে জানা না থাকলেই ভাবের জগাখিচুরি হতে বাধ্য। বিভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝির ক্ষেত্রে তৈরি হয়ে যায় এবং তখনই ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি, ঝগড়াবিভক্তি তথা ফেরকাবাজির সূচনা হয়। তা না হলে ধর্ম বিষয়ে বলপ্রয়োগের প্রশ্নই ওঠে না। বলপ্রয়োগ শব্দটি তখনই আসবে যখন ভুল করা হবে। কারণ ভুল অনেক প্রকার হয় এবং অনেক প্রকার ভুল অনেক প্রকার ফেরকার জন্ম দেয়। সুতরাং ভুলের পেট্টেই ফেরকা নামক সত্তা নেরা বাস করে। ফেরকা নামক সত্তানদের এক রূপে পাওয়া যায় না। কোনো ফেরকার সত্তান ফর্সা, কোনোটা কালো, আবার কোনোটা

শ্যামলা। এখানে এসেই মানুষ মনের অজ্ঞানতায় ভুল করে ফেলে। ইহা ইচ্ছাকৃত ভুল নয়, ইহা অজ্ঞতার ভুল। এই ভুল থাকবেই। এই ভুল হতে পরিব্রাণ পাওয়াটা বই পড়ে জ্ঞান-অর্জন করে মোটেই সম্ভবপর নয়। যতই লিখাপড়া করুন, যতই গবেষণা করুন এবং যতই ঘোরাঘুরি করুন না কেন, এই ভুল হতে পরিব্রাণ পাওয়াটা মোটেই সম্ভবপর নয়। আমাদের এই কথাগুলোর মাঝে হতাশার ভাষা পাবেন, পাবেন নিষ্ঠুর নির্মম সিদ্ধান্ত, কিন্তু অতি অপ্রিয় হলেও উলঙ্গ সত্যকথাটি বলে গেলাম। এই ভুল হতে পরিব্রাণ পাবার বিষয়টি হলো তকদির। জন্মের আগেই আপনার তকদির নির্ধারিত হয়ে আছে, সুতরাং আমাকে যা-তা বলতে পারেন; কিন্তু তকদির খণ্ডাবার উপায় নাই। তকদির একমাত্র আল্লাহ পাক খণ্ডাতে পারেন, যদি তাঁর দয়া হয়। কারণ আশুনের মুবরাক (অপরিবর্তনীয়) তকদিরটিও কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহ পাক বদলিয়ে শাস্তির রূপটি ধারণ করার হুকুম দিয়েছিলেন বক্বু ইব্রাহিমের জন্য। সুতরাং আল্লাহর আশেক তথা প্রেমিক হতে চেষ্টা চালিয়ে যান। যদি আল্লাহর প্রেমিক হতে পারেন এবং আল্লাহ যদি প্রেমিকরূপে আপনাকে গ্রহণ করে নেন, তা হলে তাঁর রহমত এবং হিকমত জানতে পারেন।

‘আত তালেবুদ দুনিয়া মরদুদ’ যেখানে বলা হয়েছে সেখানে জোর করে শয়তান, ইবলিস আর খান্নাসটিকে ঢুকানোই যায় না। ঢুকাতে গেলেই

বাক্যের গঠনশৈলী এবং সঠিক অর্থটি আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।
আবার ঐ একই কথা আসছে, খান্নাস শব্দটির যে স্থান আছে সেখানে
শয়তান, ইবলিস আর মরদুদ শব্দগুলো বসানো যায় না। বসাতে গেলেই
ভুল হবে। এখানে সামান্য একটু বলছি যে, ধারণাটি কতখানি সঠিক।
মানুষের

মনটাকে ঝাঁকুনি দিবার জন্যই খান্নাস। প্রবল ঝাঁকুনি দেওয়াটাই
খান্নাসের চরিত্র। অবশ্যই শয়তান, ইবলিস, মরদুদ আর খান্নাসের
থাকবার একমাত্র স্থানটি হল অন্তর, তবে সবার অন্তর নয়। কেবলমাত্র
জ্বীন এবং মানুষের অন্তর। এই দুইজনার দুইটি অন্তর ছাড়া শয়তানের
থাকবার আর একটি জায়গাও নাই এবং কোরানের ফর্মুলা অনুসারে
থাকার বিধানটি রাখা হয় নাই। আরও একটি কথা বলে রাখা ভালো
যে, খান্নাস শব্দটি কোরানে মাত্র একবার ব্যবহার করা হয়েছে। খান্নাস
শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কোরানের ধারাবাহিকতা অনুসারে শেষ
সূরায়। কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভাব বহন করছে কোরানে,
অথচ মাত্র একবার ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ‘কাওসার’ ও ‘আহাদ’
শব্দ দুইটি মাত্র একবার করে কোরানে ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য
আমার চোখে জ্বীন এবং মানুষের নফসেই শয়তান থাকে। অন্য কোনো
জীবের নফসে শয়তানকে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। বার বার
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক কথাকেই বলা হচ্ছে শয়তান বিষয়টি পরিষ্কার করে

তুলে ধরার জন্য। আরও একটু পরিষ্কার করে বলে রাখা ভালো যে, চারটি রূপধারণ করা শয়তানটিকে হাকিকি শয়তান বলা হয়, তথা আসল শয়তান বা মূল শয়তান বলা হয়, কিন্তু ম্লেজাজি শয়তান নয়; কারণ ম্লেজাজি শয়তান তথা রূপক শয়তান তথা শরিয়তি শয়তান হল তিনটি এবং এই তিনটি শয়তান থাকে মক্কার মিনাতে। বড় শয়তান, ম্লেঝা শয়তান ও ছোট শয়তান। এই তিনটি শয়তানের কোনো কাজ করার ক্ষমতাই নাই, অথচ শয়তান বলে মানতেই হবে এবং দেখামাত্র ঘৃণাভরে পাথর ছুঁড়ে মারতেই হবে। কারণ শরিয়তের বিধানটি পালন করুন আর না-ই করুন, কিন্তু শরিয়তটিকে অস্বীকার করা যাবে না। শরিয়ত নিজেই জানে যে, এগুলো মোটেই শয়তান নয়, কিন্তু আসল তথা হাকিকি শয়তানকে পরিচয় করিয়ে দেবার একটি সুন্দর মাধ্যম। মূর্ত না থাকলে বিমূর্তটিকে মানুষ ধরতে পারে না এবং বিষয়টিকে বুঝতে কষ্ট হয়। আসল বিষয়টির পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই ব্যবহারিক বিধিবিধান দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিটি হাজি জানেন যে, মক্কার মিনায় অবস্থিত তিনটি শয়তানের একটিও আসল শয়তান নয়, বরং ম্লেজাজি শয়তান তথা শরিয়তি শয়তান। এই শরিয়তের আদেশ-নির্দেশ যাতে কুণ্ঠ করা না হয় তারই জন্য ম্লেজাজি পাথর; ম্লেজাজি শয়তান তিনটিকে হাজিরা সব সময় পাথর ছুঁড়ে মারছে। এমন কি ম্লেজাজি পাথর ছুঁড়তে গিয়ে প্রতি বছর বেশ কিছু হাজি পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে মারা যান।

হাকিকি শয়তান তথা আসল শয়তানের যদি মানুষ এবং জ্বিন ছাড়া আর কোথাও থাকার অনুমতি না থাকে তা হলে মক্কার মিনায় অবস্থিত তিনটি শয়তান যে ম্লেজাজি শয়তান তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ম্লেজাজি শয়তান তিনটি হাকিকি শয়তানের মূর্ত প্রতীক। প্রতীক ছাড়া যে কোনো এবাদত-বন্ধেগিই চলে না এটাই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ বিমূর্ত শয়তানের পরিচয়টি করিয়ে দেবার জন্যই ম্লেজাজি শয়তানের প্রয়োজন। সুতরাং, ম্লেজাজি শয়তান তিনটিকে পাথর হুঁড়ে মারাটিকেই যারা আসল শয়তানকে পাথর হুঁড়ে মারা মনে করে এবং বিশ্বাস করে তারা বোকা এবং অঙ্ক। বুঝিয়ে দেবার পরও যারা বুঝতে চায় না তাদেরকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কারণ তাদের তকদির তাদেরকে এই আসল বিষয়টি বুঝতে দেবে না। এই ধরনের মানুষকে গালি দিতে নাই, বরং সরে যাওয়াটাই ভালো। মনে করে নিতে হবে যে, এ ধরনের মানুষ বানাবার পিছনে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের কোনো উদ্দেশ্য আছে। কলা ছিলে খেতে হয়। ছিলকাটি কখনোই কলা নয়, অথচ আসল কলাটিকে ঢেকে রাখে। আসল কলাটিকে যে-ছিলকা ঢেকে রাখে সেই ছিলকাটিকে যারা কলা বলতে চায় তাদের দোষ দিয়ে লাভ নাই। কারণ তাদের তকদিরে আসল আর নকল চেনবার পার্থক্যজ্ঞানটি দেওয়া হয় নি। আসল আর নকল চেনবার

পার্থক্যজ্ঞানটিকে ফারকুন জ্ঞান বলা হয়। এবং এই ফারকুন জ্ঞান কাকে দেওয়া হয় সেই প্রশ্নে আল্লাহ ‘মাইয়া শাউ’ তথা যাকে খুশি তাকেই দান করা হয় বলে ঘোষণা করেছেন।

মক্কার মিনাতে অবস্থিত যে-তিনটি শয়তানকে হাজিরা পাথর ছুঁড়ে মারে উহা যেমন হাকিকি শয়তান নয়, বরং ম্লেজাজি শয়তান, ঠিক একই ভাবে এ-ও বলা যায় যে, মক্কায় অবস্থিত পবিত্র কাবা ঘরটি, যাকে আল্লাহর ঘর বলা হয় এবং যে কাবা ঘরটির জন্য হাজিরা হজ করতে যান, সেই কাবা ঘরটি হল ম্লেজাজি কাবা। ইহা কখনোই হাকিকি কাবা নয়। কারণ হাকিকি কাবা বিমূর্ত। হাকিকি কাবা মুমিনের দিলে অবস্থান করে। মুমিনের দিল ছাড়া হাকিকি কাবা পাওয়া যাবে না এবং পাবার কোরানিক আইন নাই। যে-কাবা মুমিনের দিলে অবস্থান করে সেই কাবা বিমূর্ত তথা অদৃশ্যমান তথা দেখা যায় না। যে কাবা দেখা যায় না অথচ আছে, উহাকে হাকিকি কাবা বলা হয়। আর যে-কাবা দেখা যায় তথা মূর্ত সেই দৃশ্যমান কাবাটিকে বলা হয় ম্লেজাজি কাবা। সুতরাং মক্কায় অবস্থিত দৃশ্যমান মূর্ত কাবাটি হলো ম্লেজাজি কাবা। সুতরাং যে-হাজিরা ম্লেজাজি কাবার হজ করার জন্য আসেন এবং হজ পালন করেন সেই সকল হাজিরা ম্লেজাজি হজ পালন করছেন। হাকিকি হজ পালন করার প্রশ্নই উঠে না। কারণ হাকিকি কাবার হজ করতে

চাইলে মানুষ মোমিন লাগবে। মানুষ মোমিন ছাড়া হাকিকি হজ পালন করার প্রশ্নই ওঠে না। মেজাজি কাবাতে আল্লাহ আছেন এমন কথাটি কোরানে নাই, বরং মানুষ মোমিনের সঙ্গে আল্লাহ আছেন এই কথাটি কোরানে আছে। সুতরাং মানুষ মোমিনের দিলটি হলো হাকিকি কাবা তথা আসল কাবা। হাকিকি কাবার যারা হজ করতে পেরেছেন তারা হাকিকি তথা আসল হাজি। আর যারা মেজাজি কাবার হজ পালন করেছেন তারা মেজাজি হাজি। মেজাজি হাজিদের মেজাজি কাবার মেজাজি হজ পালন করার সুনির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের নিয়মগুলোও মেজাজি নিয়ম। ইহা কখনোই হাকিকি নিয়ম নয়। এই মেজাজি হজ আর হাকিকি হজের বিষয়টি একদম খোলাসা করে যিনি বলে দিয়েছেন তিনিই সুলতানুল হিন্দ খাজা বাবা, তাঁর ফারসি ভাষায় রচিত মকতুবাত শরীফ-এ। আপসোস! ওহাবিদের অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধার্মিকদের কৌশলগত চাপের মুখে অনেক ওলির মহামূল্যবান বইগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে। ইহা উদ্ধার করার এবং প্রকাশ করার মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে। মুর্খিম্বেয় কিছু যারা আছেন তাদের আর্থিক সামর্থ্য নাই। এতবড় মহাসত্যটিকে উদ্ধার করার তরে আশা করি বিবেকবান এবং সত্য প্রকাশে আগ্রহীরা এগিয়ে আসবেন। মুসলমানদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝাবে যে ইহা মেজাজি হজ আর ইহা হাকিকি হজ। এখনও দৃশ্য দেখতে হয় যে, খোদা বলা ঠিক নয়, কারণ খোদা বললে সওয়াব কম পাওয়া যায়, আল্লাহ

বললে অনেক সওয়াব পাওয়া যায়। তাও এই নির্লজ্জ দৃশ্যটি টেলিভিশনের পর্দায় মহাজ্ঞানীর ভূমিকায় মোল্লাকে বলতে শুনি। সাধারণ মুসলমানদের বলে কিছু লাভ নাই। হায়রে আল্লামা ইকবাল, মাওলানা রুমি, হাফেজ সিরাজি, শানাই, ফরিদউদ্দিন আত্তার, ইমাম গাজালি, খাজা গরিব নেওয়াজ! আপনারা কেন খোদা লিখতে গেলেন? এদের কথার মারপ্যাচে মানুষ আজ দিশেহারা আর সাতান্নটি মুসলিম দেশের অবস্থানটি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে উহা আর বলে দিতে হয় না। অবশ্য এই ম্লেজাজি হজ্জের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা ঠিক নয় এ জন্য যে, ম্লেজাজি হজ্জটি মূর্ত, যাহা চর্ম চোখে দেখা যায়, কিন্তু হাকিকি হজ্জটি বিমূর্ত তথা চোখে দেখা যায় না। যাহা দেখা যায় উহারই অনুষ্ঠান হয় এবং অনুষ্ঠান পালন করা যায়। কিন্তু অনুষ্ঠান যদিও আসল বিষয়টি নয়, কিন্তু আসল বিষয়টি ধরিয়ে দেয়। অবশ্য সবার চোখে ধরা পড়ে না, তাই ম্লেজাজি হজ্জকেই আসল হজ্জ মনে করে। আগেকার দিনের ওলিরা ভাল করেই জানতেন যে মক্কার কাবা ঘরের হজ্জটি হল ম্লেজাজি হজ্জ। তাই তাঁরা এই ম্লেজাজি হজ্জটির বিষয়ে নীরবতা পালন করতেন। ম্লেজাজি হজ্জ পালন করলেই নামের আগে আলহাজ্জ শব্দটি বসানো যায়। আমরা দেখতে পাই যে, আগেকার দিনের ওলিদের নামের আগে আলহাজ্জ শব্দটি খুব কমই পাওয়া যেত। একমাত্র চিশতীয়া তরিকার মহারাজ খাজা বাবার দাদাপীরের নামের আগে হাজি শব্দটি দেখতে

পাই। খাজা বাবার দাদাপীরের নামটি হলো হাজি শরিফ জিনদানা। অথচ তাঁর মুরিদ এবং প্রধান খলিফার নামের আগে আলহাজ্জ কুতুবউদ্দিন, আলহাজ্জ শেখ ফরিদ, আলহাজ্জ আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরি, আলহাজ্জ বু আলী শাহ কলন্দর, আলহাজ্জ নিজামউদ্দিন আউলিয়া, আলহাজ্জ আমির খসরু, আলহাজ্জ শাহবাজ কলন্দর এবং আরও বহু আউলিয়াদের নামের আগে আলহাজ্জ টাইটেলটি দেখতে পাই না। আর এ যুগের আউলিয়াদের নামের আগে আলহাজ্জ থাকে কি না ইহা পাঠক বাবাদের আর বলে দিতে হবে না। যারা হাকিকি হজ্জটি সম্পন্ন করতে পেরেছেন তাদের নামের আগে হাজি শব্দটি খুব কমই ব্যবহার করতে দেখি। মোমিন কাবার হজ্জটি হল বিমূর্ত, যাহা চোখে দেখা যায় না, তাই হাজি শব্দটি কমই ব্যবহার করতে দেখি। সুতরাং ইহা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মেজাজি হজ্জটি মক্কায় অবস্থিত মেজাজি কাবায় গিয়ে করতে হয় এবং হাকিকি হজ্জটি মোমিনের দিল-কাবায় করতে হয়। একটি মূর্ত, অপরটি বিমূর্ত। সামাজিক আচার-আচরণের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে মেজাজি হজ্জের প্রাধান্যটি বেশি এবং মেজাজি হাজিদেরকেই হাজি বলে ডাকা হয়। এই হাজি টাইটেলটি অর্জন করতে হলে মেজাজি হজ্জবৃত্ত পালন করতেই হবে এবং এরই জন্য প্রতিবছর এত আয়োজন। এই আয়োজনের বিলাসিতা দেখে অনেকেই হাকিকি হজ্জের কথাটি বললে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। অনেকে তো

রাগ করে এটাসেটা বলতে চায়। খাবার খেতে আনন্দ লাগে, কিন্তু খাবার পেটে গিয়ে কী কী কাজ করে সেটা শুনতে আনন্দ লাগে না। বাহিরের চাকচিক্যটাই বেশি চোখে ধরা পড়ে, কিন্তু ভেতরের জিনিসটি জ্ঞানবার আগ্রহ সবার থাকে না। আচার এবং অনুষ্ঠান যখন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যটি হারিয়ে ফেলে তখনই উহা অনাচারে পরিণত হয়। ঘরবাড়ি ছেড়ে বনে গেলেই ফকির হওয়া যায় না, বরং ফকির তখনই হওয়া যায় যখন সাধক আপন নফস হতে (রুহ হতে নয়) খান্নাসরুপী শয়তানটিকে বাহির করে দিতে পারে তথা তাকে মুসলমান বানিয়ে ফেলতে পারে।

ইসলাম ধর্মের যে বিষয়গুলির বাহির এবং ভেতর দুইটি দিকই আছে সেই বিষয়গুলি পালনের মাঝে তো অবশ্যই আন্তরিকতা থাকতে হবে; কিন্তু যত আন্তরিকতাই থাক না কেন, সেই বিষয়গুলোর পালনকারীর সঙ্গে আল্লাহ পাক থাকেন না। যে কোনো বিষয়ের যদি দুইটি দিক থাকে : একটি বাহির

এবং অপরটি ভেতর, যাহাকে আমরা ম্লেজাজি (বাহির) এবং হাকিকি (ভেতর) বলে থাকি, সেই বিষয়গুলোর একটিতেও আল্লাহ আছেন অথবা থাকেন শব্দটি পাওয়া যায় না। যেমন ধরুন হজের বিষয়টিতে ম্লেজাজি এবং হাকিকি হজ আছে, তাই কোরান একবারও বলে নি যে, আল্লাহ পাক হাজিদের সাথে থাকেন (ইন্নাল্লাহা মাআল্ হজ্জাজ্)। হজের

অবশ্যই বহু উপকারিতা আছে এবং বহু সওয়াব পাওয়া যাবার কথাগুলো আছে, কিন্তু হাজিদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন অথবা থাকেন এ ধরনের একটি বাক্য তথা আয়াতও পুরা কোরানে নাই বা পাওয়া যাবে না। যেসব বিষয়ের বাহির (ম্বেজাজি) এবং ভেতর (হাকিকি) বলতে কিছুই বুঝবার উপায় থাকে না অথবা বাহির ও ভেতর দুটো ভাগ করে দেখানো যায় না সেই বিষয়গুলোতে আল্লাহ পাক আছেন অথবা থাকেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন ধরুন, ধৈর্যধারণের বিষয়টি। ধৈর্যধারণের বাহিরও নাই, ভেতরও নাই। তার মানে, ধৈর্যধারণ মানেই হলো ধৈর্যধারণ। ইহার কোনো ম্বেজাজিও নাই হাকিকিও নাই। তাই আল্লাহ পাক কোরানে বলছেন যে, তিনি ধৈর্যধারণকারীদের সঙ্গে আছেন অথবা থাকেন (ইন্নালাহা মাআস্ সাবেরিন)। ভাল করে বিষয়টি লক্ষ করে দেখুন যে, আল্লাহ পাক ইমানদারদেরকে আল্লাহর সাহায্য চাইতে বলছেন ধৈর্য এবং নামাজের মাধ্যমে (বে সোয়াবরে ও সালাতে), কিন্তু শেষ বাক্যে তথা আয়াতে তিনি ধৈর্যধারণকারীর সঙ্গে থাকার কথাটি জানিয়ে দিলেন। সাহায্য চাইবার শর্ত দিলেন দুইটি : একটি সবার (ধৈর্য) এবং অপরটি সালাত (নামাজ), অথচ অবশেষে সবারকারীর সঙ্গে থাকেন বলে ঘোষণাটি দিলেন (ইন্নালাহা মাআস্ সাবেরিন)। আল্লাহ নামাজের মাধ্যমে ইমানদারকে সাহায্য চাইতে বললেন, অথচ অবশেষে এই কথাটি বললেন না যে, আমি নামাজির সঙ্গে আছি (ইন্নালাহা

মাত্মাল্ মুসাল্লিন)। আল্লাহ নামাজীদের সঙ্গে থাকেন অথবা আছেন এ ধরনের একটি বাক্য বা আয়াত পুরা কোরানে নাই। এই কথাটির গোপন রহস্য বুঝাটি সহজ কথা নয়। কারণ নামাজের কথাটি বিরামিবার কোরানে বলা হয়েছে এবং নামাজ জাম্বাতের চাবি, হাদিসে বলা হয়েছে; কিন্তু একটিবারও কোরানে বলা হয়নি যে, আল্লাহ নামাজীদের সঙ্গে আছেন অথবা থাকেন (ইল্লাল্লাহু মাত্মাল্ মুসাল্লিনা)। নামাজের ভেতর মেরাজি নামাজ এবং হাকিকি নামাজ আছে। ওয়াজিয়া নামাজ হলো মেরাজি নামাজ আর হাকিকি নামাজ হল দায়েমি নামাজ তথা দায়েমি সালাত। দায়েমি নামাজ তথা হাকিকি নামাজটি সকল নবীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য, কিন্তু ওয়াজিয়া নামাজটি চালু হয় মহানবীর সময় হতে। ইহা কোনো নূতন কথা নয়। ইহা কমবেশি সবাই জানে। কারণ অন্যান্য নবীদের বেলায় যে-নামাজ কায়েমের কথাটি পাই উহা দায়েমি নামাজ বা সালাত। অবশ্য আনুষ্ঠানিকতার প্রকারভেদ থাকতে পারে, কিন্তু উহার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ আমরা দেখতে পাই না। ওহাবিরা দায়েমি সালাতটির কথা এড়িয়ে যান, কারণ দায়েমি সালাত হল চব্বিশ ঘণ্টা সালাতে ডুবে থাকা। চব্বিশ ঘণ্টা সালাতে কেমন করে ডুবে থাকতে হবে ইহা ওহাবিরা মেনে নিতে চান না এ জন্য যে, তাহলে সুফিবাদের প্রকাশ্য স্বীকৃতিটি দেওয়া হয়। তাই ওহাবিরা ওয়াজিয়া নামাজটিকেই একমাত্র নামাজ বলে গুরুত্ব দান করেন। ওহাবিরা

মহানবীর সেই বিখ্যাত হাদিসটি ভুলেও উচ্চারণ করেন না : মহানবী বলেন, ‘দায়েমি সালাত ওয়াক্টিয়া সালাত হতে অনেক মর্যাদাবান।’ সালাতুদ দাওয়ামী আফজালুম মিনাশ সালাতিল ওয়াক্টি। তা ছাড়া আরও লক্ষ করার বিষয়টি হলো, কোরানে ম্লেজাজি সালাতের উল্লেখটি স্পর্শভাবে করতে দেখি না। অথচ কোরানের সূরা ম্বারেজে স্পর্শ করে দায়েমি সালাতের উল্লেখটি পাই। যেমন-মুসল্লিরা দায়েমি সালাত পালন করেন (আল্লাজিনা হুম আন সালাতিহিন্ন দায়েমুনা)! দায়েমি সালাত তথা হাকিকি সালাত তথা নামাজ কায়েমের কথাটি স্পর্শ করে কোরানে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ ওয়াক্টিয়া সালাত তথা ম্লেজাজি সালাতের উল্লেখটি স্পর্শ করতে দেখি না। অনেকেই সূরা বনি ইস্রাইলের আটাত্তর নম্বর আয়াতটিকে ওয়াক্টিয়া সালাতের দলিলরূপে দাঁড় করান। আল্লামা জাম্বাকসুরি তাঁর রচিত তফসিরে কাশ্শাফ-এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দলিলটি সূরা বনি ইস্রাইলের আটাত্তর নম্বর আয়াতটি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। আল্লামা জাম্বাকসুরি এই গবেষণাটির জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ পাবার যোগ্য, যদিও উনি মোতাজিলা ফেরকার অনুসারী। গবেষণাটির মধ্যে ভুল থাকতে পারে, কিন্তু গবেষণার মাধ্যমেই জ্ঞানের আলোটি ধাপে ধাপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই কোনো গবেষণাকেই খার্টো করে দেখতে নাই। যে জাতি গবেষণার মাধ্যম

আঘাত করেছে সেই জাতির ভাগ্যে লাঞ্ছনার গ্লানি অবধারিত ভাবে আসবে এবং আসছে।

মক্কার মিনাতে যে-তিনটি শয়তানকে পাথর মারতে হয় উহা যেমন ম্লেজাজি শয়তান, তথা প্রতীকী শয়তান, তথা রূপক শয়তান সে রকম ওয়াস্তিয়া সালাতটি হলো ম্লেজাজি সালাত, তথা প্রতীকী সালাত। ম্লেজাজি শয়তান তিনটিকে পাথর মারা যেমন হাজিদের জন্য ফরজ তেমন মুসল্লিদের ওয়াস্তিয়া সালাত, তথা ম্লেজাজি সালাত, তথা প্রতীকী সালাত পালন করাটি ফরজ। কারণ ম্লেজাজি শয়তান তিনটিকে হাজিদের এ জন্য পাথর মারতে হয় যে, ম্লেজাজি শয়তান তিনটিকে পাথর মারার মধ্য দিয়ে

হাকিকি শয়তানটিকে কেমন করে পাথর মারতে হবে তা মনে করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই ব্যবস্থাপত্র। ইহাকে অস্বীকার করলে শরিয়তের একটি মূল্যবান অংশকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। কারণ ম্লেজাজি শয়তান মূর্ত, তথা চোখে দেখা যায় আর হাকিকি শয়তান তথা আসল শয়তানটি হল বিমূর্ত, তথা চোখে দেখা যায় না। ম্লেজাজি ওয়াস্তিয়া সালাত পালন করতে করতে দায়েমি সালাতের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। তাই ম্লেজাজি সালাত মূর্ত তথা চোখে দেখা যায়, কিন্তু হাকিকি সালাত বিমূর্ত তথা চোখে দেখা যায় না। ওয়াস্তিয়া সালাত এ জন্য ম্লেজাজি

সালাত যে, রুকু-সেজদা-সূরা-কেরাতের মূর্ত রূপটি খালি চোখে দেখা যায়, কিন্তু দায়েম্মি সালাত তথা হাকিকি সালাতের মধ্যে আনুষ্ঠানিকতা থাকে না, তথা রুকু-সেজদা-সূরা-কেরাত থাকে না। কারণ দায়েম্মি সালাত পালন করতে হয় দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। তাই দায়েম্মি সালাত যিনি পালন করছেন তাঁকে চেনা যায় না, জানা যায় না। কারণ দায়েম্মি সালাত বিমূর্ত তথা তাকে খালি চোখে দেখা যায় না। তাই ওয়াক্টিয়া সালাত হলো জাহের এবং দায়েম্মি সালাত হলো বাতেন। তাই জাহের এবং বাতেনটিকে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দেওয়া হয়েছে। কেউ এর রহস্য ধরতে পারে, কেউ পারে না। অনেকে জাহের এবং বাতেনের রহস্য বুঝতে পেরেও আসলের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। এটাই তকদির। জাহের এবং বাতেন দুটোই পরিষ্কার বুঝতে পারে এবং এগিয়ে যাবার চেষ্টাও চালিয়ে যায়; কিন্তু রহস্যের সাগরে অবগাহন করতে পারে না। এই না পারাটাই তকদির। এ জন্যই সবরের কথাটি আসে। কারণ বার বার চেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য সবরের প্রয়োজন। এই সবরের ওপর যার আস্থা আছে এবং বিরাট সবর বুকে ধারণ করে এগিয়ে যায়, তারা অবশ্যই কাম্মিয়ার হতে পারে। কারণ আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন এ কথাটি কোরানে বলা হয়েছে। এই বিরাট সবরটি পালন করাটাও তকদির। আপন আপন তকদির সবরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, আবার আপন আপন তকদিরে সবর করতে পারে

না। জানে সবার করতে হবে, কিন্তু জানবার পরও সবার করতে পারে না।
এই না পারাটাও তকদির। কেউ ওয়াস্তিয়া সালাত পালন করে চলছেন
তথা মেজাজি সালাতে অবহেলা নাই, কিন্তু দায়েমি সালাতের গুরুত্ব,
যাহা কোরান হাদিসে বলা আছে জেনেও গুরুত্ব দেয় না এবং পালন করা
হতে এড়িয়ে চলে। এই এড়িয়ে চলাটাও তকদির। কেউ মেজাজি সালাত
তথা ওয়াস্তিয়া সালাতটিকে একমাত্র সালাত মনে করছে এবং দায়েমি
সালাতটিকে সরাসরি অস্বীকার করে এবং নানা প্রকার আজেবাজে কথা
শুনিয়ে দেয়। এই অস্বীকার করাটাও তকদির। সুতরাং জন্মের পূর্বেই যাহা
তকদিরে নির্ধারণ করা হয়েছে উহা খণ্ডানো যায় না। সুতরাং কাহাকেও
দোষ দেওয়া যায় না। কারণ আল্লাহ পাকের সৃষ্টিরাজ্যে কোথাও কিছু
পরিমাণ ভুল নাই। এই কথাটি কোরানের সূরা মূলকে পরিষ্কার বলে
দেওয়া হয়েছে।

আদর্শলিপি কোনো সাহিত্য নয়। সাহিত্যের প্রশ্নে এর মূল্য শূন্য।
আদর্শলিপিকে সাহিত্য বললে হাসবে। অথচ এই আদর্শলিপি সবাইকে
পাঠ করতে হয়েছে। বড় বড় সাহিত্যিকদের একদিন মনোযোগ সহকারে
এই আদর্শলিপি পাঠ করতে হয়েছে। এই আদর্শলিপিই একজন
সাহিত্যিককে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এগিয়ে যাবার পর আর আদর্শলিপি
হাতে নিতে হয় না। নেবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। নেবার প্রয়োজনটি

আপসে আর থাকে না। ইসলামের মেনাজ্জি বিষয়গুলো আদর্শলিপির মতো প্রথম পাঠ। প্রথম পাঠ অতিক্রম করতে পারলে মেনাজ্জি বিষয়গুলোর প্রয়োজন থাকে না। যিনি বা যারা মেনাজ্জি বিষয়গুলোর উর্ধ্বে ওঠে গেছেন কেবল তাদের জন্য আর দরকার হয় না। কিন্তু ইসলামের মেনাজ্জি বিষয়গুলোর প্রয়োজন আছে এ জন্য যে, এই মেনাজ্জি বিষয়গুলো পাঠ করার পরই আসল বিষয়গুলোতে অবস্থান করতে পেরেছে। আসল বিষয়গুলো তথা হাকিকি বিষয়গুলোতে যারা আসতে পেরেছে তাদের জন্য মেনাজ্জি বিষয়গুলোর আর প্রয়োজন থাকে না। মেনাজ্জি বিষয়গুলোর আলোচনা করতে পারে এবং অপরকে শিক্ষা দেবার জন্য বুঝাতে পারে, কিন্তু নিজের জন্য আর দরকার হয় না। এটা একটি অতি সাধারণ কথা। একটি হাল্কা পাতলা উপদেশ। একজন এম এ পাশ ব্যক্তি যদি বসে বসে একা একা আদর্শলিপি পাঠ করতে থাকেন তো অন্যলোকেরা এই পাঠ দেখে অবাক হবে, চমকে যাবে এবং মনে মনে মাথায় গুপ্তগোল হয়েছে কি না ভাববে। আবার পাশে যদি নাতির বয়সের কেউ থাকে তা হলে অবাক হবে না এবং পাগল হবার চিন্তাটি করবে না। কারণ তখন মনে করা হবে যে, এই আদর্শলিপিটি নাতিকে পড়াবার জন্য পড়ছেন, নিজের জন্য নয়। কারণ যিনি নাতিকে আদর্শলিপি পড়াচ্ছেন তিনি আদর্শলিপির বহু উর্ধ্বে। অপরকে আদর্শলিপি শিক্ষা দেবার জন্য ছাত্র হতে বেশি পাঠ করতে হয়, অথচ

এই বেশি পড়াটা নিজের জন্য নয়, বরং ছাত্রকে শিক্ষা দেবার জন্য। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ভালো করে জানা না থাকলে খান্নাসমিশ্রিত খেসাল (খাইসলত) অনেক রকম ধোঁকা দিতে পারে এবং দিচ্ছে এবং এর নমুনা এত বেশি হয়ে গেছে যে, সারা জীবন আদর্শলিপিই পাঠ করতে হবে। অনেকটা মাছি-মারা কেরানির মতো। অনেকটা অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের ধর্মান্ধতার মতো, যা কেবল সমাজের বুকে হিংসা, মারামারি করতে উৎসাহ যোগায়। গবেষণার পার্থক্যটি রুদ্ধ করে দেয় এবং একই স্থানে অবস্থান করার বলপ্রয়োগ করে ও চালিয়ে যায়। এ রকম করে করেই সমাজের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানটির মাথায় আঘাত করা হয় এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানটিকে ধর্মান্ধতার কুফলে মারামারির পর্যায়ে নামিয়ে দেয় এবং লেংড়া যুক্তিতর্কের ধুম্রজাল তৈরি করে। আমরা এখন কোন ধর্মান্ধতার পর্যায়ে নেমে এসেছি তা সবাই কমবেশি বুঝতে পারছি। মক্কার মিনাতে অবস্থিত তিনটি শয়তান আসলে কোনো শয়তানই নয়। কোরানের দৃষ্টিতেও এই তিনটি শয়তান মোটেও শয়তান নয়। কারণ শয়তানকে থাকবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে মাত্র দুইটি স্থানে। এর বাইরে থাকার সামান্য অনুমতি নাই। একটি জ্বিনের অন্তর এবং অপরটি মানুষের অন্তর। জ্বিন ও ইনসানের শরীরেও থাকার অনুমতি নাই। কেবলমাত্র দু'জনার দুটি অন্তর। সুতরাং মক্কার মিনাতে তিনটি শয়তান

থাকে কী করে? মক্ষার মিনাটি তো জ্বিন ও ইনসানের অন্তর নহে। তা ছাড়া মিনা নামক স্থানটি তো তৌহিদে বাস করে। তৌহিদের রাজ্যে শয়তান থাকতে পারে না। শয়তান ডেজাল আর তৌহিদ খাঁটি। এই তিনটি শয়তান জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করার আদর্শলিপি। এখানে জ্ঞানরাজ্য বলতে তৌহিদের দেশ বুঝাতে চেয়েছি। তাই হাজিরা হজ্জ করতে গিয়ে এই তিনটি শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মারে। হাজিরা জানে যে, ইহারা মোটেও শয়তান নয়, বরং বিমূর্ত রূপের শয়তানের মূর্ত রূপ। মূর্ত রূপটিই হল বিবর্তনের কণস্থায়ী একটি রূপ। পদ্মার বিশাল বালুচর। হাঁটলেন, পাখি শিকার করলেন, তারপর? পরের বছর গিয়ে দেখতে পেলেন, বিশাল বালুচরটি উধাও হয়ে গেছে। পানির ঢেউ বইছে। কাল বালুচর আজ পানি। বিবর্তনের কত কণিক রূপ! তাই এই তিনটি শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মারার মধ্যে দিয়ে আপন আপন অন্তরে অবস্থান করা শয়তানটিকে পাথর মারার শিক্ষা দিচ্ছে। আসল শয়তানকে চিনিয়ে দেবার জন্য, ধরিয়ে দেবার জন্য, পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য এই তিনটি শয়তান হলো আদর্শলিপি। বর্ণমালার পাঠ নেবার পাঠশালা। সুতরাং ইহাই শরিয়ত। রূপক ভাষায় : শরিয়ত মাথা আর মারেফত মগজ। রূপক ভাষায় : দেহটি শরিয়ত আর জীবাত্মাটি মারেফত। বর্ণনা দিতে গিয়ে কিছুটা ভুল করলাম, কিন্তু আর কোনো নির্ভুল উপমা তুলে ধরতে পারলাম না। আসল বিষয়টি বুঝতে পারলেই যথেষ্ট। রূপকের

আবরণে যারা রূপকটিকেই আসল মনে করে তারাই শূন্যতার ফাঁদে পড়ে যায়। শূন্যতার পেটে শূন্যই থাকে। তাই এরা আর আসল বিষয়টি বুঝে উঠতে পারে না। যেমন বুঝে উঠতে পারেন নি ইমাম আহমদ হাম্বল আর ইমাম তাইমিয়া, ইবনে কাসির, আবদুল অহাব নজ্দি। ইসলামের নামে এরা যে দর্শন লিখে ও প্রচার করে গেছেন তা ইসলাম নয়। যর্কিনমধু যেমন মধু নয়, এদের ইসলামি দর্শনও ইসলাম নয়। কারণ এরা নবীর বংশধরদের মানেন না। এরা কেতাব মানেন, কিন্তু নবীর বংশধরকে মানেন না। এরা কেতাব আর নবীর সুলত মানেন না। কী চমৎকার! কারণ নবীর বংশধরদের মানতে গেলেই সুফিবাদকে মেনে নিতে হয়। মহানবীর উপদেশ : কেতাব আর নবীর বংশকে শক্ত হাতে ধরে রেখো, তা হলে তোমাদের পতন নাই। আজ সাতান্নটি মুসলিম দেশ কোন পতনের বিন্ধুতে দাঁড়িয়ে আছি তা-ও কি বলে দিতে হবে?

তকদিরের বিধান

জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য আদর্শলিপির যতখানি প্রয়োজন, আনুষ্ঠানিক ধর্মপালনের জন্য অনুষ্ঠানগুলোর প্রয়োজন তিক ততখানি। আদর্শলিপিকে একমাত্র ধর্ম বললে ভুল করা হবে। অনুষ্ঠানের ক্ষমতা নাই সত্যসাগরে অবগাহন করানোর, বরং সত্যসাগরে অবগাহনের পথটুকু

দেখিয়ে দিতে পারে। অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ইহাই একমাত্র ধর্ম মনে করে নিলে বিরাট ভুল করা হবে। আজ এই ভুলটি সমাজের বুকে এত বেশি ছড়িয়ে পড়েছে যে, আসল বিষয়টি দিনে দিনেই চাপা পড়ে যাচ্ছে। বেশির ভাগ মানুষ মনেই করতে চায় না যে, এই অনুষ্ঠানগুলোর মাঝে এমন সত্য থাকতে পারে। মক্কার মিনার তিনটি শয়তান যেমন মোটেই শয়তান নয়, বরং মেক্কা'জি শয়তান; আসল চারটি শয়তান, যেথা শয়তান, ইবলিস, মরদুদ এবং খান্নাসকে চিনাবার, জানাবার এবং বুঝাবার জন্য মক্কার মিনার তিনটি শয়তান হলো আদর্শলিপি। মেক্কা'জি শয়তান রাখা হয়েছে আসল শয়তানকে চিনবার, জানবার এবং বুঝবার জন্য। আসল কাবাটিকে চিনবার, জানবার এবং বুঝবার জন্য মক্কা'য় রাখা হয়েছে মেক্কা'জি কাবা। মেক্কা'জি কাবাটি হলো আসল কাবাটিকে চিনিয়ে দেবার জন্য, ধরিয়ে দেবার জন্য একটি আদর্শলিপির খণ্ডিত অধ্যায়। পুরো ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো যদি একটি আদর্শলিপি হয়, তা হলে মেক্কা'জি শয়তান এবং মেক্কা'জি কাবাটি আদর্শলিপির দুইটি খণ্ডিত অধ্যায়। অনেকেই মক্কা'য় অবস্থিত কাবা ঘরটিকে আসল কাবা মনে করে ফেলে। অথচ তারা জানে না যে, ইহা নিছক মেক্কা'জি কাবা। তা হলে আসল কাবা কোনটি? আসল কাবাটি হাকিকি, তাই দেখা যায় না। আসল কাবা বিমূর্ত, তথা দেখা যায় না। মেক্কা'জি কাবা মূর্ত, তাই সবাই দেখতে পারে। সাধারণ মানুষ মূর্তটিকে আসল মনে করে ফেলেন।

এই ভুলগুলো ভাঙ্গিয়ে দিলেই বুঝতে পারে। যারা জানে না যে এটা আসল

কাবা নয় বরং মেজাজি কাবা, তাদের কাছে আসল কাবার বিষয়টি সাধারণ মানুষ জানতে চেয়ে জানতে পারে না। কারণ সে-ই তো আসল কাবা কাকে বলে জানে না, তথা এই বিষয়টিতে অন্ধ। সুতরাং অন্ধ যখন সাধারণকে পথ দেখাতে যায় তখন সবাই গর্তে পড়ে। যিনি আসল কাবার পরিচয় জানেন তার কাছে কাবার পরিচয় জানতে চাইলে বলে দেবেন যে, মোমিনের দিলটি হলো আসল কাবা তথা হাকিকি কাবা এবং মক্কার কাবাটি হলো মেজাজি কাবা। যিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন আসল কাবা এবং মেজাজি কাবা তার কথা মতো মোমিনের দিল-কাবা তথা আসল কাবাটি দেখতে গেলেন। ভালো করে মোমিনের দিল-কাবাটিকে দেখে নিলেন, কিন্তু আপনার পছন্দ হলো না। মনে মনে বললেন, এ আবার কেমন কাবা! এ আবার কেমন করে মোমিন হলেন? এর তো পরনের ফরজ কাপড়টুকুও নাই, বা এই মোমিন তো সম্পূর্ণ উলঙ্গ, অথবা এই মোমিনের চালচলন কথাবার্তা ভালোও লাগছে আবার কিছু অংশ পছন্দও হচ্ছে না, সুতরাং এই মোমিনকে কেমন করে গুরু বলে মেনে নিই! এখানেই তকদির। তকদিরে থাকলে পাবেন। তকদিরে না থাকলে সামনে জ্যান্ত কাবা দেখেও মুখ ফিরিয়ে নেবেন। এখানে চাইলেই পাবেন, তা হয় না। যে চায় সে পায়, এই বাক্যটি সম্পূর্ণ অচল।

এটাই তকদির। জন্মের আগেই পূর্বের কেয়ামত ঘটে যাবার কর্মফল নিয়ে এসেছেন। কর্মফলে লিখা নাই পাবার, তাই শত চাইলেও আপনি পাবেন না। এটা আলু-পটল নয় যে বাজারে গিয়ে চাইলেই কিনে নিতে পারবেন। এটা এলম্বো লাডুনি, এটা এলম্বো তাসাউফ, এটা এলম্বো মারেফত-এই দেশে যাইতে চাইলেই যাওয়া যায় না, বরং তকদিরে থাকলে যেতে পারবেন। অন্যথায় অসম্ভব। অন্যথায় কাছে থেকেও দূরে চলে যাবেন। মন-মগজের গভীরে, যুক্তি-তর্কের অনেক নিচে, দর্শনের ভেতরে যে আর একটি দর্শন লুকিয়ে আছে সেটাই তকদির। এ জন্য তকদির বিষয়টির আলোচনা করতে গেলেই বড় বড় পণ্ডিতরা রাগে গরগর করতে থাকেন। রাগে গরগর করছেন যেসব পণ্ডিতেরা, সেই রাগ করাটাও তাদের তকদির। তকদিরে লিখা না থাকলে রাগে গরগর করাটাও অসম্ভব। যিনি বা যারা অর্ধউলঙ্গ দেখেও, উল্টাপাল্টা কথা শুনেও গুরুরূপে গ্রহণ করে নিলেন, এটাও তাদের তকদির। তকদিরে লিখা ছিল বলে গুরুরূপে মেনে নিতে পোরছেন। যিনি বা যারা মোমিনরূপী কাবা বারবার দর্শন করলেন, এটা-সেটা গুরুদক্ষিণা দিলেন, কিছু গুরুরূপে গ্রহণ করে নিতে পারলেন না, এই না পারাটাও তাদের তকদির। যিনি বা যারা বেশ কিছুদিন গুরুরূপে মেনে নিয়ে গুরুর সেবায়ত্ন করলেন তারপর আর ভালো লাগলো না, এই ভালো লাগলো না-টাও তার বা তাদের তকদির। যিনি বা যারা মোমিনের দিল-কাবা

একটার পর একটা দেখে যাচ্ছেন এবং একটিও পছন্দ হচ্ছে না, এই পছন্দ না হওয়াটাও তার বা তাদের তকদির। যিনি বা যারা মনে করলেন, মোম্বিনের দিল-কাবা বলে কিছু নাই, এই মোম্বিনের দিল-কাবা বলে কিছু নাই মনে করাটাও তার অথবা তাদের তকদির। যিনি বা যারা মক্কার কাবাটিই আসল কাবা মনে করে নিলেন, এই মনে করাটাও তার অথবা তাদের তকদির। সুতরাং এই অদ্ভুত রহস্যময় তকদির যার যার পূর্ব কেয়ামতের কর্মফলের খেলা খেলে চলছে। এই তকদিরের খেলাটিকে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা দান করেন, যাকে ইচ্ছা দান করেন না-বলার মাঝে আল্লাহর উপর যা-তা মন্তব্য করার সাহস না পেয়ে অনুবাদ করেন এভাবে যে, যিনি চান তাকে দান করেন এবং যিনি চান না তাকে দান করেন না। লেখক তখন পাইকারি সাম্র্যের আলুপটলের কেছা গুনিয়ে নিজে তৃপ্তি পান এবং অপরকেও তৃপ্তির ঢেকুর তোলা জ্ঞান বিতরণ করেন। এটাও এক ধরনের অজ্ঞতা। অজ্ঞতার অগণিত স্তর আছে। মানুষ যতটুকু বোঝে ততটুকু নিয়েই আশ্ফালন করে। মাওলানা রুম্মির পীর সাহেব শামসেস্তাব্রিজ যে রহস্যের কথা বলছেন উহা গুনলে আমি নিজেও অবাক হই। না জেনে না বুঝে অধম লিখকও কি কম আশ্ফালন করে! এই আশ্ফালন আম্মিত্বের নিয়তে করলেই দোষণীয়। নতুবা নয়। ইহা প্রত্যেকের নিয়তের ওপর নির্ভর করে। ইমাম গাজ্জালি যখন জ্ঞানসাধনা করে বুঝতে পারলেন যে, ইলমে

লাদুনি তথা গুপ্তজ্ঞান অর্জন করতে হলে পীর ধরতে হবে, নতুবা বই পড়ে অসম্ভব-তখনই ইমাম গাজ্জালি এহিয়ায়ে উলুম এবং কিমিয়ায়ে সাদাত নামক দুইটি বিরাট গ্রন্থ লিখে ফেললেন। এই দুইটি গ্রন্থ লিখার আগে উনি পীর ধরেন নি। বই দুইটি লিখার পর যখন হজরত বাবা আবু আলি ফারমাদির কাছে মুরিদ হতে গেলেন তখন পীর সাহেব বললেন যে, তুমি তো ইলমে লাদুনি তথা গুপ্তজ্ঞানের কিছুই জানো না। ইমাম গাজ্জালি বিনয়ের সহিত পীর সাহেবের কথাগুলো শ্রবণে নিলেন এবং মুরিদ হলেন। পীর সাহেব ইলমে লাদুনির সবকিছু দিতে লাগলেন। তারপর মোরাকাবা-মোশাহেদা করার জন্য ছয় বছর একটানা নির্ধারণ করে দিলেন এবং সেই অনুসারে ছয় বছর মোরাকাবা করার পর আর একটি লাইনও লিখেন নাই। তারপর উনার কাছে অনেকে মুরিদ হন এবং আজব আজব কথা বলতেন। উনি বলতেন যে, মাথার এলিম আর সিনার এলিমে আকাশ-পাতাল পার্বক্য। সিনার এলিম ধ্যানসাধনা করে পাওয়া যায়, বই পড়ে পাওয়া যায় না। বইতে পড়েছি যে, ইমাম গাজ্জালি পর্দা নেবার আগে ভক্তদেরকে ‘মাশুকের ডাক এসেছে’ বললেন। তারপর তিনি নিজের কাফনের

কাপড় নিজ হাতে কেটে গোসল করে পরে শুয়ে পড়লেন। ইমাম গাজ্জালির একমাত্র কন্যা সিতুল মুনাকে কিছু বলার পর ডান পাশে মুখ রেখে বললেন ‘আম্মার, মাশুক, আম্মার আল্লাহ আম্মাকে নিতে

এসেছেন।’ এলম্বে লাদুনি হাসেল করলে বাক্য-ভাষা-যুক্তি-তর্ক আর থাকে না। কারণ মাথার এলম্বের যেখানে কবর সেখানে থেকেই সিনার এলম্ব শুরু হয়। সুতরাং এ বিষয়ে আর এগিয়ে যেতে চাই না। যে যে-রকম বোঝে সে সে-রকমই বলে ও লিখে। এই এক একজনের এক এক রকম বোঝাটাও যার যার তকদিরের খেলা। এই তকদিরের খেলা খড়ানো যায় না। সুতরাং যে চায় সে পায় এবং যে চায় না সে পায় না কথাটি দিয়ে আল্লাহকে স্বেচ্ছারিতার ছকে ফেলা ঠিক নয়। না বুঝতে পারলে সোজা বলে দিন যে, এটা বুঝতে পারলাম না। ব্যাকরণের ছকে ফেলে নিজের মতো করে কেন ভাবতে যাবেন, কেন লিখতে যাবেন? অবশ্য গবেষণার প্রশ্নে নিয়তের পবিত্রতা নিয়ে লিখলে আল্লাহ পাক কল্যাণ করে দেন। মাওলানা জালালউদ্দিন রুমির পীর সাহেব বাবা শামসেস্তাব্রিজের একটি বিষয় জানবার পর অধম লিখক থ’ মেরে বসে পড়লাম। আমার অজ্ঞতার বৃত্তি যে এত দুর্বল ভাবতে পারি নি। অনেক লজ্জা পেলাম আর ভাবলাম সাগরের জল কালি আর গাছগুলো কলম হলেও আল্লাহর রহস্য লিখে শেষ করা যাবে না (হবহ নয়)।

আদম এবং শয়তান বিষয়টির উপর শামসেস্তাব্রিজ যা বলে গেছেন তা বাজারে অচল। এই বিষয়টি এতই চমকপ্রদ এবং অবাক করে দেয় যে, কোনোদিন তা এমন কি ভাববার কল্পনাও করি নাই। তিনি

(শামসেস্তাব্রিজ) বলেছেন যে, আজাজিল ছয় কোটি বছর এবাদত করেছেন এবং আজাজিলের এবাদতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে ফেরেস্টাদের সরদার নিযুক্ত করলেন আল্লাহ। আজাজিল জ্বিন। আজাজিল কখনোই ফেরেস্টা নন। কারণ ফেরেস্টা শব্দটি শুনতে যতই ভালো লাগুক না কেন আসলে আজাজিল হতে নিম্নমানের। কারণ আজাজিল জ্বিন। মানুষ যেমন নফস এবং রুহের অধিকারী, জ্বিনও নফস এবং রুহের অধিকারী। এ জন্য দুজনের প্রতিই এবাদত করার নির্দেশটি পাই। জ্বিনকে আমরা দেখতে পাই না বলে জ্বিনের বিষয়টি সযতনে এড়িয়ে যাই। কিন্তু দুজনার মাঝেই নফস এবং রুহ আছে। জ্বিনেরা যে আল্লাহর বিরাট বিরাট ওলি হন তার দলিলটি অধম লিখকেরও জানা ছিল না। যখন দিল্লীতে হজরত বাবা নিজামউদ্দিন আউলিয়ার রওজা মোবারকের পূর্ব পাশে জ্বিন ওলিদের কবরস্থানটি দেখতে পেলাম তখন চমকে উঠলাম। এমন কি জ্বিনদের কবরস্থানে জ্বিন ওলিদের নাম পর্যন্ত খোদাই করা আছে। আমি দেখে তো অবাক। আমার খাদেম জনাব মরহুম ফরহাদ আলী নিজামিকে কিছু না বলে গেস্ট হাউসে গিয়ে বিশ্রাম নিলাম আর অনেক কিছু হিসাবের গরমিলগুলো ঠিক করতে চেষ্টা চাললাম। মনে রাখতে হবে, এটা কিছুতেই ভুলে গেলে চলবে না যে, ফেরেস্টাদের নফসই নাই, রুহ তো অনেক পরের কথা। নফস এবং রুহ বর্জিত ফেরেস্টারা আল্লাহর সেফাতি নূরের তৈরি। আল্লাহর জ্ঞাত নূরের নয়। সেফাতি নূর সেদরাতুল

মোনতাহা পর্যন্ত যেতে পারে, কিছু লা মোকামে প্রবেশ করার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ লা মোকামে একমাত্র আল্লাহর জ্ঞাত হয় বিরাজমান। আল্লাহর জ্ঞাত নুর নিয়ে আল্লাহ পাক মানুষ এবং জ্বিনের শাহারগের নিকটেই আছেন। যেহেতু আজাজিল জ্বিন সেই হেতু আজাজিলের মধ্যে নফস এবং রুহ আছে এবং আল্লাহ তার শাহারগের নিকটেই আছেন। সুতরাং আজাজিলকে ফেরেশতাদের সরদার বানাবার মধ্যে অবাক হবার কিছু নাই। প্রথম পরিপূর্ণ মানব আদম (অপূর্ণ মানব আদম নয় বরং ইনসান)-এর আনুগত্য গ্রহণ করতে তথা সেজদা দিতে বললেন। নফস এবং রুহ বর্জিত ফেরেশতারা সবাই সেজদা করলেন তথা আনুগত্য গ্রহণ করলেন, কিছু একমাত্র আজাজিল সেজদা দিতে অস্বীকার করাতে অহঙ্কারীতে পরিণত হল। অহঙ্কারী মানেই ইবলিস। ইবলিস শব্দটি আরবি নয়, ইহা একটি হিব্রু শব্দ।

বালাসা হলো অহঙ্কার আর ইবলিস হল অহঙ্কারী। কেন আজাজিল এই অহঙ্কারটি করলো? (অবশ্য শামসেত্তাব্রিজের দৃষ্টিতে) আজাজিল দেখতে পেলো যে, যদি আমি এই অহঙ্কারটি না করি তা হলে আল্লাহর দুনিয়া বানাবার ইচ্ছাটির সার্থকতা কমে যায়। আল্লাহ কোনো দোষ করেন না তাই দোষের বোঝাটি নেবার প্রশ্নই ওঠে না। যদি আজাজিল নিজের ইচ্ছায় জেনে শুনে এই কলঙ্কের বিষটি পান করে তবে শাস্তি তাকে

পেতেই হবে। তাই আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আজাজিল ইবলিসে পরিণত হল। আজাজিল জেনে-গুনে-বুঝে, আল্লাহ পাকের দুনিয়া সৃষ্টি করার ইচ্ছাটিকেত, হকুম অমান্য করার অপরাধে অপরাধী হয়ে অভিশপ্ত নামক মহা কলঙ্কের বোঝাটি মাথায় তুলে নিল। অপরদিকে সত্যদ্রষ্টা আদম, যিনি নূরে মোহাম্মদি সিনায় ধারণ করেন, যিনি রহস্যলোকের গুপ্তজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু নবী, যিনি কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করা নবী, যেখানে ঝড়ের সৃষ্টি হয় অথচ কেন্দ্রবিন্দুতে কোনো ঝড় থাকে না সেইখানে অবস্থান করা নবী আদম, যিনি সেন্টার অফ দি সাইক্লোন অথচ সেন্টারে ঝড় থাকে না বরং ঝড় তৈরি করে, সেই সত্যদ্রষ্টা আদম জেনে-গুনে-বুঝে নিষিদ্ধ গাছের মজা গ্রহণ করলেন। (গন্ধম, মানা করা গাছের ফল, সর্প এগুলো রূপক কথা।) নিষিদ্ধ গাছের মজাটি

জেনে গুনে গ্রহণ না করলে আল্লাহর দুনিয়া তৈরি হয় না। আর দুনিয়া তৈরি না হলে মানব জাতির আগমন হবার পথটি খোলা থাকে না। যদিও আপাতঃ দৃষ্টিতে গুনাহ, যদিও আইনের দৃষ্টিতে গুনাহ, কিন্তু প্রেমের দৃষ্টিতে ইহা মোটেই গুনাহ নয়, বরং আদা, তথা চং করে খাওয়া। প্রেমের কাছে আজাজিল আর আদমের কী অপূর্ব কোরবানি! এই কোরবানি কারো চোখে ধরা পড়ে, আবার কারো চোখে ধরা পড়ে না। ধরা পড়াটাও তকদির, না পড়াটাও তকদির। আবার এই

তকদিরটি অস্বীকার করাও তকদির, আর তকদির মেনে নেওয়াও তকদির।

অন্ধ কখনও সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না। আদমের ডেতরে স্বয়ং আল্লাহ পাক রব-রূপ ধারণ করে জাগ্রত, আর সেই আদম কেমন করে এত বড় ভুলটি করতে পারে? মোমিনদের মাতা মা আয়েশার কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে গবেষণা করে যারা মহানবী এলম্লে গায়েব জানেন না বলার দলিলটি প্রচার করেন, তারা ওহাবিই হোন আর বাটালভি ফেরকারই হোন, এটাও তাদের তকদির। সুতরাং আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ভুল নাই। ভুল খুঁজতে গেলে নিজের ভুলের নদীতে নিজেকেই ডুবে যেতে হয়। তুমি যত প্রকার কৌশল আর চালাকিই কর না কেন, জেনে রাখ, আল্লাহ পাক কৌশল আর চালাকির স্রষ্টা। এখানে এসেই মানুষ তার জ্ঞানগরিম্বার বলয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। তখন কেউ বিষয়ট না বুঝার দরুন মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্য হয় নাস্তিক, সংশয়বাদী এবং বড় বড় বই লিখে নাস্তিক্যবাদ আর সংশয়বাদ ধারালো কলমের চাকচিক্যময় ভাষায় প্রচার করে আলো-অন্ধকারের দোদুলতায় ভাসিয়ে নেয়। এই ভবের নাট্যক্ষেত্রে কত নূতন ধরনের অভিনয় আর নৃত্যব্যংকার! এর ডেতর হতে উলঙ্গ সত্যটিকে বের করে আনা যে কত কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তা কেমন করে বোঝানো যায়!

প্রেম আর আইন পাশাপাশি চলে। যেমন জাহ্নাত আর জাহান্নাম পাশাপাশি অবস্থান করে। প্রেমের নদীতে ঝাঁপ দিয়ে রাজার ছেলে ধোপার মেয়েকে বিয়ে করে, আর আইন ধোপার মেয়েকে বিয়ে করার দরুন সিংহাসনে বসার উপযুক্ত নয় বলে ঘোষণা করে। যিনি আইনের লোক তার কাছে সিংহাসনে বসার উপযুক্ত নয় এবং এটা তার তকদির। যিনি প্রেমিক তার কাছে ধোপার মেয়ে বিয়ে করাটা গৌরবের বিষয় এবং এটা তার তকদির। এই অমোঘ তকদিরের চক্রে আমরা সবাই ঘুরছি, কিন্তু বুঝতে পারি না। এই ধাবমান পৃথিবী গ্রহটি কী প্রচণ্ড বেগে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে, কিন্তু বুঝতে পারি না। যে প্রেমিক সে বোঝে না, কেমন করে প্রেম করলাম। যে আইনজ্ঞ সে বোঝে না, কেমন করে আইনের প্রতি ঝুঁকলাম। কারণ প্রেম করা যায় না, বরং আপসে হয়ে যায়। বৃষ্টি বানানো যায় না, বরং আপসে হয়ে যায়। কচুরি পানা নিজে চলে না, বরং স্রোতে চালিয়ে নিয়ে যায়। একসিডেন্ট করা যায় না, বরং আপসে হয়ে যায়। আল্লাহর ওলি হওয়া যায় না, বরং আপসে হয়ে যায়। মুরিদ হওয়া যায় না, বরং আপসে হয়ে যায়। সুতরাং চরম সত্যে যে চায় সে পায় এবং যে চায় না সে পায় না কথাটি কোরানের অনুবাদে সঠিক নয়, বরং যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন না যারা কোরানের অনুবাদ করেন তারাই সঠিক। এখানে ক্ষুদ্র বলয়ের মনগড়া অনুবাদ টেকে না, তা যতই আরবি ব্যাকরণের প্যাচ মারেন। যদি

ভুলটুকু শুধরিয়ে নিতে পারেন তো এটা তকদির, আর যদি আপন অবস্থানে অনড় থাকেন এটাও তকদির। তকদিরের বাইরে এক পা ফেলার ক্ষমতা কারো নাই।

আর একটি ঘটনার কথা বলছি। বিখ্যাত ঔলি হজুরত বাবা বাকি বিল্লাহর ঘটনা, যিনি নিজের জানাজা নিজেই পড়েছেন, যিনি বিশ্ববিখ্যাত ঔলি মুজাদ্দের আল ফেসানির পীর। বাবা বাকি বিল্লাহর কোমরে অনেকদিন ধরে বাতের বেদনা। প্রধান খাদেম তেল গরম করে কোমরে মালিশ করে দেন প্রায়ই। বাবা বাকি বিল্লাহ প্রতি বৃহস্পতিবারে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আম জনতার সঙ্গে দেখা দিতেন এবং সুখ-দুঃখের কথা শুনতেন। একদিন এক লোক এসে বাবা বাকি বিল্লাহর কাছে অভিযোগ করলেন যে তার কোমরে পুরাতন বাতের বেদনা, অনেক রকম চিকিৎসা, ঝাড়-ফুক করেও কিছুতেই কিছু হলো না, তাই এসেছেন। বাবা বাকি বিল্লাহ শুনে বললেন যে, এটা তো কোন রোগই না। তুমি এক পাত্র পানি নিয়ে আস, আমি ফুক দিয়ে দেই। পানি আনা হলো এবং ফুক দেবার পর বাবা বাকিবিল্লাহ লোকটিকে পরের বৃহস্পতিবার এসে জানাতে বললেন। লোকটি সেই কথা মোতাবেক এসে হজুরকে সম্পূর্ণ রোগমুক্তির কথাটি জানালেন। লোকটি যখন রোগমুক্তির কথাটি জানাচ্ছেন তখনও প্রধান খাদেম হজুরের কোমরে গরম তেল

মুখে মালিশ করছেন। খাদেম এ হেন কথা শুনে মনের অজান্তে বলে ফেললেন, ‘বুঝলাম না ফকিরি কী!’ বাকি বিল্লাহ খাদেমের মুখে এ রকম কথা শুনে বললেন, ‘তুই ফকিরি দেখতে চাস, না শিখতে চাস?’ খাদেম বললো, ‘বাবা, আমি ফকিরি দেখতে চাই।’ বাবা বাকি বিল্লাহ বললেন যে, ‘আমার পর্দা নেবার পর একজন মাওলানা ঘোড়ায় চড়ে, মুখে নেকাব (মুখোশ) লাগিয়ে জানাজা পড়তে আসবেন। জানাজা শেষে সেই মাওলানাকে অনুসরণ করবি এবং নির্জন স্থানে আসলেই মাওলানাকে ফকিরি দেখাবার কথাটি বলবি।’ বাবা বাকি বিল্লাহ পর্দা নেবার পর সেই কথা

মতো সব কিছুই ঘটলো এবং নির্জন স্থানে এসে ফকিরি দেখাবার কথাটি বললে মাওলানা মুখের নেকাব উঠাতেই খাদেম বললেন, ‘বাবা আপনি! তা হলে ওটা কে? ওটাও বাকি বিল্লাহর লাশ মোবারক। একি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখছি!’ খাদেমের কথা শুনে বাবা বাকি বিল্লাহ বললেন, ‘তুই ফকিরি হাসেল করতে চাস নি, বরং দেখতে চেয়েছিলি।’ এই বিষয়টি কি চাওয়া, না আকাঙ্ক্ষা, না তকদিরের লিখন ছিল পাঠক বাবা-মায়েদের হাতেই বিষয়টি ছেড়ে দিলাম।

মাহবুবে এলাহি বাবা নিজামউদ্দিন আউলিয়ার প্রধান খলিফা বাবা আমির খসরু লিখে গেছেন, ‘হাজারখানে মা বারকান্দা বাসী।’

আবদুহর পর্যায়ের ঔলি-আবদালরা যে-কোনো পরিবেশে যে-কোনো মাহফিলে যে-কোনো রূপধারণ করে হাজির হতে পারেন। শুনতে পাই, অনেক মজ্জুব বাজারেও ঘোরাফেরা করছেন আবার মক্কায় হাজিদের সঙ্গে হজ্জ করছেন। সুরা বাকারার একশত চৌষটি নম্বরের আয়াতটি জানা থাকলে সকল প্রশ্নের সমাধান পেয়ে যাবেন। আলবাবের কাজ আলবাব করবে তথা বিজ্ঞানীর কাজ বিজ্ঞানী করবে এবং যার যার কাজ তাকেই করতে হবে, অন্যকে নয়। ফকিরির কাজ ফকিরে করবে, বিজ্ঞানী নয় এবং বিজ্ঞানের কাজ ফকিরের জন্য নয়। আমরা একজনের কাজ অন্যজন হতে আশা করি এবং এই আশা করাটাই ভুল। বিশ্ববিখ্যাত ঔলি হজরত বাবা আলাউদ্দিন কালিয়ার সাবেরি বলেছেন যে, ফকিরের শান কী বলে দাও। এইখানে মৃত আবার অপর স্থানে একই সময়ে নৌকায় পার হয়ে যাচ্ছেন। ইচ্ছা হয় দেহের মধ্যে অবস্থান করলেন আবার ইচ্ছা হয় দেহ হতে প্রস্থান করলেন। এই বিষয়গুলো এতই উঁচু যা আমাদের ধারণা করতে কষ্ট হয়। আর ধারণা করতে তো কষ্ট হবার কথাই, কারণ আজকাল পীর-ফকিরের নামে যে প্রতারণার ফাঁদ পাতা আছে এবং কিছু কিছু প্রতারণা হাতে নাতে ধরা পড়ছে তাতে চুন খেয়ে মুখ পুড়ে দই দেখে ভয় পাবার তো কথাই। আজ ফকিরি করছে অথচ মোরাকাবা-মোশাহেদা তথা ধ্যানসাধনার কথাটাই একদম নাই হয়ে গেছে। ধ্যানসাধনা ছাড়া ফকিরি হয় কেমনে, আমার জানা নাই। এটা-সেটা

বলে লেংড়া যুক্তি-তর্কের ধুম্নজাল তৈরি করে বোঝাতে চাইবে যে, এ যুগে আর ধ্যানসাধনার কোনো প্রয়োজন নাই। কথায় কথায় বলছি, একবার বাংলার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী আহম্মদ হুফা সাহেব আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং ফকিরির বিষয়টি জানানোর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, ‘যদি সত্যিই আপনার সামান্য আগ্রহ থেকে থাকে তো আমার কাছে চুক্তিভিত্তিক মুরিদ হতে হবে এবং আমার কথা মত ইসলামিক তরিকায় একশত বিশটি দিন ধ্যানসাধনা করতে হবে। যদি সত্যর দেখা না পান তো আপনার যা ইচ্ছে তাই গালি দেবেন আর আমি মাথা পেতে নেব।’ আহম্মদ হুফা সাহেব বললেন, ‘ধরুন বাবা, পেলাম না।’ আমি বললাম, ‘রহস্যলোকের কিছু না কিছু পেতেই হবে। আর যদি একান্তই আপনার তকদিরে ফকিরি না থাকে তো আপনাকে ধ্যানসাধনা করতেই দেবে না। যতই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করুন না কেন, পাছায় লাথি মেরে উঠিয়ে দেবে। আর পাবার যোগ্য হলে এই এক শত বিশ দিনের ধ্যানসাধনায় কিছু না কিছু অবশ্যই পাবেন।’ ইহা কোরানের কথা। অনেকে বুঝে উঠতে পারে না। সূরা তৌবার দুই নম্বর আয়াতটিতেই বলা হয়েছে, কেউ ধরতে পারে, কেউ পারে না। কেউ ‘আর্দ’ বলতে মাটি অথবা পৃথিবী বোঝে, কিন্তু ‘আর্দ’ বলতে যে দেহটি বোঝায় এটা বুঝতে চায় না। আরবি বড়ই গরিব ভাষা। একটি শব্দ দিয়ে অনেক রকম অর্থ হয়। তা ছাড়া সুফিবাদের গবেষণা করতে গিয়ে পুরনো ফারসি ভাষায়

রচিত অনেক বই পড়তে হয়েছে এবং অবশেষে হজরত বাবা বু আলী শাহ কালান্দরের দেওয়া মোরাকাকাটিই গ্রহণ করে নিলাম। কারণ বাবা বু আলী শাহ কলন্দরই বলেছিলেন যে, একশত বিশ দিন আমার কথামতো ধ্যানসাধনা করে যদি তুমি কিছু না পাও তো দুই হাতে দুইটি পাথর নিয়ে আমার মাজারে ছুঁড়ে মেরে দিয়ে বলে দিও যে কালান্দার মিথ্যুক। অধম লিখক কালান্দারের কথাটিতে বোবা চ্যালেঞ্জের গন্ধ পেলাম। যদিও তিনি কোনো প্রকার প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ দেন নাই, কিন্তু তাঁর কথা ও ভাষার শৈলী দেখে বুঝে নিতে চাইলাম যে, এটা এক ধরনের বোবা চ্যালেঞ্জ। আসুন না, দেখুন না, একবার না হয় পরীক্ষা করলেনই, ডাইনোসর আর মমির কঙ্কাল নিয়ে গবেষণায় কাটিয়ে দিলেন বছরের পর বছর; এগিয়ে আসুন, কথা দিচ্ছি সাধনাটি করার পর আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না, বরং আপনিই আপনার চোখের জলে অবনত মস্তকের লাজুক ভঙ্গিতে খান্নাসরূপী খেসালতের রূপটি দেখার ঘোষণা করে যাবেন। তাই ফকিরিতে অনুমান নাই, ফকিরিতে দেহত্যাগের পর পাবার কথাটি নাই : ফকিরিতে আছে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ফকিরিতে আছে দেহের মাঝে বাস করেই দেহের রহস্য ভ্রমণ। যে ফকিরিতে অনুমান করা আর বাকির কথাটি শোনায়, সে ফকির নয়। তাই নকল ফকির দিয়ে আসল ফকিরকে মাপতে যাবেন না। নবাবপুরের রথখোলার ডেজাল দুধ খেয়ে সবই ডেজাল দুধ বলতে

যাবেন না, কারণ গ্রামেগঞ্জে এখনও খাঁটি দুধ বিক্রি করার জন্য কাঁচা গলা মোমের মতো সহজ সরল কৃষককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবেন। ‘মরণ কালে দয়াল তুমি দেখা দিও’ কথাটি ছেঁচড়া ফকিরের ব্যর্থ বিলাপ। সুফিবাদের দর্শনে

হাসির খোরাক এবং দুনিয়ার দার্শনিকদের দৃষ্টিতে ইলিউশনের টিটকারি মার্কা বিদ্রূপ আর ঠাট্টা। এরা নফসের রহস্যই বোঝে নি। বাজে প্যাচালের ধাঁধা দাঁড় করায়। এরাই রুহকে ভাগ করে ফেলে। এরাই রুহকে নূরানি মাখলুক বলে। এরাই রুহ বিষয়ের কিছুই না বুঝে বলে : রুহে নাবাতি, রুহে জাম্মাদি এবং রুহে বাতনি! ভুল আর ভুল শিখাতে গিয়ে অবশেষে নিজেই ভুলের মাঝে ভুবে থাকে। এরা রক্তের স্বেত কণিকাকে জোর করে ভাগ করতে চায়। যার বিভাজন নাই তারই বিভাজন করে লোক হাসায়। এ রকম ফকিরি হতে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল। কোথায় খাজা বাবার ফকিরি, আর কোথায় এদের ফকিরি! কোথায় শক্তির পূজারি, আর কোথায় প্রেমের পূজারি! প্রেমের পূজারিকে শক্তির পূজা করছে বলে মনে হলেও পরে দেখতে পাবেন প্রেমের পূজারির ওটা ছিল বিনয়, ওটা ছিল বিদায় করে দেবার একটি কৌশল। অথচ শক্তির পূজারিকে প্রেমের পূজা করছে বলে মনে হলেও পরে দেখতে পাবেন আসলে শক্তির পূজারি। বিবরণ দেওয়া যায়, লিখে জানিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু বলার কিছুই থাকে না। যিনি বা যারা শক্তির

পূজা করছে, এটা তার অথবা তাদের তকদির। জোর করতে গেলেই ভুল হবে, কারণ তকদির খণ্ডানো যায় না। জোর করে প্রেমের জলসায় বসিয়ে দিলে পায়খানা পেশাব করে জলসার পরিবেশ নষ্ট করে দেবে। সুতরাং এই দুনিয়াতে যাকে যেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা সে করবেই। রসায়ন শাস্ত্রে ডক্টরেট করেও তকদির রসায়নে থাকতে দিল না, বিখ্যাত নাট্যকার আর ঔপন্যাসিক বানিয়ে দিলো। আরেকজন ক্লাশে ভালো ছাত্র ছিল না, যারা ভালো ছাত্র ছিল তারা বড় বড় আমলা হয়েছিল, কিন্তু সাহিত্যিক হতে পারে নি। চিলে কোঠার সেপাই-এর মতো ক্ল্যাসিক রচনার মধ্যে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাকবেন বন্ধুবর আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। আর অধম লিখক, সার্কের মহাসচিব রহিম, টিএন্ডটির ডাইরেক্টর ফজলুল হক আর রোডস্ অ্যান্ড হাইওয়েজের চিফ ইঞ্জিনিয়ার আবদুল ওয়াদুদ ছিল প্রথম সারির ছাত্র। আমরা একদিন কালের গর্ভে হারিয়ে যাব-ইতিহাস আর বাস্তবতা তো এ-কথাই বলে।

ঢাকা শহরের দুই নম্বর পুরনো সিনেমা হলটির নাম ছিল লায়ন সিনেমা হল। বিখ্যাত ব্যক্তি প্রতাপশালী সরদার কাদের মিয়া এর মালিক। তিনি সিংহের মতো এতই প্রতাপশালী ছিলেন যে, সেদিনে কেউ তার ভয়ে টু শব্দটি করতেন না। তাই সিনেমা হলটির নাম দিয়েছিলেন সিংহ সিনেমা

হল। হাতি যতোই শক্তিশালী হোক, হাতির পিঠে বসে রাজা-জমিদাররা যতই সিংহ-বাঘ শিকার করুন না কেন, হাতি কলাগাছ খায় তাই হাতি সিনেমা হল নামটি একদম বাজে। মানুষ মূলত হিংস্র, তাই হিংস্রতাই পছন্দ করে বলে সিংহ সিনেমা হল নাম দেওয়াটাই স্বাভাবিক। পাশেই ঢাকার নবাবদের বাস, কিন্তু তাদের চলন-বলন তো হাতির মতো। এই পুরনো অনেক স্মৃতি জড়ানো সিনেমা হলটি এখন আর নাই। চল্লিশের দশকে মাত্র পা ফেলেছে। বিশ্বযুদ্ধ চলছে। বলতে ভুলে গেছি যে, এই সিনেমা হলে প্রায়ই নাটক, যাত্রা আর লাখনোর বড় বড় বাইজিদের নাচ-গান হত। একবার কাদের সরদার চানাচুর বেচার টিনের অনেক চোঙ্গা দিয়ে প্রচার করে দিলেন যে, লাখনোর নামি দামি রূপা বাইজি ঢাকায় আসছেন এবং কয়েকদিন নাচ-গান দেখানো হবে। টিকিটের মূল্য অনেক বেশি। পাঁচ টাকা। দুই মন চাউলের দাম আর কি। ঠিক সময়মত সিনেমা হলে রূপা বাইজির নাচ চলছে। হল ভর্তি মানুষ আর মানুষ। সামনের ভদ্রলোকদের সিটগুলো সাজানো। ভদ্রলোকেরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে নাচ দেখছে। কাদের সরদার স্টেইজের আড়ালে বসা। ভদ্রলোকদের সঙ্গেই বসে আছে এক জন্মান্ন। সে জন্ম হতে চোখে দেখে না। ভদ্রলোকটির নাম হল ডোলা গোয়াল। চোখে কিছুই দেখে না, অথচ নাচ দেখতে এসেছে-সবাই খানিকটা অবাক হয়েছেন। তবে বেশি অবাক হয়েছেন কাদের সরদার। কারণ তার বাড়িতে যত দুধ লাগে তা

এই ডোলা গোয়ালই দেয়। গোয়াল হলে কী হবে, ডোলা গোয়াল আসলেই একজন অবস্থাসম্পন্ন, মধ্যবিত্ত পরিবারেরই একজন বলা চলে। কাদের সরদার অবাক হয়ে ডোলা গোয়ালকে দেখছে আর অবাক ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে। এদিকে রূপা বাইজির নাচের ঝংকারে সবাই বিভোর। পিন-পতনেরও শব্দ নাই। সহসা ডোলা গোয়াল চিৎকার করে বার বার ঢাকাইয়া উর্দুতে (ঢাকার উর্দুভাষীদের উর্দুকে ‘কাউনা উর্দু’ বলে, কারণ এরা অর্ধেক উর্দু আর অর্ধেক বাংলা বলে। যেমন, আবে সাউলা, বাজার মেয়ে মাছলি এতনা সস্তা হয় তো ডাইল আনুহস কার কথায়? অর্থাৎ—এই সালাউদ্দিন, বাজারে মাছ এত কম দামে পাওয়া যায় অথচ কোন বুদ্ধিতে ডাইল আনলে?) বলছে, ‘নাচনা বান্দ করিয়ে, বেসুরা হোতা হয়, বাইজিকা বা পাউমে দো ঘুংরু কম হয়’। সরল বাংলায় ‘নাচ বন্ধ করুন, বেসুরা হচ্ছে, বাইজির বাম পায়ে দুইটি ঘুংরু কম আছে।’ ডোলা গোয়াল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বার বার বলাতে কাদের সরদার নাচ বন্ধ করে স্টেইজে এসে বাইজিকে দাঁড়িয়ে থাকার অনুরোধ জানিয়ে ডোলা গোয়ালকে চৌদ্দ গোষ্ঠি ধুয়ে দিলেন। ডোলা গোয়াল বার বার অনুরোধ করে বলতে লাগলেন, ‘সরদার সাহেব, আপনি বাইজির বাঁ পায়ের ঘুংরু গুণেই দেখুন, দেখতে পাবেন ঠিক দুই ঘুংরু ডান পায়ের ঘুংরু হতে কম।’ কাদের

সরদার অন্ধ হবার গালি দিচ্ছে আর ডোলা গোয়াল বলছে, ‘সরদার সাব, আমার চোখ দুটো অন্ধ ঠিকই, কিন্তু দিল আমার অন্ধ নয়।’ অবশেষে আর কী, স্টেইজেই প্রকাশ্যে বাইজির দুই পায়ের ঘুংরু দুইজনকে দিয়ে আলাদা আলাদা করে গুনতে শুরু করানো হল। কাদের সরদার মাঝখানে চেয়ারে বসে গোনা দেখছেন আর মাঝে মাঝে ডোলা গোয়ালের দিকে তাকাচ্ছেন। গোনা শেষ। রূপা বাইজি দাঁড়িয়ে আছে। ডান পায়ের ঘুংরু কয়টা জানতে চাইলে বলা হলো, ‘আশিটা, সরদার সাহেব।’ তারপর বাম পায়ে ঘুংরু কটা জানতে চাইলে বলা হলো আটাত্তরটা। মানে দুটি কম। সরদার বাঁ পায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আবার একটি করে গুনিয়ে দেখেন, ঠিক আটাত্তরটা। দুটো কম। সরদার সাহেবের চোখ কপালে। জন্ম হতে অন্ধ, অথচ বলছে বাঁ পায়ে দুটো কম। এও কি সম্ভব! কাদের সরদার অভিভূত। স্টেইজে এনে ডোলা গোয়ালকে গলায় ফুলের মালা আর একশত টাকা বকশিশ দিলেন আর বললেন, যতদিন এই হলে যে কোনো অনুষ্ঠান, যে কোনো সিনেমা চলুক না কেন ডোলা গোয়ালের জন্য ফ্রি করে দেওয়া হলো। অন্ধ কখনো সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না। ডোলা গোয়াল তো অন্ধ। তা হলে? না, ডোলা গোয়ালের বাহিরের চোখ দুটি অন্ধ ঠিকই, কিন্তু হৃদয়ের চোখটি এতই খোলা যে, সমস্ত হলের মানুষ, সরদার এবং স্বয়ং রূপা বাইজি পর্যন্ত চমকে যান। এটাই বোধ হয় ‘চোখ থাকিতে অন্ধ’ বলার মতো।

এত বড় চমক একজন অন্ধ দিতে পারে এটা হল-ভর্তি চোখওয়ালারাও ভাবতে পারে নি। ভাবতে পারে নি স্বয়ং নর্তকী রূপা বাইজি আর কাদের সরদার। দার্শনিক সোরেন ক্যের্কেগার্ড বলেছিলেন একটি মহামূল্যবান কথা, আর সেই কথাটি হলো-যে মানুষটি সব প্রশ্নের উত্তর গড়গড় করে দিতে পারে সে একজন বিপদজনক মানুষ; তার থেকে দূরে থেকে। বিচিত্র মানুষের বিচিত্র প্রশ্ন। প্রশ্নগুলো যেন থরে থরে সাজিয়ে রেখেছেন যিনি এই পৃথিবী তৈরি করেছেন। আবার যিনি এই পৃথিবী তৈরি করেছেন তিনি কয়েক ধাপ এগিয়ে ঘোষণা করছেন, তুমি আমার সৃষ্টির দিকে তাকাও, দেখবে কোনো ভুল নাই। তুমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকো, দেখবে কিছু পরিমাণ বিস্ফোরিত হয়ে তোমার দিকেই ফেরত আসবে। বিস্ফুর্ত সাগরের মিশে যেতে পারে, কিন্তু সুনামির মতো মরণ ঘাতক রূপটি ধারণ করতে পারে না। কারণ বিস্ফুর্তের এটাই তকদির।

নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রবি ঠাকুর। নোবেল কমিটির নির্বাচনটি ছিল অপূর্ব। কারণ তখনো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় নি, তাই রাজনীতির চালবাজি আর কূটনীতির ডেকিবাজি হাসি আর মেনে মেনে কথা বলার ঢং-এর পরিচয় তখনও পৃথিবী জানতো না। পৃথিবী তখনও এত ছক্কাপাজী খেলা দেখাতে শিখে নি। সভ্যতার ইতিহাসে যাদের অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে তাদেরই কয়টি বিশেষ নাম হলো, বিজ্ঞানে

আইনস্টাইন, ছোটগল্পে লিও টলস্টয় আর কবিতায় রবি ঠাকুর। পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে রবি ঠাকুরের মত বহুমুখী প্রতিভার কবি একটিও জন্ম গ্রহণ করেন নি। যারা ধর্মের মাপকাঠি দিয়ে সব কিছু মাপতে চায় তাদের কথা বলছি না। তাদের কথা বলতে রুচিতে বাঁধে। কারণ এদের পা দুটো কুসংস্কারের শেকল দিয়ে বাঁধা আছে।

মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিতে এক বিস্ময়কর নেতা। ব্যারিস্টারি পেশা ছেড়ে দিয়ে এমন অতি সাধারণ পোশাক পরে রাজনীতির মাঠে নেমে পড়লেন যা সত্যিই বিস্ময়কর। মহারানী ভিকটোরিয়া পর্যন্ত সাধু গান্ধীর মধ্যে যিশুর শিষ্য সাধু পিটারের গন্ধ পেয়েছিলেন। রোমাঁ রোলান কাছে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন জীবন্ত আদর্শের প্রতীক। সেই ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীকে একবার দাওয়াত করেছিলেন রবি ঠাকুর। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করলেন এবং রবি ঠাকুর শান্তিনিকেতনের সবচাইতে প্রিয় এবং বিলাসবহুল বাগানবাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করলেন। বাগানবাড়ির উঠানে দুনিয়ার অনেক দেশের অনেক রকম ফুলগাছ সংগ্রহ করে লাগানো হয়েছে। অনেক ফুলের অনেক গন্ধে বাতাসে অনেক সুগন্ধীর ঢেউ খেলে। একদিন মহাত্মা গান্ধী তাঁর সেবক সেবিকাদের নিয়ে সমস্ত ফুলগাছ উঠিয়ে ফেলে আলুগাছ বুনেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী কেদারায় বসে কেমন করে আলুগাছ লাগাতে হয় এবং কেমন করে

আলুগাছে জল দিতে হয় তার টেকনিক শিখা দিচ্ছেন। একদিন রবি ঠাকুর মহাত্মা গান্ধী কেমন আছেন এবং সেবাযত্নের কোনো কমতি হচ্ছে কি না জানার জন্য সেই বাগানবাড়ির দিকে চলেছেন। বাগানবাড়ির সামনে এসে দেখতে পান যে, উঠানের বাগানটিতে একটিও ফুলের গাছ নাই। সব ফুলের গাছ উঠিয়ে এক স্থানে স্তুপ করে রাখা আছে আর সেই ফুল গাছগুলোতে গুঁকিয়ে যাবার লক্ষণ ফুটে আছে। সাত আসমান ভেঙে পড়লো রবি ঠাকুরের ওপর। এত শখের এত কষ্টে গড়া ফুলবাগানটিতে একটিও ফুলের গাছ নাই। এমন সময় মহাত্মা গান্ধী মৃদু হেসে বললেন, ‘কবি, ফুলের গন্ধে কী হবে, ফুলের গন্ধে তো আর পেট ভরে না, তাই আলু চাষ করলাম। তোমার শিষ্যরা পেট পূরে আলু খেতে পারবে। যদি চাও তো তুমিও আলু খেতে পারবে।’ রবি ঠাকুর মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে বললেন, ‘মহাত্মাজি, আলুর চাষ তো জানি না, তাই ফুলগাছ লাগিয়েছিলাম।’ মহাত্মা গান্ধী বললেন, ‘আলুর চাষ শিখিয়ে দিলাম, এখন থেকে আলুর চাষ করবে। ফুলের গন্ধে তো আর পেট ভরবে না; আর তুমি তো জানোই, ফুলের গন্ধ নেওয়াটা বড়লোকি ফ্যাশান।’ মহাত্মা গান্ধীর কী অপূর্ব ব্যাখ্যা! রবি ঠাকুর বললেন, ‘মহাত্মা, আপনি ঠিকই বলেছেন।’

পাঠক বাবা-মায়েরা কী বুঝলেন? দুজনার সম্পূর্ণ দুই রকম দর্শন। কার দর্শনটি রাখবেন আর কার দর্শনটি ফেলবেন? ফুলগাছ আর আলুগাছ-এই ছোট্ট বিষয়টিতেই আমরা অবাক হই। মহাত্মা গান্ধীকে তো আর ভুলেও কেউ গরু মনে করবেন না। তা হলে তো কেউ বলেই ফেলতো যে, গরুর নাকে গোলাপ ফুল ধরে লাভ নাই, কারণ গরু ফুলের গন্ধ নিতে জানে না। বরং লম্বা জিহ্বা বের করে এক ঝটকায় মুখে দিয়েই চাবান দিয়ে ফেলবে। অবশ্য পরে রবি ঠাকুর তাঁর এক আত্মীয়কে চুপে চুপে বলেছিলেন যে, ‘আমার পিঠে চাবুক মারলেও এত দুঃখ পেতাম না।’

ফুলের বাগান করাটা রবি ঠাকুরের তকদির। আর আলুর খেত করাটা মহাত্মা গান্ধীর তকদির। আমরা সবাই তকদিরের অদৃশ্য সূতায় বাঁধা। মানলেও তকদির, না মানলেও তকদির। এই তকদিরের অদৃশ্য সূতাটি ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা বড়ই কঠিন।

যিশুর আত্মবলিদান

নিজেকে পৃথিবীর রাজা বলাতে জনতার রায়ে যিশুর মৃত্যুদণ্ড হল। প্রথমে ইহুদিদের চাবুকের আঘাত, তারপর কাঁটায় বানানো মুকুট মাথায় পরিয়ে দেওয়া হলো আর সেই সঙ্গে ইহুদিদের কী ঠাট্টার হাসি আর

অশ্লীল বাক্যবান : যিগু ভগু নবী, যিগু দুনিয়ার বাদশা ইত্যাদি জঘন্য কথা বলে যাচ্ছে। তারপর এত গুজনের কাঠের তৈরি শুলী যিগুর কাঁধে বসিয়ে দেওয়া হলো। এতিমের মতো চোখ দুটো ফ্যালফ্যাল করে ইঁহদিদের কীর্তিকলাপ দেখছেন, কাঁটার মুকুটের আঘাতে দুই গাল বেয়ে রক্ত ঝরছে। যিগু কুঁজোর মতো মাথা নত করে নিজের ক্রুশ নিজেই বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। পথের দু'ধারে মানুষ আর মানুষ এ দৃশ্য দেখছে। কেউ টিটকারি দিচ্ছে, কেউ চুপ করে দেখছে। সহসা বারো বছরের এক কিশোরী কন্যা বলে উঠলো, 'প্রভু, এ কী দৃশ্য দেখছি! মাত্র তিন মাস আগে আমার ফুপু লেজারাস সাতদিন আগে মারা যাবার পর তোমার আদেশে, "আল্লাহর হুকুমে মৃত লেজারাস গুঁঠে দাঁড়াও" বলার সঙ্গে সঙ্গে, জীবন ফিরে পেল; আর এখন কেন বলছো না যে, কাঁটার মুকুট চলে যা, ভারী ক্রুশ চলে যা? বললেই তো সঙ্গে সঙ্গে এসব শাস্তির জঞ্জাল চলে যায়। কিন্তু প্রভু, তুমি বলছো না কেন, বরং বয়ে নিয়ে চলেছো?'

যিগু সেই কিশোরীর সামনে দাঁড়ালেন। কচি হাতে কিছুটা রক্ত মুছে দিলেন। তারপর কিশোরীকে বললেন যিগু, 'কন্যা, জেনে রাখ, মানুষের চেহারা যারা অসুর তারা কোনোদিন কোনোকালেই দেবতাকে গ্রহণ করে নি, করে না, আর করবেও না, তাই চলে যাচ্ছি।' যারা অসুরের

রূপধারণ করা মানুষ তারা দেবতাকে গ্রহণ করে না; তবে কি এই অসুর
মানুষগুলোর এটাই তকদির? আর যিশুর স্বেচ্ছায় শূলী আর কাঁটার
মুকুট পরাটা কি যিশুর তকদির? যে যিশু অন্ধকে চোখ দান করেছেন,
যে যিশু কুষ্ঠরোগীকে ভাল করেছেন, যে যিশু মৃতকে ‘আল্লাহর হুকুমে
জীবিত হও’ বলার সঙ্গে সঙ্গে জীবিত হয়েছে, যে যিশু মাটির তৈরি পাখি
(প্রাণ নাই তথা নফসই নাই)-কে ফুৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে জীবিত হয়ে
উড়ে গেছে, যে যিশু তার অনুসারীদেরকে বলতেন যে, তোমরা কে কী
দিয়ে খেয়ে এসেছো বলে দিতে পারি, যে যিশু বলতেন, তোমাদের
প্রত্যেকের বাড়িতে কোথায় কী রাখা আছে তা বলে দিতে পারি-সেই
যিশু দ্রুশ আর কাঁটার মুকুট মাথায় নিয়ে নীরবে মাথা নিচু করে হেঁটে
চলছেন-এ দৃশ্যটি দেখে বারো বছরের কিশোরী কন্যা সরল সহজ
যুক্তিতে মেনে পেরেছিলো না। তাই বলেছিল, প্রভু তুমি একবার বললেই
তো সব জঞ্জাল দূর হয়ে যায়। (কোরানের আলে ইমরান সূরার
উনপঞ্চাশ আয়াতের ভাবার্থ)। যিশু এত কিছু রহস্যপূর্ণ কথা বলে দিতে
পারেন আর মা আয়েশার কিছুক্ষণের হারিয়ে (?) যাবার ঘটনাটি কেন্দ্র
করে মহানবীর এলমে গায়েব না জানার দলিলটি প্রচার করে ওহাবিরা।
হায়রে খোদা! এরা কোন ধরনের মুসলমান? সামান্য সৌজন্যবোধটুকু
হারিয়ে ফেলেছে। মহানবীকে বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করার উপদেশ
খয়রাত করে ওহাবিরা। অথচ কোরানই ঘোষণা করেছে যে, মহানবীর

স্বীরা মোমিনদের মা! মহানবীর স্বীরা মোমিনদের মাতা আর
মহানবীকে বড় ভাই বলার উপদেশ। বড় ভাইয়ের স্বীরা তো সমাজের
প্রচলিত ধারা অনুসারে বড় ভাবী হয়ে যায়। এত বড় অকের গরমিল
কেমন করে প্রচার হচ্ছে ভাবতেও অবাক লাগে! হায় ওহাবি, হায়
ওহাবিদের ব্যাপক প্রচার! ওহাবিদের গুরু ঠাকুর ইমাম ইবনে
তাইমিয়া, ইবনে কাসির (যার কোরান তফসিরটি ইসলামিক
ফাউন্ডেশনে এগারো খণ্ডে অনুবাদ করা হয়েছে) আবদুল ওহাব
নজ্জিদের ব্যাপক প্রচারের সামনে সুন্নি মুসলমানরা বোবা হয়ে আছে।
সুন্নি গরিব লেখকদের পাশে ত্যাগের আদর্শ নিয়ে হাতে গোনা কয়েকজন
দাঁড়ালেই ওহাবিদের চেহারা ধরা পড়ে যাবে। ধরা পড়ে যাবে
ওহাবিদের সর্বপ্রকার জারিযুরি। অধম লিখকের বাবা বেলাল শাহ,
তোমায় বলে রাখলাম, একদিন সবাই তোমাকে ধন্য ধন্য করবে। স্মৃতির
মনুস্মেন্টে নয় বরং আশেকে রসুলদের ভালোবাসার হৃদয়ে তোমার
নামটি খোদাই করে রাখবে।

তারপর? তারপর যিগুকে শূলে চড়ানো হল। ইহুদিদের নির্গম ঠাট্টা
বিদ্রূপের মধ্যে মাত্র কয়টি কথা তুলে ধরছি। যেমন, যিগু, তুমি ভণ্ড
নবী। আমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি মৃতকে জীবিত করতে
পার, কিন্তু আমার তোমার মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছি, এই মৃত্যুদণ্ড হতে যদি তুমি

বেরিয়ে আসতে পার তো বুঝবো তুমি আসল নবী। আর যদি আমাদের দেওয়া মৃত্যুদণ্ডটি এই শূলীতে হয় তো তুমি ভণ্ড নবী। যিগু, তুমি এত কিছু করতে পার এবং পেরেছ যা আমরা নিজেদের চোখে দেখেছি, কিন্তু আমাদের দেওয়া মৃত্যুদণ্ড হতে বেরিয়ে আসো। এ রকম জঘন্য ভাষায় জঘন্য ঠাট্টা আর নির্মম বিদ্রূপাত্মক কথা।

প্রিয় পাঠক বাবা এবং মায়েরা, একটু ভাবুন তো, যদি সেই দিনে সেই সময়ে আমাদের মাঝে যারা ধারালো যুক্তিতে বিশ্বাস করেন তারা সেইখানে উপস্থিত থাকতেন, ইহুদিদের এ রকম কথা শোনবার পর কী অবস্থাটি হতো! যুক্তিবাদীরা কি যিগুর পক্ষ নিতেন, না ইহুদিদের পক্ষ নিতেন? যিগু সেই শূলীতেই মৃত্যুবরণ করলেন। মারা যাবার আগে কেবল একটি কথাই বলে গেলেন, ‘আল্লাহ, এদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও। এরা কী করেছে আর কী বলছে তা তারা নিজেরাই জানে না।’

বুকে হাত রেখে বলুন, যুক্তি মানবেন না তকদির মানবেন?

জানি কোনোটাই মানার শক্তি আপনার নাই। তবু বলছি, যদি যুক্তি মানেন তো এটাই আপনার তকদির, আর যদি তকদির মানেন তো এটাই আপনার তকদির। যদি বিদ্রোহ করেন তো এটাও আপনার তকদির। যদি বিষয়টিতে সন্দেহ করেন তো এটাও তকদির। যদি ধরি মাছ না হুঁই পানির ভূমিকাটি পালন করেন তো এটাও তকদির। যদি

বলেন, এগুলো পুরনো কথা-এখন এগুলো অচল, তো এটাও তকদির। তকদিরের বাহিরে একটি পা রাখার কারো কোনো ক্ষমতা নাই। আপনি-আমি যদি তখন সেখানে থাকতাম আর ইহুদিদের আরপ্তমেন্টগুলো গুনতাম আর সেই সঙ্গে যিশুর নীরবতায় কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম? ইহুদিদের যুক্তির তরবারির তলে, না ক্রুশে বিদ্ধ মৌন যিশুর দিকে? তুমি যদি আসল নবী হয়ে থাকো তো আমাদের ক্রুশ হতে বেরিয়ে আসো। আমরা সাক্ষী দিচ্ছি যে, তুমি মৃতকে জীবিত করতে পার, কিন্তু আমাদের দেওয়া ক্রুশ হতে বেরিয়ে আসতে পারছো না কেন? ইত্যাদি জোড়ালো যুক্তির কথাগুলো একদিকে আর অন্যদিকে ‘ওরা জানে না যে ওরা কী করছে, আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও’-যিশুর মহাক্ষমার মহামন্ত্র। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পেছনে নিষ্ঠুর তকদির দাঁড়িয়ে থাকে প্রতিটি মানুষের পেছনে।

জমিদার অতুল চন্দ্র চক্রবর্তীর দৃষ্টান্ত

‘কাল (সময়, টাইম)-কে গালি দিতে নাই, কারণ আমিই কাল’-এই বাক্যটি কমবেশি জ্ঞানীদের জ্ঞানা থাকার কথা। সুতরাং যুগের পরিবেশে যুগের ঘটনা তৈরি হয়। ঢাকার নবাব স্যার সলিমুল্লাহর নামটি জ্ঞানা থাকার কথা। শুনেছি মহারাণী ডিকটোরিয়া নবাবকে সাত খুন পর্যন্ত মাপ করে দেবার সনদটি দিয়েছিলেন। সেই আমলে আমাদের দেশ

জমিদার-রাজা-মহারাজাদের দিখে ভরা ছিল। ময়মনসিংহ (বৃহত্তর) জিলার প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন সূর্যকান্ত মহারাজ আর নেত্রকোণার গ্যাংগাটিয়ার জমিদার অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী। কিন্তু ঢাকার নবাব ডাক দিলে সঙ্গে সঙ্গে আসতে হতো। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় মহারাজা-জমিদারদের পা ও চৌঁট কাঁপতো এক অজানা ভয়ে। শুনেছি ভাওয়াল রাজাকে নবাব সলিমুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময়ে কয়েকবার পানি পান করতে হতো। পুরনো ঢাকার শ্যামবাজারে অবস্থিত বিশাল অট্টালিকার মালিক জমিদার রূপলাল বাবু এবং ভাগ্যকুলের রাজা বাবু এবং ফরিদপুরের ভাস্কর থানার জমিদার বাবু নবাব সলিমুল্লাহর সামনে করজোরে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং মৃদু পা কাঁপতো। কারণ কখন তার হাতের এলজি গুলি-ভরা ‘আই হলি’ বন্দুকটি গর্জে ওঠে। নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন দানবীর, উদার, ন্যায়বিচারক আবার মেজাজ গরম হলে রক্তা নেই।

বর্তমান নেত্রকোণা জিলার গ্যাংগাটিয়ার জমিদার ছিলেন অত্যাচারী। প্রজাদের মানুষ মনে করতেন না। তারই এলাকায় এক মুসলমান প্রজা ছেলের বিয়েতে গরু জবাই করে চলনের মেহমানদের খাওয়ালেন। কিছুদিন পর জমিদারের কানে গরু জবাই করার কথাটি যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই মুসলমান প্রজাটিকে জমিদারবাড়িতে আনা হলো। প্রজাটিকে প্রশ্ন করার পর

প্রজা সত্য কথাটিই বললেন যে, ছেলের বিয়েতে গরু জ্বাই করেছে। জমিদার রাগে উত্তেজনায় সেই প্রজার গালের লম্বা দাড়ির অর্ধেকটি ছিঁড়ে ফেললেন। প্রজাটি অসহ্য বেদনায় কাতরাচ্ছে দেখে জমিদার আর কোনো হাত না তুলে তাড়িয়ে দিলেন। মুসলমান প্রজাটিকে তার এলাকার সবাই কমবেশি সম্মান করতো। উনি লজ্জায় আর বাড়িতে না গিয়ে সোজা ঢাকায় চলে এলেন। এসেই ঢাকার নবাব বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে সব ঘটনা খুলে বললেন। গালের দাড়ির এতেন দৃশ্য দেখে এবং সব কথা শুনে নবাব রাগে কাঁপছেন। তুমি আমার বাড়ির মেহমান, আমার অনুমতি ছাড়া কোথাও যাবে না আর দাড়িতে হাত লাগাবে না।

নবাব বাহাদুর সব জমিদার, রাজা-মহারাজাদের একটি নির্দিষ্ট দিনে দাওয়াত করলেন। নির্দিষ্ট দিনে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে খাদ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। এমন সময় নবাব বাহাদুরের সিংহাসনটি আনা হলো এবং নবাবের আগমনের খবরটি জানিয়ে দেওয়া হলো। তখন খাবার পরিবেশনের প্রস্তুতি চলছে আর এমনি সময় ‘আই হলি’ নামক দোনালা বন্দুক হাতে নবাব সিংহাসনে বসেই বললেন, ‘আপনারা খানা খাবার পর আপনাদের থেকে আমি একজনকে প্রকাশ্যে গুলি করে মারবো।’ কেউ আর খানা খান না। সবাই ভয়ে কাঁপছে। এমন সময় ডাওয়ালের মহারাজা উঠে বললেন, ‘নবাব বাহাদুর, এই কথা শোনার পর কার

পেটে খাবার যাবে? দয়া করে যাকে মারবেন তার নামটা বলে দিলেই খানা খেতে পারি।’

নবাব বাহাদুর সেই অর্ধেক দাড়ি ছিঁড়ে ফেলা মানুষটিকে ডেকে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, ‘দেখুন, এই লোকটির অবস্থা। এই লোকটিকে যদি চাবুকের আঘাতে মেরে ফেলা হতো তো আমার বলার কিছু ছিল না। কারণ শ্রেণিচরিত্রে আমরা সবাই কমবেশি এক রকম। কিন্তু এই লোকটির দাড়ি অর্ধেক ছিঁড়ে ফেলে ধর্মের অপমান করা হয়েছে। যদি কোনো মুসলমান আমার এলাকায় দুর্গাপূজা অথবা কালীপূজায় দেবীর মূর্তিতে আঘাত করে তো আমি একই রকম বিচার করবো। কারণ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মে ইহা সরাসরি আঘাত। ধর্মের উপর কোন জোরজবরদস্তি নাই-এটা কোরানের কথা, এটা ইসলামের আদর্শ। যদি কেউ খ্রিস্টানদের ক্রুশে বিদ্ধ যিশু ও মরিয়মের মূর্তির উপর আঘাত করে তা হলে আমি একই বিচার করবো। দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে এই বিচার। মানুষ কখনো পরধর্মের ওপর আঘাত করার সাহস পাবে না। তাই যিনি এই লোকটির দাড়ি অর্ধেক ছিঁড়েছেন তাকে আমি এই শর্তে ক্ষমা করতে পারি যদি এই টেবিলে রাখা গরুর রান্না করা মাংস আর ঘিয়ে ভাজা পরোটা সবার সামনে এই চেয়ারে বসে খায়।’ আর যায় কই! খাবার টেবিল হতে উঠে আসছেন গরুর মাংস আর ঘিয়ে ভাজা পরোটা খেতে জমিদার অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী। সবাই অবাক। সবাই

বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। জমিদার অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী গোস্ব আর পরোটা খেয়ে নবাব বাহাদুরের কাছে ক্ষমা চাইলেন। সেই দিনে সেই পরিবেশে এমন বিচার করা চারটিখানি কথা নয়। কারণ তখন অধিকাংশ এলাকাই ছিল হিন্দু জমিদার, রাজা, মহারাজাদের দখলে। এই সেদিন ব্রিটিশ আমলে হিন্দুদের জলভর্তি মাটির কলস মুসলমানদের অনিচ্ছাকৃত স্পর্শের কারণে ভেসে ফেলার দৃশ্য অধম লিখক নিজে দেখেছি। অধম লিখক একজন ছোট পীর সাহেব। লক্ষ খানেক মুরিদের মাঝে বহু হিন্দু মুরিদ আছে। তারাও বই ছাপা হলে এই লিখা পড়বে। তারা জানে যে, তাদের পীর সাহেব সাম্প্রদায়িক কি না।

জমিদার অতুল চন্দ্র চক্রবর্তী কল্পনাও করেন নি গো-মাংস খাবার কথা : কিন্তু তাকে খেতে হয়েছে। কেন? উত্তরটি হলো তকদির। তকদিরে লিখা ছিল বলেই গো-মাংস খেতে হয়েছে। খান্নাসরুপী শয়তান আমার এই লিখা পড়ে কত কিছু ভাবতে চাইবে, কত রকম নিগেটিভ আর পজেটিভ সমালোচনা করতে চাইবে। সুতরাং তকদির কোটি মানুষকে কোথায় কোন পরিস্থিতির শিকার করে তা আমরা জানি না। তবে একটি কথা সত্য যে, ওলিয়ে কাম্মেল যে-তকদির বদলানো যায় সেই তকদিরটি বদলিয়ে দিতে পারে। কারণ ওলিয়ে কাম্মেলের রূহ তথা পরমাত্মা জাগ্রত থাকে এবং ইচ্ছা করলে তকদির বদলিয়ে দিতে পারেন। কারণ মানুষ আর জ্বিন ছাড়া আল্লাহর জাত -নূরের পরিচয় পাওয়া সম্ভব

নয়। মানুষ আর জ্বিনের শাহারগের নিকটেই আল্লাহ থাকেন। এই থাকার জাত-রূপ নিয়ে থাকা। সেফাতি রূপ নিয়ে নয়। সেফাতি নুরের বিবর্তনের ধারায় সমস্ত সৃষ্টি। তাই বলা হয়েছে যে, যে দিকেই তাকাও না কেন আল্লাহর চেহারা ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। তিনিই এক এবং আল্লাহ হতে পৃথক হয়ে আর কেউ আছে বলার ক্ষমতা কারো নাই। কারণ আল্লাহ হতে আলাদা হয়ে কেউ থাকলে তো বলতে পারবে এবং পৃথক বলাটাই হবে শেরেক। তাই সৃষ্টিরাজ্যে শেরেক থাকার প্রশ্নই উঠে না। শেরেকটি থাকে কেবলমাত্র দুইটি স্থানে। দুইটি স্থান ছাড়া শেরেককে থাকার অনুমতি আল্লাহ স্বয়ং দেন নাই। সেই স্থান দুইটির নাম হলো মানুষ আর জ্বিনের অন্তর। এই দুটো জীবকেই কেবলমাত্র সাম্মিত ইচ্ছাশক্তি দান করা হয়েছে। তাও আবার শেরেকটি বাস করে কল্পনাতে।

বাস্তবে শেরেক বাস করে না এবং বাস করার বিধান নাই। পরমাত্মা তথা রহকে জাগ্রত করার জন্যই ধর্মের এত আয়োজন। এত আচার-অনুষ্ঠান। পরমাত্মা জাগ্রত হতে না পারলে ধর্মের এত আয়োজন, এত আচার অনুষ্ঠানের মূল্যটি থাকে না। তখন সমস্ত বিষয়গুলো হয়ে পড়ে উদ্দেশ্যহীন এবং লক্ষ্যশূন্য। তখনই সব কিছু বাকিতে কেনাবেচা শুরু হয়ে যায়। বাকি অর্থ মৃত্যুর পরপারে আর নগদ হল জীবিত থেকে পাওয়া। এই নগদ পাবার জন্য বৃহৎ সাধক সব রকম জালাযব্বণা হাসিমুখে সহ্য করে সাধনার পথে বিরাট ধৈর্যধারণ করে এগিয়ে যেতে থাকে।

কত রকম মোহমায়ার পথ, কত রকম জাগতিক ক্ষমতা আর ঠুনকো সম্মান পাবার দুর্গম পথ পাড়ি দিতে হয় সাধককে বুকে বিরাট ধৈর্যধারণ করে। এ রকম ধৈর্যধারণকারীদের সঙ্গেই আল্লাহ থাকেন বলে ঘোষণা

করেছেন। দুনিয়ার ধনসম্পদের লোভ একটি মারাত্মক লোভ। ধনসম্পদ পাবার পর আসে ক্ষমতার গদা ঘুরাবার লোভ। ক্ষমতার গদা ঘুরাবার লোভের সঙ্গে আসে দুনিয়ার ঠুনকো সম্মান পাবার লোভ। এভাবে এত লোভের বাজার জয় করে আল্লাহর ওলি হওয়াটি সহজ কাজ নয়। তাই গুরু নানকের পীর সাহেব হজরত বাবা বাহালুল দানা গুরু নানককে উপদেশ দিয়েছিলেন এই বলে যে, তোমার মন হতে দুনিয়ার মানসম্মান যেদিন সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারবে সেদিনই তুমি অনায়াসে লাহত মোকামে যেতে পারবে। এর আগে সম্ভব নয়। কত বড় কথা! একজন অর্ধশিক্ষিত লোক যখন প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়ে যায় তখনই সেই লোকটির ভেতর মানব সমাজে জাগতিক সম্মান পাবার আর একটি মোহ মাথাচাড়া দিয়ে দিয়ে ওঠে। তখনই সে সম্মান পাবার আশায় চেয়ারম্যান, সংসদ-সদস্য অথবা মন্ত্রী হবার নেশায় বিভোর হয়ে যায়। এ নেশা যেন ধূমপান অথবা অন্য সব মারাত্মক নেশাকেও হার মানিয়ে দেয়। মানুষ তাকে নিয়ে ধন্য ধন্য করবে, ঘরে ঘরে আলোচনা হবে, খবরের কাগজে নাম উঠবে, ব্যাঙ্গের মান অপমানের খবর উঠবে। প্রতিবাদ, মানহানি আর কিছুটা হৈ চৈ। তারপর একদিন সব শেষ। এ রকম লোভী মানুষ নিয়ে মানব সমাজ আজ হতাশায় ভুগছে। কী সিদ্ধান্ত নেবে মানব সমাজ? এই জাতীয় লোভী মানুষের লোভের ভুগভুগি বাজিয়ে নিজেদের পা-চাঁটা মানুষরূপী বাঁদরদের দিয়ে নাচাচ্ছে। তাই

আসল-নকল চিনতে কষ্ট হয় আবার তার সঙ্গে তো আপন প্রবৃত্তির
ভেতর খান্নাসরূপী শয়তানের দিবা-নিশি কুমন্ত্রণা আছে। গণ্ডগ্রামের এক
সরু রাস্তা পিচ-পাকা দেখে বলেছিলাম এক সরল সহজ কৃষককে,
'বাবাজান, এই রাস্তাটি পাকা হবে বলে কোনদিন ভেবেছিলেন?' 'না
হজুর, ভাবি নি।' 'তা হলে কি বলতে পারি না যে উন্নয়নের জোয়ার
লেগেছে?' 'হ্যাঁ বাবা, বলতে পারেন, তবে আরও বেশি উন্নয়নের জোয়ার
লেগেছে বলে ধরে নিতাম যদি কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে তেত্রিশ
টাকা কেজি চিনি কিনতে পারতাম। শিশু বাচ্চার দুধ না হয় করতে
পেলাম, কিছু চিনি যে কিনতেই হবে। সারাদিন গাধার খাটুনি দিয়ে
বেগুন আর কাঁকরোল ফলিয়ে বাজারে পাইকারি বিক্রি করে যে ক'টা
টাকা হাতে পাই সে টাকা বড়ই কষ্টের টাকা, আর সেই কষ্টের টাকা
দিয়ে পিচ-পাকা রাস্তা হেঁটে মুদি দোকান হতে ষাট টাকায় চিনি
কিনতে হয়।' সরল-সহজ মানুষদেরকে ঠকিয়ে যারা নেতা হয় তারা
ঘুমের মধ্যেও মিথ্যা কথা বলে। যে কোনো প্রতারণার কৌশল অবলম্বন
করে যে কোনো মানুষ, তা সে পুলিশ-দারোগা হোক, আদমবেপারি
হোক, জাল দলিল করে মাথায় আঘাতকারী হোক, তা যে কোনো
উপায়ে হোক না কেন, এরা কিছু শাস্তিতে থাকতে পারে না। এমন রোগ
হয় যে অ্যাপোলো হাসপাতালে গলা-কাটা টাকায় চিকিৎসা করে। সন্ত
নগ্নলোকে ভালো মনে হলেও কোনো না কোনো দিকে একটি বোবা

হাহাকার লেগে থাকবেই। কারণ জনতার আমানত এরা কেবল খেয়ানতই করে না, বরং শোষণ আর জুলুম কত প্রকার হতে পারে তার এক্সপার্ট হয়ে যায়। এদেরকে যদি কেয়ামতের (মৃত্যু) পর সাপ হতে হবে বলে ভয় দেখিয়ে সাবধান করতে চান তো এরা বলে কি, আরে সাপ হলে দোষটা কোথায়? মানব জন্মে কান্দি বিরিয়ানি খেয়েছি, এখন সাপ হয়ে জীবন্ত হুঁদুর গিলে খাচ্ছি। রান্নাবান্নার বুটঝামেলা নাই, বাজারে যেতে হয় না ইত্যাদি। এ রকম কথাবার্তা শুনে চমকে গেলাম। একজনকে হাবিয়া দোজখের ভয় দেখালাম। বললাম, ‘হাবিয়া দোজখ হলো একটি গর্ত এবং সেই গর্তের তলা নাই, মানে জীবনভর পড়তেই থাকবেন।’ লোকটি বললো, ‘এ তো মজার ব্যাপার—কেবল পড়তেই থাকবো, কিন্তু তলা থাকলে তো হাড়গোড় ভেঙ্গে একাকার হয়ে যেত!’ এদের কথা শুনে আবু জাহেল আর আবু লাহাবের কথা মনে পড়ে গেল। এই মানুষ কত পাজি, হারামি, মীরজাফর, এজিদ, ফেরাউন, নমরুদ, হাঙ্কাজ, হিটলার আর মুসোলিনি হতে পারে তা ভেবেও অবাক লাগে। এই রং চং-এর বহু খেল না খেললে এত ইতিহাস, সাহিত্য, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন আর অগণিত বিষয়ের উদ্ভব হতো

না। তাই সুফি কবি আল্লামা ইকবাল বলেছিলেন, ‘আম্মার আন্নিটা, যে তোর প্রেমে কাঁদছে, আজ বুঝতে পারলাম যে, সেই আন্নিটাও যে তুই; আন্নি তোর প্রেমে না কাঁদলে চেউ থাকে না, বিলাপ নামক শব্দটি থাকে

না।’ মহান আল্লাহ, তুমি কখনো রহমান, কখনো ধৈর্যের প্রতীক হালিম, কখনো ধ্বংসের প্রতীক কাহহার। এক সঙ্গে তোমার এত রূপ-ভেবে অবাক হই। ভেবে অবাক হই যে আমিটা, সেটাও তো তুমি। কারণ ‘লা মগজুদা ইল্লাল্লাহ’ : ‘আল্লাহ ছাড়া কোনোই অস্তিত্ব নাই’। অস্তিত্ব নাই তো শূন্য। তাই শূন্য কাঁদে না, হাসে না; বরং অস্তিত্বই কাঁদে, হাসে।

ম্লেজাজি আর হাকিকি

আবার সেই পুরনো কথায় ফিরে আসছি। মক্কার মিনাতে যে তিনটি শয়তান ঠায় দাঁড়িয়ে আছে উহারা ম্লেজাজি শয়তান। উহারা শয়তান নয়-কথাটি বলা যাবে না। কারণ তা হলে শরিয়তের দর্শনটি থাকে না। শরিয়তের দর্শনটিকে রাখতে হবে হাকিকি দর্শনটিকে বুঝিয়ে দেবার জন্য। তাই ইসলাম হলো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন। দর্শনে প্রয়োগ থাকে, অনুষ্ঠান থাকে, নানা রকম বিধান থাকে; কিন্তু চরম পর্যায়ে ইসলাম হলো একটি পরিপূর্ণ জীবন দর্শন।

মক্কায যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ মানুষ আদম কর্তৃক বসানো হয়েছিল একটি ঘর, সেই ঘরটির নাম কাবা শরিফ। মাটি বা পাথরের ঘরে কখনো আল্লাহর জাতি নূর না থাকলেও ধরে নিতে হবে যে, কাবাতে আল্লাহর জাত নূর আছে। এই ধরে নেওয়াটাই শরিয়ত। তাই মক্কার কাবা ঘরটি হল

ম্লেজাজি কাবা। হাকিকি কাবার পরিচয় করার দর্শনটি হলো ম্লেজাজি কাবা। কারণ ম্লেজাজি কাবাটি না থাকলে হাকিকি কাবার দর্শনটি বুঝতে কষ্ট হতো। মূর্তের পেছনেই বিমূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। হাকিকি কাবা মোমিনের সঙ্গেই আল্লাহ আছেন। সূরা আনফালের উনিশ নম্বর আয়াতটি এই কথাটিই বলছে। সুতরাং মোমিনের দিলটি হলো হাকিকি কাবা। মোমিনের দিল-কাবার হজ্জটি কেমন করে করতে হবে তারই জন্য ম্লেজাজি কাবার প্রয়োজন। আবার ম্লেজাজি কাবাটিকে অনুসরণ করেই ম্লেজাজি মসজিদ বানানো হয়। হাকিকি মসজিদটি হলো মোমিনের দিল-কাবা। (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে শাহ সুফি সদরউদ্দিন আহমদ চিশতীর রচিত মসজিদ দর্শন বইটি পড়লেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। আবার ম্লেজাজি কাবা ও হাকিকি কাবার দর্শনটি জানতে চাইলে শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীর রচিত কেবলা ও সালাত বইটি পড়লেই পরিষ্কার বুঝতে পারবেন।) ওহাবিরা হাকিকি কাবা ও হাকিকি মসজিদকে ইসলামি দর্শন হতে উপড়িয়ে ফেলে দিয়েছে। তাই ম্লেজাজি কাবা আর ম্লেজাজি মসজিদের মধ্যেই সমস্ত দর্শনটিকে ধরে রেখেছে। তাই ধর্মটি হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে অনুষ্ঠান সর্বস্ব। সব রকম অনুষ্ঠানের দর্শনের পেছনেই যে হাকিকি দর্শনটি দাঁড়িয়ে আছে তা দেখেও দেখতে চায় না, বুঝেও বুঝতে চায় না। তাই আজ আমরা দেখতে পাই যে, সারা দুনিয়াতে সাতান্নটি

মুসলিম দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্নে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। গবেষণা শব্দটিই আজ মুসলিম দেশগুলো হতে উঠে গেছে। যারা গবেষণার স্বাধীন দরজাটিকে জোর করে বন্ধ করে দেয়, তারা সভ্যতার হাসপাতালে স্যালাইন নেয়। যার জ্ঞান-গবেষণার জন্য দুর্গম চীন দেশেও যাবার আদেশ আর উৎসাহ আছে, আজ সেই জাতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আজ এমন এক আজব পরিবেশ সমাজের বুকে সিদ্ধাবাদের দৈত্যের মতো আনুষ্ঠানিকতার বোঝাটি ঘাড়ে চেপে বসে আছে যে, আসল সত্য কথাগুলো বার বার খুলে বলতে হচ্ছে। আজ মুসলিম বিশ্ব আনুষ্ঠানিকতার লাঠিকে আসল পা মনে করে ধরে আছে এবং কেউ যদি বোঝাতে চায় যে এটা আসল পা নয় বরং লাঠি, তা হলে তাকে সম্মান প্রদর্শন করা তো দূরে থাক বরং আনুষ্ঠানিকতার বাণগুলো নিক্ষেপ করতে অস্থির হয়ে উঠে। চুরি-ডাকাতির মাল কিনে নেবার সময় কিছুই মনে থাকে না, কিন্তু ‘তাড়াতাড়ি অজুর পানি দাও-সময়মতো নামাজ না পড়লে মনটা অস্থির লাগে।’ এই চমৎকার দর্শনে আমরা কন্মবেশি সবাই গা ভাসিয়ে দিয়েছি।

এবার আসুন, খাজা বাবা কী বলেন। গুলিদের মহারাজা খাজা বাবা, যিনি অখণ্ড ভারতে আটশত বছর আগে মাত্র চার কোটি মানুষের মধ্য হতে বিরানব্বাই লাখকে মুসলমান বানিয়ে ছিলেন-কোরানে বর্ণিত

যতজন নবী আছেন সবাই মিলে তার বারো ভাগের এক ভাগ মুসলমান বানাতে পেরেছেন কি না সন্দেহ—সেই ওলিদের মহারাজা সুলতানুল হিন্দ খাজা বাবা কাবা ও হজ বিষয়টিতে কী বলে গেছেন আসরারে হাকিকি নামক পুরনো ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থে! আজ হতে ঊনচল্লিশ বছর আগে ভারতের শাহারানপুর হতে, আঠারো’শ আটানব্বই সালে, নওবল কিশোর নামক প্রকাশক লিখো প্রেসে ছাপানো একখানি মকতুবাত শরিফ খুব কষ্ট করে এবং বেশ কিছু টাকা খরচ করে সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! গ্রামের বাড়িতে আগুন লেগে ফারসি ভাষায় রচিত বহু মূল্যবান বইগুলোর সঙ্গে আসরারে হাকিকি বইটি পুড়ে যায়। অনুবাদ করার ইচ্ছা ছিল এবং সামান্য কলমও ধরেছিলাম; কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে, রাজশাহী হতে জ্ঞৈক মাওলানা জিয়াউল আলম মো. ইউসুফ খান বাংলায় অনুবাদ করেছেন এবং উনিশ’শ একান্ন সালে বই আকারে ছাপা হয়, অবশেষে এক কপি সংগ্রহ করেছি। আরও কিছু পরে জানতে পারলাম যে, শাহ সুফি বাবাজান মাওলানা লাল মিয়া বয়াতি এবং শাহ সুফি বাবাজান মাওলানা আবদুল হালিম বয়াতির পীর সাহেব—অধম লিখকের প্রাণপ্রিয় বন্ধুবর—মোনায়েরে আজম, আসরারে কবির, মেহেতাবে মারেফত হজরত শাহ সুফি বাবাজান মাওলানা ইস্রাইল চিশতীর কাছেও খাজার আসরারে এলাহি ছিল। লালবাগের বালুঘাটে অবস্থিত খানকায় আমি

নিজ হাতে সেই মকতুবাদ নেড়েচেড়ে দেখেছি। আমার আসরারে এলাহি উনিশ'শ বিরানব্বই সালের ছাব্বিশে ডিসেম্বর বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে যায়। এদিকে পীর সাহেব পর্দা নিলেন। জানি না, সেই অমর গ্রন্থটি বাবাজানের পুত্রদের কাছে আছে কি না। কারণ আর কোনো যোগাযোগ নাই। পরম শ্রদ্ধেয় ডাইজান জনাব জেহাদুল ইসলাম, যিনি আজমীরের মক্কা হাউজের খাদেম বাবা শাহ সুফি ফারুক হোসেন চিশতীর মুরিদ ছিলেন, তিনি সাহস করে দিওয়ান সহ বাংলায় অনুবাদ করেন। অনেকদিন যোগাযোগের অভাবে আমি জানাতে পারি নি যে, মূল বইটি শাহ সুফি বাবা ইস্রাইল চিশতীর কাছে আছে। তা ছাড়া ভাবতে পারি নি যে, তিনি এমন বিশাল কাজে হাত দেবেন। জানতে পারলে অথবা আমাকে জানালে বলে দিতে পারতাম। কী করবো! সবই তো তকদিরের খেলা। আমি এখন খাজা বাবার কিছু কথা তুলে ধরছি।

আগেই বলে রাখা ভালো যে, খাজা বাবা যে কথাগুলো বলেছেন উহা তিনি গনজে মাকফি তথা রহস্য জগত হতে দেখে নিয়ে বলেছেন যে, মহানবী উমর ফারুককে এই বলে উপদেশ দিয়েছেন যে, 'মহানবী বললেন, হে উমর, দৃঢ় বিশ্বাস রেখো যে, ইনসানের দিল খানায়ে কাবা এবং মোমিনের দিলে আল্লাহর আরশ। এই দিল-কাবার হজ্জ করা প্রয়োজন। হজরত উমর জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসুল, দিল-

কাবার হজ্জ কীভাবে সম্পন্ন করতে হয়? উত্তরে মহানবী বললেন, ইনসানের অজুদ দরজা বিশিষ্ট (আব, আতশ, খাক ও বাদ)। এই চারটি দরজা থেকে সকল প্রকার সন্দেহ, গোমরাহি ও গায়রুল্লার পর্দা দূরীভূত করলে দিলরুপ আয়নায় আল্লাহর জাতের জালুয়া নজরে আসবে। এটাই খানায়ে কাবার হজ্জের লক্ষ ও উদ্দেশ্য। এ রকম হাকিকি হজ্জ তথা আসল হজ্জের আরও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য হলো—ইনসান নিজের আমিত্ত্ব তথা হাশ্বিকে এমনভাবে মিটিয়ে ফেলবে যেন আমিত্ত্বের কোনো নামগন্ধও অবশিষ্ট না থাকে। এই পর্যায়ে তার জাহের ও বাতেন সমভাবে পবিত্র হয়ে যাবে এবং তার দিল আল্লাহর গুণে গুণাবিত হবে। হজ্জরত উমর বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার নিজের আমিত্ত্ব কেমন করে দূর করে দেবো?

মহানবী বললেন, আল্লাহর আশেক হলেই আপন আমিত্ত্ব ফানা করা সম্ভব। যে ব্যক্তি আল্লাহর আশেক হয়েছে সে ফানা ফিল্লাহ প্রাপ্ত হয়েছে এবং সেই ব্যক্তি আল্লাহর জাতের প্রকাশ্য রূপধারণ করতে পেরেছে।

হজ্জরত উমর জানতে চাইলেন, মোমিনের দিলকে খানায়ে কাবা ও আল্লাহর আরশ কেন বলা হয়েছে? মহানবী বললেন, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন : আমি তোমাদের নফসের সাথে মিশে আছি, তোমরা কি দেখতে পাও না? হে উমর, থাকার স্থানকে ঘর বলে এবং যেহেতু আল্লাহ দিলে অবস্থান করেন সেইহেতু দিলকে খানায়ে খোদা বা আল্লাহর

আরশ বলা হয়। হজরত উমর জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রসূল, এই ম্যাটির দেহে কে কথা বলে, কে শোনে এবং কে-ই বা সব কিছু জানতে পারে, আর সে-ই বা কে? মহানবী বললেন, ম্যাটির দেহে একমাত্র খোদাই কথা বলেন, শোনে, দেখেন এবং সব বিষয়ে জ্ঞানদান করেন। হজরত উমর জানতে চাইলেন, আপনিই কি সেই জ্ঞাত পাকের প্রকাশ্য রূপটি নন? মহানবী বললেন, আমি মিশ্র ব্যতীত আহমদ।

হজরত উমর জানতে চাইলেন, কাবায়ে দিলের হজ্জ কে করতে পারে? মহানবী বললেন, দিল কাবার হজ্জ সেই বান্দাই করতে পারে যে নফসের পর্দাগুলো দূর করে দিতে পারে—এবং বান্দা ও খোদার মধ্যে আর কোনো পরদা থাকে না তখন সে খোদার গুণে গুণাবিত হয়ে যায় এবং তখনই তার দিলের মাঝে খোদার জ্ঞাত প্রকাশিত হয়। বান্দার দিলে খোদার জ্ঞাত প্রকাশ হলেই আসল হজ্জটি হয়ে যায় এবং ইহাই হাকিকি হজ্জ। যারা এই আসল হজ্জটি করতে পারে না তারাই জাহের পরশ্ব এবং এরাই রাহে শরিয়ত তথা শরিয়তের পথে চলার দাবিদার। এশকে এলাহির পথে যে চারটি ধাপ আছে, এরা তার প্রথম ধাপেই অবস্থান করে। এই শরিয়তপন্থীরা মারফতের রহস্য কিছুই বোঝে না এবং জাহের পরশ্ব অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। এই দলটিকেই আহলে শরিয়ত বলা হয়। আবার যারা কখনো দুনিয়ার দিকে আবার কখনো দ্বীনের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাদের বাতেনি চোখ নূরে বাতেনিতে আলোকিত হয় না।

এদেরকে আহলে তরিকত বা তরিকতপন্থী বলা হয়। আর তিন ও চার নম্বর দলের মানুষেরা খাস, কারণ এদের বাতেনি চোখ খোলা এবং এদের দিলে আল্লাহর জাত পাকের মণ্ডজুদ এবং সর্ব অবস্থায় ঐরা আল্লাহর রহস্যে ডুবে থাকেন। এরাই আহলে হাকিকত এবং আহলে মারেফতে অবস্থান করেন।’

খাজা বাবা কেবল হজ্জের বিষয়টি বলেই শেষ করে দেন নি। উহার প্রতিটি বিষয় পড়লে অবাক হতে হয় এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাই। ধর্মের আসল বিষয়গুলো কী আর আমরা এতকাল কী পড়লাম, জানলাম আর বুঝলাম। এতকাল হাক্কী বিষয়গুলোকেই ধর্মের আসল বিষয় বলে মনে করেছি। এখন দেখি ধর্ম বিষয়টির আসল রহস্য বহু দূরে রহস্যের পরদায় অবস্থান করছে। খাজা বাবার আসরারে হাকিকি-র মতো অনেক গুলির অনেক মহামূল্যবান বইগুলো পুরনো ফারসি ভাষায় রচিত হয়েছে এবং এই মহামূল্যবান বইগুলো বাজারে আর পাওয়া যায় না। অধম লিখক দিল্লীতে এই বইগুলোর কথা বলাতে লাইব্রেরির মালিক সোজা বলে দিলেন : এসব ছাপিয়ে বিক্রি করবো কার কাছে? কয়জন আছে পুরনো ফারসি ভাষা জানে? বইয়ের ব্যবসা করবো না দানছত্র খুলে পুঁজিপাট্টা খতম করবো? উত্তর দিতে পারি নাই। যাদের মাতৃভাষা ফারসি, যাদের কাছে এই মহামূল্যবান বইগুলো পাবার আশা করবো, সেই ইরান তো শিয়া ফেরকার দেশ। সুফিবাদ

মেনে নেওয়া তো দূরে থাক, বরং সারাসার হারাম জানে। সমগ্র সৌদি আরবে সুফিবাদের উপর রচিত একটি আদনা বই লাইব্রেরিতে পাওয়া গেলে জেলের ভাত খেতে হবে। তাই যেসব সুন্নিরা সৌদিতে লিখাপড়া করতে যায় তারা পাক্ষা ওহাবি হয়ে দেশে ফিরে। আর বাংলাদেশের শাহ সুফি গাউসুল আজমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছেন। চেতনা একদিন আসবে, কিন্তু তখন আর তেমন কিছু করা যায় কি না সন্দেহ। অধম লিখক আর শাহ সুফি সদরউদ্দিন আহমদ চিশতী, এই দুই গরীব পীর সাহেব কিছুটা প্রচার করছে। হজরত বাবা বাহার শাহের পুতিন বাবা বেলাল শাহ আমার পেছনে দাঁড়াবার আভাস পেয়ে কিছুটা সাহস পেয়েছি।

খাজা বাবার লিখা নামাজের হাকিকত, রোজার হাকিকত এমন কি ইফতারির হাকিকত পড়ে চমকে উঠলাম। জাকাতের হাকিকত পড়ে তো আরও অবাক হলো। মানুষগুলোকে এভাবে আর অজানার অন্ধকারে কতদিন থাকতে হবে! আগে জানতাম ধর্মের ফল বাকিতে পাওয়া যায়। মারা যাবার পর পাওয়া যায়। এখন কেবল চোখ বুজে পালন করে যাও। একবার চিন্তা করলাম না যে, যে দুনিয়াতে অন্ধ সে আখেরাতেও অন্ধ। মরণ যে দুই প্রকার তা খাজা বাবার বই পড়ার পর পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। কারণ, মহানবী বলেছেন ‘মৃত্ত কাবলা আন্তা মৃত’, তথা

‘মরার আগে মরে যাও’। মরার আগে মরতে হলে জেহাদ করতেই হবে। এই জেহাদ তরবারির জেহাদ নয়, এই জেহাদ বোম্বা মেরে মানুষ হত্যার জেহাদ নয়, বরং আপন নফসের ভেতর খান্নাসরূপী শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ। দুধের মাঝে মাখন যেমন লুকিয়ে থাকে, তেমনি শয়তান খান্নাসরূপটি ধারণ করে নফসের ভেতর অবস্থান করছে। যত কথা, যত ধর্মের উপদেশ, যত প্রকার ধ্যানসাধনা সবগুলোর একটিমাত্র উদ্দেশ্য, একটিমাত্র লক্ষ্য, একটিমাত্র নিয়ত হলো : নফস হতে খান্নাসকে বের করে দাও, আর বের করে দেবার অপর নামটিই হলো মরার আগে মরে যাও। দুইজন ডাকলে শুনবেন না। একা ডাকলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবেন। আমার সঙ্গে আর একজন কে? কে আমারই মাঝে লুকিয়ে আছে অথচ আমার জানা নাই? সে-ই হলো খান্নাসরূপী শয়তান। তাকে নিয়ে যতদিন চলবে ততদিনই আন্নিত্ব নিয়ে চলা। আন্নিত্ব শব্দটির আসল অর্থটিই হল আন্নি যোগ খান্নাসরূপী শয়তান। এটাকে বের করে দেবার জন্য সমস্ত ধর্মকর্ম। এক জনমে বের করতে না পারলে পরজনমে। যেদিন বের করে দিতে পারবে সেদিন মুক্ত। সেদিন সর্বপ্রকার জ্বালাযন্ত্রণা হতে মুক্ত। এই মুক্তির অপর নাম হলো জ্ঞানাতুল ফেরদৌস। ভোগের কথা থাকলেও সেই ভোগ মেজাজি ভোগ। আসলে ভোগ নাই। আসলকে বোঝাবার জন্যই এত রকম মেজাজির আয়োজন। যে জনমে এসব বিষয় বুঝবার উপযুক্ত করে তোলা হবে সে জন্মে আর ওহাবি-খারেজি হতে

হবে না, হতে হবে না বস্তুবাদের পূজারি। দেহটি দেখা যায়। সবাই দেহটি দেখে, কিন্তু দেহের ভেতর তকদির দেওয়া জীবাত্মাটিকে কেউ দেখে না। দেহের মাঝে বাস করছে জীবাত্মা, অথচ রহস্যময়। আজ হোক আর কাল হোক, দেহ হতে এই রহস্যময় জীবাত্মা বেরিয়ে যাবে আর এক রহস্যময় জগতে। তা হলে তো দেখছি আমি নিজেই একজন জীবন্ত রহস্যলোক। অথচ বাস্তব নামক ভেক্সিবাজি, বাস্তব নামক মেক্সাজি ডুগডুগি বাজিয়ে মানুষগুলোকে আসল সত্যটি বুঝবার পেছনে বড়বড় দেয়াল দাঁড় করিয়ে চলছি। কী অপূর্ব আল্লাহর বিজ্ঞান। চোখের সামনে সব কিছু ধরা পড়ছে, দেখছে, শুনছে অথচ কিছুই ধরতে পারছে না। মায়ার এই অদৃশ্য শক্ত বন্ধন আর অনেক রকম আশার কথা শুনিয়ে সত্য বিষয়টি ধরতে দিচ্ছে না। এ রকম জলজ্যান্ত বিজ্ঞান ধরতে পারছে না মানুষের বানানো বিজ্ঞান। তবে ধাপে ধাপে মানুষের বানানো বিজ্ঞান অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিন্তু মানুষে মানুষে হিংসা, মারামারি, চক্রান্তের চালবাজি ইত্যাদির এখনও কোনো ষ্টমখ মানুষের বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারে নি। মানুষ যদি বিজ্ঞানের চরম উন্নতির পর্যায়ে উপনীত হয়ে অন্য কোনো গ্রহে বসবাস করতে পারে তো সেই গ্রহেও হিংসা, মারামারি, চালবাজি আর যুদ্ধ লেগেই থাকবে। মূল বিষয়টি যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। দেহের বিবর্তনের সঙ্গে কি মনের হিংসার বিবর্তন হবে না? সেই কবে খবরের কাগজে খুনখারাবি আর

হিংসাবিদ্রোহের ঘটনাগুলো পড়েছি। কিন্তু আজও খবরের কাগজে এসব পচা বিষয়গুলো আরও বেশি পড়তে হয়। এই পচা বিষয়গুলো হতে আমরা কবে মুক্তি পাব? আদৌ কি মুক্তি পাবার কোনো সম্ভাবনা আশা করা যাবে না? না যায় না? দুনিয়া কি এভাবেই চলবে? একজন ভোগ করবে আর একজন ত্যাগ করবে? ফুল কি মধু দিয়েই যাবে আর ভ্রমর কি মধু পান করেই যাবে? যদি অধর্মের কাছে এর উত্তরটি জানতে চান তো বলবো, নির্জনে পনেরটি বছর ধ্যানসাধনা করুন। পনের বছর এ জন্য বললাম যে, মহানবী পনের বছর হেরাশুহায় ধ্যানসাধনা করেছেন। সুতরাং এত বড় জলজ্যান্ত মহানবীর মহাসুন্নতটিকে আজীবনে কথা বলে, ছক্কাপাজার ভূয়া কাহিনী শুনিয়ে কেন আড়াল করে চলছেন!

যারা শরিয়তপন্থী তারা জাহের-পরস্তু। শরিয়তের অনুসারীরা বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানগুলোই বোঝে এবং এই আচার-অনুষ্ঠান পালন করাটাই ধর্মপালন করছি মনে করে এবং এভাবেই তারা মৃত্যুবরণ করে। কী পরিষ্কার ভাষায় খাজা বাবা তাঁর প্রধান খলিফাকে এই বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিয়েছেন। অন্য একস্থানে তো খাজা বাবা তাঁর প্রধান খলিফা বাবা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকীকে বলেছেন, শরিয়তপন্থীদের সঙ্গে ঝগড়া করতে যেয়ো না, বরং আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিয়ো। আল্লাহর হাতে কেন শরিয়তপন্থীদের ছেড়ে দিতে উপদেশ দিলেন? আমার মনে হয়, যারা মানবে না তাদেরকে শত দলিল দিয়ে প্রমাণ করে দিলেও

মানে না। এ রকম ভুরি ভুরি নমুনা বা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। তাদেরকে আল্লাহ বুঝবার তকদির দান করেন নি। সুতরাং বুঝাতে গেলেও দেখবেন এরা বুঝেও বুঝতে চায় না। এ বিষয়ে আমার অনেক ছোট ছোট অভিজ্ঞতা আছে। একবার এক শরিয়তপন্থী কাঠ মোল্লাদের অনুসারীর বাড়িতে চিকিৎসার জন্য গেলাম। আল্লাহ পাক রোগীকে সারিয়ে তুললেন। উনি আমার ব্যবহার এবং চালচলন দেখে আমার ওয়াজের কয়টি ক্যাসেট নিলেন এবং শুনলেন। উনার মনে ভালো দাগ কেটেছে বলে মনে হল। সেই সময় প্রতি সপ্তাহে শনি এবং রবিবার ডাক্তারি করতে যেতাম নরসিংদী জিলার শিবপুর থানায় আমার এক শিষ্য ডা. বাদলের হোমিও হলে। প্রচুর রোগী হত। সেই সূত্রে বাঘা ইউনিয়নের ব্রাহ্মণদি গ্রামের সেই শরিয়তপন্থী লোকটি অবশেষে আমার মুরিদ হয়। আমি বার বার না করার পরও আমার আর এক ভক্ত আলফা মৈশান ও রফিক মোক্তারের বিশেষ অনুরোধে মুরিদ করলাম। পরে একদিন কোথায় জানি এক ওহাবি মোল্লার ওয়াজের মাহফিলে শুনে এসেছে যে, খাজা বাবার ওরসের শিল্পি খাওয়া হারাম এবং যারা ওরসের শিল্পি খায় তারা জাহান্নামে যাবে ইত্যাদি। আর কী! সব শেষ। পরে অবশ্য কামারটেকের দলিল লেখক আলফা মৈশান ও নৌকাঘাটার রফিক মোক্তার সব কিছু বঝতে পারলো। এই দুজন তো যায় নি। প্রাণ দিয়ে আলফা মৈশান ভালবাসতো, কিছু কিছুদিন আগে উনি ওফাত হন। সুতরাং যে যাবার

তাকে ধরে রাখা যায় না, আর যে থাকে তাকে ধরে রাখতে হয় না। ছোঁচা বিড়াল তরকারি বার বার খেলে কৃষক ছালায় ভরে দূরে ফেলে দেয়, কিন্তু পরে দেখা যায় আবার এসে হাজির। যে থাকবার তাকে ছালায় ভরে ফেলে দিলেও ফিরে আসবে। সুতরাং শরিয়তপন্থীরা আসল বিষয়গুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝালেও বুঝে না। অনুষ্ঠানগুলোকেই ধর্মের আসল ও একমাত্র বিষয় মনে করে। অবশ্য এখন এদের সংখ্যা এত বেশি বেড়ে গেছে যে, হাকিকতপন্থীদের উপর লাঠিসোটা নিয়ে চড়াও হয় এবং কল্লিত শেরেক-বেদাতের দোষ চাপিয়ে নাজেহাল করতে চায় এবং অনেক করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে হাতাহাতি-মারামারি পর্যন্ত হয়ে যায়। সৌদি ওহাবিদের প্রচার এবং মালপানি আরও উৎসাহ দান করে। অবশ্য শরিয়তপন্থীদের সবাইকে পাইকারিভাবে দোষ দেওয়া যায় না। আমাদেরও কিছুটা প্রচার হওয়া উচিত। ফারসি ভাষায় লিখিত ওলিদের বইগুলো অনুবাদ করে ছাপিয়ে প্রচার করা উচিত। এ বিষয়টি সুফিবাদের অনুসারীদের কমবেশি বোঝা উচিত এবং কিছু সাহায্য ও সহযোগিতা করা উচিত। কিছু না পারুক, কম করে হলেও কোরবানির পণ্ডর চামড়ার দামটুকু দান করা যায়। অধম লিখকের সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ বইটির সমস্ত কাগজের টাকা কোরবানির চামড়ার দানের টাকায় করতে পেরেছি।

ম্লেজাজি কাবায় ম্লেজাজি হাজির ম্লেজাজি হজ পালন করতে বেশি মানুষ যায়। যাবার কারণ যাই থাক না কেন, কিন্তু ম্লেজাজি বিষয়গুলো চর্ম-চোখে দেখা যায়। অনেকে তো ম্লেজাজি হজটাকেই আসল হজ বলে ফেলে। বলে ফেলে, হাকিকি হজ আবার কী? হাকিকি হজ বলে কিছু নাই ইত্যাদি। অবশ্য এদের বিরুদ্ধে কিছু বলবার নাই। কারণ প্রত্যেকের বলার অধিকার ও স্বাধীনতা অবশ্যই আছে। যেমন তারা বলেই ফেলে যে, মক্কার মিনাতে যে তিনটি শয়তান আছে এরাই আসল শয়তান, এর বাইরে আবার কেমন করে শয়তান থাকতে পারে? আপন প্রকৃতির ভেতরে যে শয়তানটি খান্নাস আর মরদুদ রূপে অবস্থান করছে এটা মেনে নিতে চায় না। বিশাল একটি ধর্ম-দর্শনে ভিন্ন মত থাকাটা স্বাভাবিক। আমরা দেখতে পাই কোনো কোনো

দেশে রাজনীতির প্রশ্নে একটি বিশাল দলের অভ্যন্তরে ভিন্নমত থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু বিষয় আছে যা দিবালোকের মতো পরিষ্কার বুঝবার পরও তকদির তাকে বুঝতে দেয় না। আর যারা মোম্বিনের দিল-কাবার হজটি করতে পেরেছেন তাঁরা ম্লেজাজি হাজি নন, বরং হাকিকি হাজি। হাকিকি হাজিদের নামের আগে আলহাজ্জ শব্দটি আমার চোখে খুব কমই পড়েছে। একমাত্র খাজাবাবার দাদা-পীর হাজি শরিফ জিনদানার নামের আগে হাজি শব্দটি পাই। আর আজকাল পীর সাহেবেরা আসল হজের বিষয়টি মোটেই জানেন না, আর জানবেনই বা

ryxq

কী করে? কারণ খাজা বাবা, শামসেতাব্রিজ এদের রচিত ফারসি ভাষার বইগুলো কেমনে পড়বে? ফারসি ভাষাটি জানার কথাটি না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু এ বিষয়ের বইগুলো বাংলায় অনুবাদ দু-একটা হলেও টাকার দৈন্যতায় হয়তো হাজার খানেক বই কবে কখনও ছাপা হয়েছিল। একটু আগেই বলেছি যে, আসরারে হাকিকি নামক খাজা বাবার বইটি যিনি প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেছেন তিনি রাজশাহীর বাসিন্দা। আজ হতে ছাপ্পান্ন বছর আগে, একান্ন সালে, অতি কম দামের কাগজে ছাপিয়েছিলেন। আমাদের কপাল ভালো যে, দু-এক কপি কেমন করে যেন হাতে আসে। সুফিবাদের প্রচার নাই বললেই চলে। মাঝে মাঝে যা-ও দু-একটা সুফিবাদের উপর বই পাওয়া যায় তাতেও ওহাবি মতবাদের গন্ধ থেকেই যায়। কেন? সুফিবাদের কথগ-ই জানে না অথচ সুফিবাদের উপর লিখে ফেলেছে। পাঠক কোনদিকে যাবে? জানবার অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছুই জানতে পারে না। দেখতে পায় সুফিবাদের বইয়ের মধ্যেও মেজাজি অনুষ্ঠানের ফজিলত বয়ানের কথা। আর যত ফজিলতের বয়ান পাওয়া যায় তার সবগুলো বাকিতে পাবার আশার বাণী। বেঁচে থেকে মরার আগে কেমন করে মরতে হবে, কেমন করে আমিত্ব দূর করতে হবে, কেমন করে কে বুঝাবে যে আপন প্রবৃত্তির পূজাটিকে কোরান শয়তানের পূজা বলে ঘোষণা করেছে? কে বুঝিয়ে

ryxq

দেবে যে, শয়তান কেবলমাত্র আল্লাহর সৃষ্টিরাজ্যের মাত্র দুইটি স্থানে অবস্থান করার অনুমোদন পেয়েছে, আর সেই দুটি স্থানের নামই হল জ্বিন এবং ইনসানের অন্তর। অন্তর বিহনে শয়তানের বাস করার আর কোনো জায়গা নাই। মেরাজি হজের মোসুমে দেখা যায় মেরাজি হজে যাবার জন্য হাজার হাজার মানুষ লাইন দিচ্ছে। অবশ্যই মেরাজি হজের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে হাকিকি হজ তথা আসল হজটি কী, কেমন তা জানবার আগ্রহ খুব কম লোকের মধ্যেই থাকে। সুতরাং অনুষ্ঠানটি হয়ে যায় একমাত্র বিষয়। তখন মনেই হয় না যে, মেরাজি হজের ভেতর কোনো আসল বিষয় লুকিয়ে আছে কি না। দুধ তো পান করেই চলছি, কিন্তু যে দুধ পান করে চলছি তার মধ্যে মাখন লুকিয়ে আছে কি না। একি হল! কোন জামানায় বাস করছি যে, সবগুলো আসল বিষয় বাদ দিয়ে কেবল মেরাজি বিষয়গুলোকেই সব কিছু বলে মনে করছি এবং অপরকেও তাই বোঝানো হচ্ছে। ধরুন মক্কার কাবা ঘরটিই যখন মেরাজি কাবা এবং খাজা বাবার চিঠিটি পড়ে হজ বিষয়টির সামান্য কিছু কিছু ধারণা হয়েছে, তা হলে দুনিয়ার সমস্ত মসজিদগুলো তো মেরাজি কাবাকেই অনুসরণ করে বানানো হয়। যেখানে মক্কার কাবা ঘরটিই মেরাজি সেখানে মেরাজি মসজিদগুলোও আল্লাহর মেরাজি ঘর। আসল ঘরটি হল ওলিদের দিল। সুতরাং ওলিদের অনুসরণ করতে

ryxq

পারলেই হাকিকি কাবার রহস্যটি মৌখিক ভাবে জানা যায়, আর এ বিষয়ের রহস্য জানতে চাইলে আম্মাকে আপনাকে মোরাকাবা-মোশাহেদা কয়েক বছর করতেই হবে। এই বিষয়টিই মহানবী হেরাণ্ডহায় ধ্যানসাধনা করেই বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি তাঁর বিখ্যাত অমর গ্রন্থ মসনভিতে বলছেন, আউলিয়াদের দিলগুলোই হল আল্লাহর হাকিকি মসজিদ তথা আসল মসজিদ।

আম্মাদেরও দোষ আছে : আমরা যারে তারে আল্লাহর ওলি মনে করে মুরিদ হয়ে যাই এবং হালকা শিক্ষা দেওয়া হয়-সদরঘাটের ফুটপাথে দশ টাকার দীনিয়াত বইতেই এর চেয়ে বেশি কিছু জানা যায়। আম্মাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যার মাধ্যমে একবারে সব কিছু বুঝতে না পারলেও সামান্য কিছু তো বুঝতে পারবো। ধূয়া দেখলে যেমন আগুনের সঙ্কান পাবার আশা করা যায় তেমনি এমন কিছু একটা মোরাকাবা শিখিয়ে দিন যার মাধ্যমে রহস্যলোকের সামান্য কিছু বুঝতে পারি। একদম কিছুই পাব না, বরং মরে গেলে পাওয়া যাবে, এ কথার মধ্যে তো বাকির গন্ধটি থাকে। বাকির নাম তো ফাঁকি। যে ইহকালে অন্ধ থাকবে, সে পরকালেও অন্ধ থাকবে। ইহকালে রহস্যলোকের কিছু একটা না দেখতে পেলে পরকালে পাবার আশাটি বৃথা। তাই দুঃখ করে

ryxq

বলেছি যে, ‘দয়াল, মরণকালে দেখা দিও রে’ কথাটিতে দুই রকম অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হল, জীবিত থেকে মরতে পারলে দেখা দেবার আবেদনটি আর থাকে না। আর জীবিত থেকে মরার আগে মরে যাও তথা মৃতু কাবলা আনতা মৃত না হলে দুনিয়া হতে দেহসহ বিদায় নেবার সময় দেখা দেবার আবেদনটি হলো লেছড়া ফকিরের ছেচড়া বিলাপের ব্যর্থ কান্না। আনুষ্ঠানিকতার এক বোঝা রং চং যদি শরীরে ফুটে না উঠে বা দেহে ধারণ করা না হয় তো গুলি বলে অনেকেই মানতে চায় না। এমন কঠিন অঙ্ককার আর মেকি ধারণাগুলোর অবসান হওয়াটা বড়ই শক্ত কাজ। কারণ একটি মিথ্যাকে শতবার নয়, লক্ষবার যদি সত্য বলে প্রচার করা হয় তো মিথ্যার ম্লেজাজি ফাঁদে পড়াটা তো একান্ত স্বাভাবিক বিষয়।

রহস্যলোকের জ্ঞান

অনেকবার বলেছি যে, মানুষের মাঝে নফস এবং রূহ উভয়টি আছে। এই নফস আর রূহ (জীবাত্মা আর পরমাত্মা) আর এক জ্বিন জাতি ছাড়া কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। ফেরেশ্তা এমন এক আজব শক্তিশালী সেফাতি নূরের (জাত নূর নহে) তৈরি যে, এদের ভেতর না আছে নফস আর না আছে রূহ। জীবাত্মা আর পরমাত্মার ঝামেলা হতে ফেরেশ্তারা

মুক্ত। ফেরেস্ভারা যত প্রকার সম্মানই পাক না কেন, এমন কি রসুল পর্যন্ত হতে পারে এবং হয়, তবু এরা সর্বশ্রেষ্ঠ জীব নহে। সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলতে মানুষ এবং জ্বিনকেই বলা হয়। তবে যেহেতু আমরা জ্বিনকে দেখি না তাই ইচ্ছা করেই বাদ দেই। এই বাদ দেবার মাঝে কোনো দোষের বিষয় নাই। নফস আর রুহ বর্জিত ফেরেস্ভারা শক্তিশালী, কারণ আল্লাহ পাক তাদেরকে যথেষ্ট শক্তি দান করেছেন। এমন কি ফেরেস্ভাদেরকে রসুলরূপে পাঠিয়ে থাকার ঘোষণাটি কোরানে সূরা ফাতির ও সূরা হজ ও সূরা আনকাবুতে দেখতে পাই। কিন্তু ফেরেস্ভাদেরকে কোরানের একটি আয়াতেও নবী বলা হয় নি। কারণ নবী হলেন সর্ব বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু। কেন্দ্রবিন্দুতে ঝড় থাকে না। নবী কেবলমাত্র মানুষ হতেই বানানো হবার দলিলটি পাই। সুতরাং মানুষের পায়রবি করার জন্যই ফেরেস্ভাদের বানানো হয়েছে। নফস এবং রুহের অধিকারী মানুষটি নিজেই ধরতে অথবা বুঝতে পারে না যে, তার দেহের ভেতর কেমন করে নফস আর রুহ আছে। একটি মানুষ কেবল নিজের দেহের অবস্থানটি বুঝতে পারে। ক্ষুধা, ঘুম, যন্ত্রণা, হাসি, আনন্দ আর সম্মান বিষয়গুলো বুঝতে পারে এই দেহ নামক জীবন্ত কবরে অবস্থান করার দরুন। একটি মানুষ বুঝতেই পারে না অথবা বুঝতেই চায় না যে, এই জীবন্ত দেহটাই জীবাত্মার কবর। পাখিকে যেমন খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখে তেমনি মানবদেহ নামক জীবন্ত খাঁচায় জীবাত্মাটিকে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। তাই

মানুষ রহস্যলোকে থেকেও এই দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকার দরুন বাহিরের সব কিছু বুঝতে পারে, কিছু জীবাত্মাটির বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যায়। মারেফতি গান আর মারেফতের কিছু বই পড়ে অথবা এখানে সেখানে গিয়ে কিছু কথা শিখলেই রহস্যলোকের জ্ঞান অথবা মারেফতি জ্ঞানের কাঁচকলাটিও বুঝবার উপায় থাকে না। বুঝবার একমাত্র উপায়টি হলো সেই পীরের কাছে মুরিদ হওয়া, যিনি এই রহস্যলোকের জ্ঞান হাসেল করতে পেরেছেন। অন্যথায় অনুষ্ঠান-উপাসনার ভরং চরং দেখিয়ে যারা পীর সাজে তারা রহস্যলোকের জ্ঞান বিষয়ে অন্ধ। আর, এক অন্ধ অপর অন্ধকে কেমন করে পথ দেখাবে? পথ দেখাতে গিয়ে দুজনাই গর্তে পড়ে যায় এবং গর্তে পড়াটাই স্বাভাবিক। নির্জনবাস আর বছরের পর বছর মোরাকাবা করার নিয়মকানুনগুলো শিখিয়ে দিতে হবে। মোকাম্ম আর লতিফার সুক্ষ্ম বিষয়গুলো শিখিয়ে দিয়ে নির্জনবাসে ধ্যানসাধনার পথটি দেখিয়ে দিতে হবে এবং সেই সঙ্গে মুরিদকে বলে দিতে হবে যে, এতদিন আমার কথামতো ধ্যানসাধনার মোরাকাবাটি করে যদি রহস্যলোকের কিছুটা জ্ঞান অর্জন করতে না পার তবে আমাকে ফেলে দিয়ে অন্য পীরের মুরিদ হয়ে যেয়ো। আজকালকার পীর সাহেবরা এ রকম কথাটি যে বলতে হবে মুরিদকে তা-ও জানে না। কারণ যিনি পীর হয়েছেন তিনি জীবনে মাত্র একটি চার মাসের মোরাকাবা করেন নাই। যিনি মোরাকাবাই করেন নাই তিনি

আবার কেমন করে পীর হন? ধর্মীয় বই-পড়া প্রচুর বিদ্যা দিয়ে বিদ্বান হওয়া যায়, কিন্তু রহস্যলোকের জ্ঞান অর্জন করা যায় না। রহস্যলোকের জ্ঞান যিনি অর্জন করতে পেরেছেন সেই রকম পীর সাহেব ছিলেন হজরত বাবা শামসেস্তাব্রিজ। তাই বিশ্ববিখ্যাত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি, যিনি মানুষের রচিত কোরান মসনডি শরিফ রচনা করেছেন, তিনি নিরঙ্কর বাবা শামসেস্তাব্রিজের মুরিদ হয়ে রহস্যলোকের জ্ঞান অর্জন করলেন। রহস্যলোকের জ্ঞানটি কখনোই মাথায় থাকে না, বরং সিনায় অবস্থান করে। সুতরাং মাথার জ্ঞানটি দেহ-মনটির সাময়িক চাহিদা মেটাতে চায়, মাথার জ্ঞান প্রতিযোগিতা শেখায় এবং আরও জাগতিক বিষয়ের অনেক কিছু। কিন্তু সিনার জ্ঞান যে রহস্যলোকের জ্ঞান, জীবাত্মা আর পরমাত্মার জ্ঞান, সেটা বাবা শামসেস্তাব্রিজ মাওলানা রুমিকে শিখিয়ে দিতে পেরেছিল বলে মাওলানা রুমি অকপটে স্বীকার করে লিখে গেছেন যে, মাওলানা রুমি নিজে নিজে কামেল হতে পারে নি, বরং যতক্ষণ পর্যন্ত না শামসেস্তাব্রিজের গোলামি গ্রহণ করেছি। গোলামি গ্রহণ করার মানেই হলো পীরের কথামতো ধ্যানসাধনার মোরাকাবাটি করা। আজকাল এ রকম পীরের বড়ই অভাব। আজকাল কেবল দোয়া-তাবিজ, ঝাড়ফুক আর দুনিয়াবি

উন্নতি কেমনে হবে, কেমনে শত্রু দমন করা যাবে, কেমনে প্রেম করে মেয়ে ভাগিয়ে আনা যাবে ইত্যাদি লজ্জাজনক বিষয়ের পীর দিয়ে ভরে

গেছে। আজকালকার মানুষগুলোর মাঝে খুব কমই আছে যারা কেমন করে আল্লাহ পাওয়া যাবে, কেমন করে রহস্যলোকের জ্ঞান হাসেল করা যাবে, কেমন করে জীবাত্মা আর পরমাত্মার সামান্য কিছুটা রহস্য জানা যাবে, কেমন করে জানা যাবে যে, এই জীবন্ত দেহটাই জীবাত্মার কবর-যত জ্বালা-যন্ত্রণা, যত বালা মুসিবৎ, যত আজাব আর শাস্তি এই দেহ নামক জীবন্ত কবরটি প্রতিটি দিন ভোগ করে চলছে ইত্যাদি বিষয়গুলোর রহস্য জানতে চাই, পীর সাহেব। তাই আজ আমরা লেছড়া আর ছেচড়া পীর-ফকিরদের পাল্লা-বাটখারা দিয়ে বড় পীর সাহেব, খাজা বাবা, বাহাউদ্দিন নকশেবন্দী, আল ফেসানির মত পীরদের মাপতে যাই। আর মাপতে গেলেই ভুল করে ফেলি নিজে অথচ দোষটা চাপিয়ে দেই অন্যের ঘাড়ে। কারণ মানুষ সহজে নিজের দোষ নিজে নিতে চায় না। এটা মানুষের চরিত্রের একটি বড় দোষ এবং পতন ও স্থলনের গতি।

তুমি সবচেয়ে বড় কবি। দুনিয়া-জোড়া তোমার নাম ফুটবে। দেশের জ্ঞানী-গুণীরা তোমার কবিতা পড়ে ধন্য ধন্য করবে। কত সন্মান আর সন্মানের ফুলমালা। কত বুদ্ধিজীবী তোমার কবিতা পড়ে প্রবন্ধ লিখে বলে ফেলবে : তুমি কবিও, প্রফেটও। সেই বিখ্যাত কবিও বৃদ্ধ বয়সে নাটিকে কোলে নিয়ে শিশুর মতো বলে ফেলেন : আমি এই বুড়ো

পোশাকটা ফেলে দিতে চাই না-অর্থাৎ এই জীর্ণ দেহে হতে বিদায় নিতে চাই না, অর্থাৎ মরতে চাই না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যতবারই যত রকম ব্যাখ্যা দিয়ে বলুন না কেন যে, তোমার এই দেহটি জীবাত্মার সবচেয়ে নিকটতম পোশাক। পরিধানের পোশাকটি দুর্বল হয়ে গেলে যেমন তুমি নিজেই ফেলে দাও, মৃত্যুটাও সে রকম দুর্বল দেহ-পোশাকটি ফেলে দেওয়া। এত মূল্যবান উপদেশগুলো একটি বৃদ্ধের কাছে বেকার হয়ে যায়। একটি পয়সার মূল্যও থাকে না তখন। ভাবে : এত কালের এই দেহ পোশাকটি ফেলে কোথায় কোন অজানা রহস্যলোকে যেতে হবে? ভয় পায়। বড় বড় জাঁদবেল মানুষও ভয় পায় এই ভেবে যে, এতকাল যাকে বাস্তব বাস্তব বলে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে চা-পান করতে গিয়ে টেবিল চাপড়াতাম, সেই বাস্তব জীর্ণ দেহটা ফেলে কোনো অজানা রহস্যলোকের বাসিন্দা হতে ভয় লাগে। তা হলে কি আশিটা বছরের দেহধারণ করার বাস্তব জীবনটা এক ফুৎকারে নিভে গিয়ে অজানা রহস্যলোকে যেতে হবে? এতকাল মানুষের ভীড়ে, মানুষের দেওয়া কত সম্মানের কাছে রহস্যলোকের জীবনটাকে ক্রু কুঁচকে ডার্টবিনে ফেলে দিয়েছি, কত বড় টিটকারির ডেংটি কেটেছি। আর এখন? নাতিকে জড়িয়ে ধরে বলে : দাদু ভাই, তোমাদের মায়া ছেড়ে চলে যেতে চাই না অন্য আর এক রহস্যলোকে। কী বেদনাদায়ক বোবা বিলাপ! কী আজব বোবা কান্নার লম্বা নিঃশ্বাস ফেলা!

জড়বাদী চার্বাক

অনেক অনেক দিন আগের কথা। যাকে নাস্তিক্যবাদের জনক বলা হয় :
মোটো চিন্তাধারার মোটো দর্শন প্রচার করতেন, যে মোটো দর্শন মোটো
চোখে সবাই লুফে নিত; প্রকৃতি ও জীবনের সোজা ব্যাখ্যা যিনি দিয়ে
গেছেন-তার নাম চার্বাক। পশু-প্রকৃতি যে দর্শনের কথাটি শুনে নড়ে
চড়ে উঠে এবং পচা প্রবৃত্তির মালিক যারা তারা পূর্ণ সমর্থন দেয় আর
সেটা হলো, ‘যদি ধার করে ঘি খেতে হয় তবু ঘি খাও’। শিষ্য চার্বাককে
প্রশ্ন করেছিল গুরু! ঘি যে খাব, পরে ধারের টাকা যদি দিতে না পারি
তা হলে কী হবে?

গুরু চার্বাক মুচকি হাসি সেরে শিষ্যকে বললেন, ধার শোধ করতে না
পারলে দিও না। শিষ্যের প্রশ্ন, পাপ যে হবে, মহাপাপ!

চার্বাক বললেন, পাপ বলে কিছু নাই, মহাপাপ তো দূরের কথা।

শিষ্য বললো, তা হলে যে মুনি-ঋষিরা এতকাল পাপ-পুণ্য গুনিয়ে
এসেছে! চার্বাক বললেন, এগুলো মুনি-ঋষিদের বানানো কথা! আর
মুনি-ঋষি বলে কিছু নাই, এরা নিরেট ভণ্ড। শিষ্য অবাক হয়ে বললো,
ঘর-বাড়ি ছেড়ে, বিয়ে না করে, এই জঙ্গলে বসে বছরের পর বছর
ধ্যানসাধনা করছে, এরপরও এরা ভণ্ড! চার্বাক বললেন, কিসের ধ্যান!
কিসের সাধন! কিসের ভগবান! এসব ডাছা মিথ্যা কথা। জেনে রাখ,

মানুষের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারটি হলো ভগবান আবিষ্কার। কারণ ভগবান বলে কিছু নাই। তাই পাপ-পুণ্য বলেও কিছু নাই। দু' হাতে যা পাও খেয়ে যাও আর আনন্দফুটি কর। শিষ্য তো অবাক; বললো, ভগবান, পাপ পুণ্য এসব মিথ্যা! চার্বাক বললেন, হ্যাঁ এসব কেবল মিথ্যাই নয় বরং ডাহা মিথ্যা।

নাস্তিক্যবাদের জনক চার্বাকের ঘি খাওয়াটা বড়ই পছন্দের বিষয়। উনি প্রচুর ঘি খান। ঘি খেতে খেতে চার্বাকের শরীর নাদুস নুদুস হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে সেই যুগের সব মুনি-ঋষিদের চৌদ্ধ গুণি গুদু ধুয়ে দিতেন। দিনে দিনেই চার্বাকের শিষ্যসংখ্যা বেড়ে যেতে লাগলো আর শিষ্যদেরকে নাস্তিক্যবাদের যত প্রকার কুকথা এবং কুকথা বলার ও শেখার জন্য ব্যাকরণ

তৈরি করা যায় তাই তৈরি করা হলো। এখন গুরু চার্বাকের দরকার নাই, বরং শিষ্যরাই নাস্তিক্যবাদ আর মুনি-ঋষিদের ভণ্ড বলার নানান ধরনের কৌশল আবিষ্কার করলো। মুনি-ঋষিরা নীরব আর চার্বাকের শিষ্যরা সদা সর্বদা মুখরিত। প্রচার করতে লাগলো : আত্মাটাত্মা বলে কিছুই নাই। জীবাত্মা আর পরমাত্মা একথাগুলো সম্পূর্ণ বানানো কথা। কারণ ভগবান থাকলে তো আত্মার প্রশ্ন আসে। চার্বাক টক বেগুন (টম্বোটো সেদিনেও যে টক বেগুন ছিল তা জানা গেল) গাছের সঙ্গে

একটি মানব জীবনের তুলনা করে চমক দেওয়া ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ করে গেলেন। এক কথায়, টক বেগুনগাছ বড় হলে ফুল হয়, ফুল হতে টক বেগুন হয় তারপর পাকে আর আমরা সেই টক বেগুন খাই। তারপর টক বেগুন দিতে দিতে গাছটি মরে যায়। মরার বয়েস হলে শত চেষ্টা করেও আর বাঁচানো যায় না, কারণ এটাই প্রকৃতির বিধান-ইত্যাদি সব আজব আজব কথার বিশ্লেষণ। এত শিষ্য হয়ে গেল যে, চার্বাক খুশিতে বাগে বাগ। এদিকে ঘি খেতে খেতে চার্বাক গুরুজির আম্মাশয় রোগ হলো। সেদিনের কবিরাজ নামক ডাক্তারেরা চিকিৎসা দিয়ে ভালো করলো। আবার কিছুদিন পর একটু জটিল আম্মাশা। আবার চিকিৎসা। আবার ভালো। আবার আরও জটিল আম্মাশা। আবার আরও পরিশ্রমের চিকিৎসা। এভাবে আম্মাশার জটিলতা বাড়ছে আর চিকিৎসার পরিমাণটাও বাড়ছে। তারপর চার্বাকের রক্ত এবং আম্ম জাতীয় দুই আম্মাশা। পায়ুপথ দিয়ে অবিরত রক্ত ঝড়ছে আর সেই সঙ্গে ভয়ঙ্কর আম্ম যাচ্ছে। চার্বাক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছেন। আর নড়তে চড়তে পারছেন না। এখন কেবল শুয়ে থাকতে হয়। শরীর খুবই দুর্বল, শরীর রক্তশূন্য, চোখ ফ্যাকাশে, বিবর্ণ চেহারা, কথা বলতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপে। এবার কবিরাজ নামক বিখ্যাত ডাক্তারেরা অনেক প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করলেও রোগমুক্তির কিছুই হলো না, বরং দিনে দিনেই রসাতলে যাচ্ছেন। অবশেষে বিখ্যাত কবিরাজ নামক ডাক্তারেরা বললো, গুরু

চার্বাক, আমাদের চিকিৎসাবিদ্যা শেষ। এখন ভগবানকে ডাকুন অথবা মুনি-ঋষিদের ঝাড়-ফুক, পড়া পানি অথবা তাদের দেওয়া ঔষধ খেয়ে দেখতে পারেন। অনেক আধমরা রুগীকেও ভালো হতে দেখেছি। যাদেরকে চিকিৎসা নাই বলেছি তাদের অনেককেই শেষ চেষ্টা মনে করে মুনি-ঋষিদের জড়ি-বটি সেবন করে ভাল হতে দেখেছি। (আধুনিক এলোপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ধারকরা যখন না বলে দেন তখন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় ভালো হতে দেখা যায়)। চার্বাক মনেপ্রাণে ডাক্তারদের কথায় বিশ্বাস করলেন। কারণ এখন তিনিই মৃত্যুপথযাত্রী। শুকিয়ে যাওয়া টক বেগুন গাছের অবস্থা। শিষ্যদেরকে কাছে ডাকলেন। কমবেশি সবাই আসলো। চার্বাক বললেন, দেখ শিষ্যরা, এক কাজ কর, আমাকে মহিষের গাড়িতে করে বিশ্বমিত্র মুনির আশ্রমে নিয়ে চল। আমার মন বলছে, বিশ্বমিত্র মুনির জড়ি-বটি সেবন করলে এবং তার দোয়াতে ভালো হয়ে যাব।

কিন্তু তারপর? কী নির্মম চার্বাকের তকদির! কী নিষ্ঠুর নিয়তি! চার্বাকের দর্শনবাণী তার শিষ্যরা তারই মুখের উপর ছুড়ে মেরে বলে উঠলো, আমরা মুনি-ঋষি বিশ্বাস করি না, দোয়া তো অনেক পরের কথা। চার্বাক অসহায়ের মতো চেয়ে রইল আর বললো, দর্শন ঠিকই আছে, কিন্তু দর্শনের ভেতর আরও অনেক বোবা দর্শন লুকিয়ে থাকে যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া যায় না, পাঁচ ইন্দ্রিয় ধারণ করতে পারে

না। কিছু তারপরও থেকে যায়। শিষ্যরা সবাই বললো, গুরু, আমরা এগুলো বিশ্বাস করি না। কারণ এগুলো পচা কথা। পচা কথার নাম দর্শন নয়, বরং অন্ধবিশ্বাস। এভাবেই নাস্তিক্যবাদের জনক চার্বাকের জীবনপ্রদীপ নিভে গেল। কেউ মুনির আশ্রমে নেওয়া তো বহু দূরের কথা, বরং নাক সিটকে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে হাসতে লাগলো। ঢাকাইয়া বলে, ‘হাড়িডতে জুয়ানকালে গুদা বেশি থাকে তাই ফাল পাড়ে আর তরং বরং কথা কয়।’

লন্ডন টাইমস ম্যাগাজিনের একটি অবাক করা প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনটি এতটাই অবাক করেছিল যা অধম লিখক পড়ে চমকে গিয়েছি। অনেকটা নাস্তিক্যবাদের জনক চার্বাকের অন্তিম বিদায়ের সময়ে সত্য ভাষণ। মানুষ যত ভাষাই শিখুক না কেন, মরার আগে পানি চাইলে মাতৃভাষাতে চায়। কুমিল্লার হোমনা থাকা জাবজীবন জেলখাটা আসামি পণ্ডিত জল্লাদ অনেক মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামিকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। সেই পণ্ডিত জল্লাদের চিকিৎসা করতাম। আমার স্বস্তরবাড়ির দেশ (?)–টিও হোমনা। পণ্ডিত জল্লাদ বললো, ‘হজুর, জমটুপি পরানোর পর ফাঁসির আসামি যা বলে তা সত্য। মৃত্যুর মুহূর্তে আমি ফাঁসির আসামির মুখে অনেক অপ্রিয় সত্য বলাতে চমকে গেছি।’ চার্বাক মৃত্যুর মুহূর্তে যেমন মুনি-ঋষিদের স্নেহে নিলেন ঠিক অনেকটা সে রকমই ঘটনা।

কমিউনিস্ট চীনের জনক মাও সে তুং-এর মৃত্যু ঘনিষে আসছে। বিড় বিড় করে মাও সে তুং বলছেন তার জাঁদরেল শিষ্যদেরকে লক্ষ করে, আমাদের আত্মা কি লেনিন আর মার্কসের কাছে যাবে না? গুরু মাও সে তুং-এর এহেন কথায় শিষ্যরা চমকে উঠলো এবং বললো, আমরা আত্মা-টাত্মায় বিশ্বাস করি

না। মাও সে তুং বললেন, আমিও তো মানতাম না যেমন আজ তোমরা মানছো না এবং আরও বেশ কিছু অপ্রিয় কথা।

কমিউনিস্ট চীন কড়া প্রতিবাদ করে বসলো, এটা একদম বানোয়াট কথা! পত্রিকা হতে উত্তর দেওয়া হলো, এটা মোটেই বানোয়াট কথা নয়, বরং মৃত্যুর সময় যারা উপস্থিত ছিল তাদেরই একজন, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। সাংবাদিকতার এথিক্স অনুসারে আমরা কিছুতেই নাম প্রকাশ করতে পারি না। ক্লুথার জ্বালায় টাদকে ক্লুথার্ত যেমন ঝলসানো রুটি দেখে এবং বিবেকটা পোড়া কাগজের মত পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কমিউনিস্টদের অবস্থাটাও অনেকটা সে রকম। শরীরধারণ করা জীবাত্মা কিছুদিনের জীবনটাকেই বাস্তব মনে করে। আবার অনেকে তো জাঁ পল সার্তের মতো অস্তিত্ববাদের জটিল যুক্তি দেখিয়ে নোবেল প্রাইজ পর্যন্ত পেয়ে যায়। এসব পচা যুক্তির বন্ধন আর গোলক-ধাঁধা সুফিবাদের সত্যটিকে আড়াল করে ফেলে।

মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো। দুনিয়ার আসক্তি, ভোগ, প্রতিযোগিতা আর
মান-সম্মানের অহঙ্কার কী নিখুঁতভাবে একটা জীবনকে সত্য পরিচয়
পাবার পথে মূর্তিমান ধোঁকা দেয়। সাবাস খান্নাসরূপী শয়তান!
শয়তানের ধোঁকা দেওয়ার কত রকমের যে যুক্তির ফাঁদ পাতা থাকে।
আর সেই অদৃশ্য ফাঁদে পাখির পা আটকিয়ে যাবার মতো শত বুঝালেও
বোঝে না, কী অপূর্ব শয়তানের কৌশল। প্রতিটি মানুষ জানে যে, মৃত্যু
সব কামনা-বাসনা ছিনিয়ে নেবে, তবু কামনা-বাসনায় ডুবে থেকে
সুফিবাদকে টিটকারি করে। যা মুখে আসে তাই বলতে থাকে। এরা
নকল ফকির দিয়ে আসল খাজা বাবাকে মাপে। সুফিবাদ যে একটি
নিরোট উলঙ্গ সত্য, চিৎকার করে ঘোষণা করেও লাভ নাই, কারণ
কামনা-বাসনার মায়ায় বিবেকটাকে খেয়ে ফেলেছে। যেমন আগুন কাঠ
খেয়ে ফেলে। এরা কতগুলো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে সৈনিক
ধর্মের মতো। এরা হজরত আবু হোরাযরার কথিত বুখারি শরিফের
পঁচানব্বই নম্বর হাদিসের কথাটি পাশ কেটে যায় : রহস্যের জ্ঞান প্রকাশ
করলাম না, কারণ উহা প্রকাশ করলে আমার গলা কাটা যাবে।
গবেষণা করা হোক, এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে রহস্যের জ্ঞানটির
প্রকাশ করা হোক। হজরত ইবনে আব্বাসও এই একই কথা বলে
গেছেন। তিনি বলেছেন : রহস্যের জ্ঞান বিষয়টি বলাই যাবে না; বলতে
গেলে আমাকে মহাবিপদে পড়তে হবে। হজরত হজায়ফা তো কিছুরেই

বললেন না। সাহাবারা কত অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু হজরত হজ্জায়ফা কিছুতেই মুখ খোলেন নি। রহস্যের এলেন, বাতুনি এলেন বড় বড় সাহাবাদের জানা ছিল, কিন্তু সব সাহাবার সামনে এই ভেদ-রহস্য জানানো হয় নি। তাই আজও সুফিবাদ হারিয়ে যায় নি, তা সৌদি আরবের ওহাবিদের মতবাদ যতই প্রচার হোক না কেন। সুফিবাদ মারা যায় না, যাবে না; কারণ একজন না একজন জীবন বাজি রেখে প্রচার করে যাবে বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

খাজা বাবার বইভিত্তিক আলোচনা

আমরা এসব কথা কোথায় পেয়েছি? আগে তো সুফিবাদের মূল রহস্যের কিছুই জানতাম না এবং জানবার কথাও ছিল না। কারণ পুরাতন ফারসি ভাষাটি জানা না থাকলে অঙ্ককারেই থাকতে হয়। সৌদি আরবের এক জাঁদরেল বুদ্ধিজীবী বাদশা আবদুল আজিজ এবং আবদুল ওহাব নজদিকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন যে, দুনিয়ার সমস্ত মাদ্রাসা হতে ফারসি ভাষাটি চিরতরে উঠিয়ে দিতে পারলে সুফিবাদের গোড়া কেটে দেওয়া হবে। কারণ সুফিবাদ দাঁড়িয়ে আছে একমাত্র ফারসি ভাষার ওপর। আজ কী হয়েছে? চেয়ে দেখুন, দুনিয়ার কোনো মাদ্রাসায় আর ফারসি ভাষাটি চালু নাই। আগে মাদ্রাসা হতে আল্লাহর অনেক ওলি বের হতো, আর আজ? আজ আর মাদ্রাসা হতে ওলি বের হয় না, কিন্তু

বের হয়। কী বের হয়? তালেবান আর জঙ্গি আর জেহাদের নামে মানুষ হত্যা করা। নিউটনের একটি বিখ্যাত ফর্মুলা আছে, আর সেই ফর্মুলাটি হলো : প্রতিটি কাজের ঠিক ততটুকু বিপরীত শক্তি আছে। কথায় বলে, প্রচারেই ব্যবসার প্রসার ঘটে। এখন দেখছি ওহাবিদের ব্যাপক প্রচারে ব্যাপক সাদা পড়ে গেছে। আর আসল বিষয়টা মার খেতে খেতে ভিখারিতে পরিণত হচ্ছে। ইসলামের বই খুঁজতে বাজারে গেলেই দেখতে পাবেন খালি ওহাবি আর ওহাবিদের বই দিয়ে বাজার ছেয়ে গেছে আর সুফিবাদের ধারক-বাহকদের নাকি কান্নায় পচা কাগজে পচা বাঁধাইয়ে দু'চারটা হাতে গোনা বই পাওয়া যায়। অথচ সুফিবাদের ধারক-বাহকদের উচিত ছিল, বড় বড় ওলিদের পুরাতন ফারসি ভাষায় রচিত বইগুলো অনুবাদ করে ছাপিয়ে দেওয়া। আর যারা পুরাতন ফারসি ভাষাটি জানেন তারা প্রায়ই আর বেঁচে নাই। হাতে গোনা কিছু পুরানো ফারসি জানা জ্ঞানী মানুষ এখনো আছে। কিন্তু কোনো পবিত্র এবং ত্যাগী উদ্যোগ নাই। আপন আপন দরবারের শান-শওকত দেখানোর প্রতিযোগিতা চলছে। সুফিবাদের কিছুই জানেন না এক চরের পীর, অথচ আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনে সৈনিক-ধর্মের লেবাসে সম্মানে ঘুরিদ করে চলেছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মপালনের লেবাসের বাহ্যিক যে মোনাকেকদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার বা অস্ত্র এটা কয়জনার মাথায় ঢুকতে পারে। কথায় বলে, আজ ঘাট হয়েছে আঘাট আর আঘাট হয়েছে ঘাট। আর

সরল সহজ মানুষগুলো এদের ফাঁদে পা দিয়ে চলছে। অধম লিখককে কি দেখিয়ে দিতে পারবেন যে, মাত্র একটি বই পুরাতন ফারসি ভাষা হতে অনুবাদ করে বাজারে ছেড়েছে? না, ছাড়ার প্রশ্নই উঠে না। এর পরিণতি যে দিনে দিনে ভয়ঙ্কর রূপধারণ করছে তা আমরা কমবেশি বুঝতে পারছি। অথচ এই আনুষ্ঠানিক ধর্ম পালনের মূল্য কতটুকু তার সামান্য কিছু নমুনা খাজা বাবার রচিত আসরারে হাকিকি নামক বইটিতে পাই। এত সোজা কথায় এবং এত উলঙ্গ ভাষায় খাজা বাবা লিখতে ও বলতে পারেন তা অবাক হবারই কথা। অনেক ওহাবি তো বলেই ফেলে, খাজা বাবা আবার কে? বলেছিলাম, আপনাদের বাবার বাবা। কারণ কোরানে বর্ণিত যে কয়জন নবীর নাম পাই তাঁরা সবাই মিলেও খাজা বাবা যতজন মুসলমান বানিয়েছেন তার বারো ভাগের এক ভাগ বানিয়েছেন কি-না সন্দেহ। আর খাজা বাবা তাঁর মুরিদদেরকে আত্মরহস্যের জীবাত্মা আর পরমাত্মার বিষয়গুলো ধ্যানসাধনার মোরাকাবায় শিখিয়ে গেছেন। আর আজ? খাজা বাবার নামটাই আল্লাহর দোহাই দিয়ে চিরতরে মুছে ফেলার পাকাপোক্ত ব্যবস্থাটি করে যাচ্ছে। বিক্রি হয়ে যাওয়া মোল্লাদের মুখে ভুলেও কোনো ওলির নাম টেলিভিশনে নেওয়া হয় না, অথচ লেবাসে-আচারে-অনুষ্ঠানে এদের চেহারা মোবারক। আর দুই পাতা আরবি জানা মোল্লাদের কথা! ‘পীর পূজা গোর (মাজার) পূজা ইসলামে নাই।’ শুনতে কেমন লাগে? কেমন লেগেছিল মাওলা আলী আর

সাহাবাদের সামনে যখন খারেজিরা বলতো, ‘আল্লাহর আইন ছাড়া আর কারো আইন মানি না’। সেদিন সেই সময়ে তো মাওলা আলী আর সাহাবারা এত সুন্দর কথা শুনে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলার বা প্রতিবাদ করার কথা নয়। কারণ খারেজিরা তো সুন্দর কথাটি বলছে যে, ‘আল্লাহর আইন ছাড়া আর কারো আইন মানি না’। কিন্তু মাওলা আলী ও সাহাবারা খারেজিদের এই কথা শোনার পর কেন নাহওয়ানের যুদ্ধে কচুকাটা করেছিলেন? এটা তো ইতিহাসের কথা। এটা তো সবারই জানা থাকার কথা। তারপর কেন যুদ্ধ? তারপর কেন খারেজিদের কচুকাটা করা হয়েছিল? খারেজিরা খুব ভালো করেই জানতো যে, মাওলা আলী কাগজ আর চামড়ায় লিখিত কোরান নন, বরং জীবন্ত কোরান। মাওলা আলীর বিরুদ্ধে অস্বধারণ করা মহানবীর বিরুদ্ধে অস্বধারণ করা আর মহানবীর বিরুদ্ধে অস্বধারণ করাটাই আল্লাহর বিরুদ্ধে অস্বধারণ করা। খারেজিদের বিরুদ্ধে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অনেক সাহাবা শহিদ হয়েছেন সত্য, কিন্তু খারেজিদের মুখোশ জনতার সামনে খুলে গেছে। তাই দুঃখ করে বলতে হয়, এই তথাকথিত জনসম্মুখীন জেহাদের নামে জঙ্গিদের পতন অবশ্যই হবে, কিন্তু এর আগে কিছু সাধারণ মানুষ মারা পড়বে। তাই আসুন, বাংলার বুকে সামান্য ত্যাগের আদর্শে মর্শিয়ান হয়ে এদের বিরুদ্ধে যারা কলম ধরছে তাদেরকে সাহায্য করি। যারা বই লিখে, এটা সেটা বলে যুক্তির ধূয়া তুলে বইটি অন্যকে

ছাপাবার অনুমতি দেওয়া তো দূরের কথা বরং সাবধান করে দেওয়া হয় এই বলে, খবরদার! অনুমতি ছাড়া বই ছাপালেই শাস্তি পেতে হবে, জেলে যেতে হবে। এই পশু মন-মানসিকতার লোকগুলো সুফিদের কেমন খেদমত করবে তা তাদের চালচলনেই ধরা পড়ে। সামান্য ত্যাগের মন্ত্র তো দূরের কথা, ভোগের পুকুরে এরা ডুবে থাকে। কিন্তু এই ডুবে থাকার দিন ফুরিয়ে আসছে।

আসরীয়ে হাকিকি নামক বইটিতে খাজা বাবা চোখ দুটো খুলে দিয়েছেন। কিন্তু সেই মহামূল্যমান বইগুলো পাব কোথায়? জেহাদিল ইসলামকে ধন্যবাদ এ জন্য যে, খাজা বাবার কথাগুলো শুরিয়তের লেবাসে গা বাচিয়ে অতি সাবধানে লিখতে বাধ্য হয়েছেন। উনি মাহ্ তিকই ধরতে পেরেছেন এবং জুলের স্পর্শও লেগেছে, কিন্তু জলে ডুব দেবার সাহসটি রাখতে পারেন নি।

মক্কার মিনার তিনটি শয়তান হলো মেক্কাজি শয়তান, কিন্তু আসল শয়তান নয়। কারণ আসল শয়তান মক্কার মিনাতে থাকে না, বরং আল্লাহর দেওয়া নির্ধারিত দুইটি স্থানে থাকে। একটি জিনের অন্তর আর অপরটি মানুষের অন্তর। এই দুই অন্তর বিহনে আল্লাহ শয়তানকে থাকবার আর কোনো অনুমতি দেন নাই। তা হলে মক্কার মিনাতে কেমন করে তিনটি শয়তান অবস্থান করে? কেমন করে হাজিরা ককর ছুড়ে মারে? তিনটি শয়তান মেক্কাজি, কিন্তু আসল শয়তান নয়। আর যাহা আসল নয় তাহাকেই মেক্কাজি বলা হয়। মেক্কাজির বাংলায় অনেকে রূপক শব্দটি ব্যবহার করেন। ককর ছুড়ে মারাটি মেক্কাজি, আসল ককর

হৃদয়ের ভেতরের শয়তানটিকে মারতে হয় এবং ইহাই হাকিকি। মক্কার কাবাটি মেজাজি কাবা আর আসল কাবাটি হল মোমিনের (আমানুর নয়) দিল। সুতরাং মেজাজি

কাবার হজ্জটিও মেজাজি এবং যারা হজ্জ করতে এসেছেন তারাও মেজাজি হাজি। এই মেজাজি বিষয়টি নিয়ে কত বড় বড় হৈ চৈ আর কত বড় বড় আয়োজন। মেজাজির জৌলুশে হাকিকি হারিয়ে যাচ্ছে। কারণ মেজাজি চোখে দেখা যায় আর হাকিকি চোখে দেখা যায় না। যাহা চোখে দেখা যায় না অথচ আছে তাহা সবাই মানতে পারে না, বরং তারাই মানে যাদের ভেতর ইঁশ আছে আর আছে বিচার-বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম জ্ঞান। হাকিকি বিষয়গুলো ধরতে হলেই সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞান শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠি দিয়ে হয় না। এই জ্ঞান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান, বিশেষ রহমতের মাধ্যমে পাওয়া। এই জ্ঞান সিনার জ্ঞান। সুফিদের দর্শনে জ্ঞান অর্জন করা যায় দুইটি মাধ্যমে। তাই জ্ঞান দুই প্রকার এবং অর্জন করার মাধ্যম দুইটিও সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি মাথার জ্ঞান আর অপরটি সিনার জ্ঞান। মাথার জ্ঞান খোলা চোখে বই পড়ে অর্জন করতে হয়। কিন্তু সিনার জ্ঞান চোখ বন্ধ করে ধ্যানসাধনায় অর্জন করতে হয়। মাথার জ্ঞান ধরা যায়, কিন্তু সিনার জ্ঞান ধরা যায় না। সিনার জ্ঞান ধরা যায় না বলেই লুকোচুরিটা বেশি হয়। মানুষ সিনার জ্ঞানের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে বিভ্রান্ত হয়। চোখ বন্ধ করে ধ্যানসাধনার মোরাকাবায় যে জ্ঞান

অর্জন করা যায় উহার কোনো প্রমাণ করার দলিল থাকে না। সুতরাং ইহা সিনার জ্ঞান কি-না ধরাটি কষ্টকর এবং তকদির দ্বারা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। তকদিরে না থাকলে সিনার জ্ঞানটিকেও নকল মনে হয়। সিনার জ্ঞান আসল না নকল এটা তকদির দ্বিধা ধরা যাবে। মাতার জ্ঞান দ্বিধা ধরা যায় না এবং ধরার কোনো নিয়ম আজও আবিষ্কার হয় নাই। তকদিরে না থাকলে ভালো ভালো মাতার জ্ঞানীরা সুফিবাদের খোলসটা ধরে আনন্দ পায় এবং মনে করে যে, অনেক কিছু পেয়ে গেছি। আসলে সুফিবাদের মূল বিষয়টির ধারে কাছেও যেতে পারে নি, কিন্তু মনে করে অনেক দূর এগিয়ে গেছি। এরাই আসল সুফিবাদটাকে নাস্তি নাবুদ করে ফেলে। অথচ মনে করে যে, সুফিবাদের জন্য অনেক কিছু করলাম। এরা ধ্যানসাধনার মোরাকাবার লাইনটা কেমন হবে, কেমন করে অগ্রসর হবো, কেমন করে পথ দ্বিধা চলতে হবে জানে না। নিজেরাই জানে না, অথচ ভক্ত অনেক এবং ভক্তদেরকে পথ দেখাতে না পেরে উল্টাপাল্টা সবক দান করে। এদের পাল্লায় পড়াটাও তকদির আবার এদের পাল্লায় না পড়াটাও তকদির। তকদিরের কষ্টপাথরে যা লিখা হয়ে আছে তা হবেই। সুতরাং মেজাজি কাবার মেজাজি হজ করাটাও মেজাজি হাজি হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই মেজাজি কাবাকে আসল কাবা মনে করা, মেজাজি হজ করাটিকে আসল হজ মনে করা, মেজাজি হাজিকে আসল হাজি মনে করাটা

কোনো দোষের বিষয় নয়। কেন? ইহা তকদিরের লিখন। ইহার বাহিরে পা ফেলাটা অসম্ভব। ইসলামের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে ম্লেজাজি আর হাকিকি রাখা আছে। যেটা জন্মের আগে তকদির দিয়ে নির্ধারণ করা আছে উহাই পালন করতে হবে এবং করতে বাধ্য থাকবে এবং শত সহস্রবার বুঝালেও কোনো লাভ হবে না এবং অনেক ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত হতে বাধ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং এর বহু নমুনা তুলে ধরা যায়।

যেমন ধরুন নামাজের কথাটি। ওয়াস্তিয়া নামাজ ম্লেজাজি নামাজ, আর দায়েমি নামাজ হাকিকি নামাজ। দায়েমি নামাজের কথাটি কোরানের সূরা মারেজে পাই এবং হাদিসেও পাই, কিন্তু ওয়াস্তিয়া নামাজের উল্লেখ পুরা কোরানের একটি স্থানেও নাই। হাদিসে আছে যে, ওয়াস্তিয়া নামাজ হতে দায়েমি নামাজের মর্যাদা অনেক অনেক উঁচুতে অবস্থান করে। যেমন মহানবী বলেন, ‘সালাতুদ্ দাওয়ামী আফজালুম মিনাল সালাতিল ওয়াস্তিয়া’, অর্থাৎ ‘দায়েমি নামাজ ওয়াস্তিয়া নামাজ হতে অনেক মর্যাদাকর’। দায়েমি নামাজ দেখা যায় না, কারণ দায়েমি নামাজে চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হয়; অথচ ওয়াস্তিয়া নামাজ রুকু-সেজদা এবং কিছু নিয়মে সীমাবদ্ধ। অথচ দায়েমি নামাজে কোনো রুকুও নাই কোনো সেজদাও নাই এবং কোনো নিয়মের মাঝে সীমাবদ্ধ নহে। এই নামাজকে হাকিকি নামাজও বলে এবং ওয়াস্তিয়া নামাজকে ম্লেজাজি

নামাজও বলে। যে নামেই বলা হোক না কেন, আসলে হাদিস অনুসারে আমরা পাই দায়েমি নামাজ তথা সর্বকালের নামাজ এবং ওয়াক্টিয়া নামাজ তথা কয়টি নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে সীমাবদ্ধ নামাজ। এখানে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে বলা হচ্ছে দুটির গতিপ্রকৃতি। আমরা জানি ওয়াক্টিয়া নামাজে দাঁড়াতে হয়, কিন্তু দাঁড়াবার শক্তি না থাকলে বসে বসে পড়ার উপদেশটি পাই। আবার বসে বসে পড়ারও যদি উপযুক্ততা হারায় তো শুষে শুষে নামাজ পড়ার উপদেশটি পাই। এতে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, উঠ-বসটা নামাজ নয়, বরং আল্লাহর সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টাটিকে প্রতিষ্ঠিত করার নামই হলো নামাজ। যদিও এই কথাটি না বললেও চলে তবু বলছি যে, নামাজের এই বিষয়টিতে চার ইমামই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। মস্কার মিনার তিনটি মেনাজ্জি শয়তানকে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়, কারণ মূর্ত না থাকলে বিমূর্তের গুরুত্ব কমে যায়। ওয়াক্টিয়া নামাজ মেনাজ্জি নামাজ হলেও এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়, কারণ মূর্ত না থাকলে বিমূর্ত দায়েমি নামাজটির গুরুত্ব কমে যায়।

আমরা যেন কোনো বিষয়ে একদম একপেশে না হয়ে যাই। ওয়াক্টিয়া নামাজটাই নামাজ এবং আর কোনো নামাজ নাই বলার মাঝে একপুঁয়ে ভাবটি প্রকাশ পায় এবং মনের অজান্তে কোরান এবং হাদিসের বর্ণিত দায়েমি নামাজটিকে অস্বীকার করার সামিল। ইহাতে সমাজ জীবনের

ভারসাম্যটি দুর্বল হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। অবশ্য স্বীকার এবং অস্বীকার করার পেছনেও জন্মের আগেই তকদিরের নির্ধারণ করার বিষয়টি এসে যায়। নিজের মতামত অপরের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়াটা ইসলাম মানে না। কারণ এতে গবেষণার অধিকারটি আর থাকে না, আর গবেষণার বিষয়টি না থাকলে স্থবিরতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তখন সূরা লোকমানের সাতাশ নম্বর আয়াতে গবেষণার আবেদনটি দুর্বল হয়ে যায়। শত বছর পূর্বে কোরান-হাদিস দিয়ে প্রমাণ করে দেওয়া হতো যে, পৃথিবী স্থির এবং এই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সমগ্র সৃষ্টিজগত ঘুরছে। আর এখন? গবেষণা করে দেখানো হয়েছে যে, এই বিষয়টা একটা ডাঁহা মিথ্যা। সুতরাং গবেষণার মাধ্যমে অনেক কিছু জানা যায় এবং জানার নামটাই হলো জ্ঞান অর্জন করা। তো সেই জ্ঞানটি মাথার জ্ঞান হোক অথবা সিনার জ্ঞানই হোক। অবশ্য জ্ঞান অর্জনের বিষয়টিও কোরানে পরিষ্কার বলে দিয়েছে সূরা বাকারার একশত চৌষটি নম্বর আয়াতে। না জানার পেটে জন্ম নেয় একগুঁয়েমি। এই একগুঁয়েমি করে খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা অনেক গবেষণায় লিপ্ত জ্ঞানী গুণীদের শাস্তি দিয়েছে।

এখন আমরা বিশ্ববিখ্যাত ওলিদের মহারাজা খাজা গরিব নেওয়াজ নামাজ বিষয়টিতে কী বলে গেছেন আসরারে হাকিকি নামক পুরনো

ফারসি ভাষার কেতাবে তারই কিছুটা তুলে ধরছি : ‘মহানবী বলেন যে, হজুরি কাল্ব ছাড়া নামাজ হয় না। হাকিকি নামাজ দিয়ে মোমিন এবং আল্লাহর আরিফ হয় এবং চিরস্থায়ী হজুরি লাভ করা যায়। নামাজ দুই প্রকার : একটি জাহেরি আলেম, ফেকাবিদ এবং জাহেদগণের নামাজ এবং এদের নামাজ নীরস তথা খোঙ্ক। কারণ এদের নামাজ যা শুধু রুকু, সেজদা, কেরাম, কেরাত ইত্যাদি শরীরের খাটুনিতে তথা কসরতের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই রকম নামাজ দিয়ে খোদার দিদার পাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। এই জন্যই এই নামাজ অতি সাধারণ নামাজ এবং আলম-ই-নাসুতে নফসানি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। এই নামাজ এমন কি আলম-ই-নাসুত হতে আলম-ই-মালাকুতে পৌঁছিয়ে দেবার ক্ষমতাটুকু রাখে না। আলম-ই-জাবরুত এবং আলম-ই-লাহুত তো অনেক দূরের কথা।

‘অপর নামাজটি হলো আশ্বিয়া এবং আউলিয়াদের নামাজ, যাহা হজুরি কাল্ব সহকারে আদায় করা হয়। এই নামাজের মাধ্যমে খোদাকে পাওয়া যায় এবং আলম-ই-জাবরুতে রহমানি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হে উম্মর, হাকিকি নামাজই আসল নামাজ যাকে নামাজে রহমানি বলা হয়। যে সকল জাহেরি আলেম ও লোক দেখানো (রিয়াকার) সুফি জুব্বা-দস্তার জাহেরি শান-শওকতে সজ্জিত হয়ে লোক দেখানোর জন্য মসজিদে লম্বা নামাজে মশগুল হয়ে থাকে তারা হামবড়া ভাব এবং অহঙ্কারের

কাদায় ডুবে থাকে। এরা নফসে আশ্বাস হতে নফসে লাউয়ান্নাতে পৌঁছানোর কথাটি একবার চিন্তায়ও আনতে চায় না। এরই কারণে এই জাতীয় লোকদের না নামাজ হয় আর না নামাজের আসল বিষয়টি জানতে পারে, তথা ডেসলে এলাহি (খোদার সাথে মিলন) হাসিল হয় না। কারণ, এরা হলো প্রবৃত্তির (নফসের) তাঁবেদার তথা গোলাম। আর যারা নফসের তাঁবেদার তারা হলো মানুষের সুরতে শয়তান। এই জাতীয় লোকদের একান্ত কর্তব্যটি হলো কোনো কাম্মেল পীরের সহবতে থেকে নফসের যত রকম কলুষ আছে উহা হতে মুক্ত হয়ে মারেফতের নূরে নিজেকে জাগিয়ে তোলা। এখানে আসতে পারলেই এদের নামাজ হাকিকি নামাজে পরিণত হয়ে যাবে। ভাগ্য ভালো হলে লাখের মধ্যে দুই একজন হাকিকি নামাজি পাওয়া গেলে এদের খেদমত ও সোহবত (সেবা ও সংসর্গ) অবলম্বন করা হাজার বছরের ইবাদত-বন্দেগি হতে অনেক বেশি শ্রেয়।

‘মহানবী বলেন, ‘জিকরুল খফি দায়িম’, তথা ‘জিকিরে খফি স্থায়ী (দায়িম)’। হজুরি কালব ছাড়া নামাজ আদায়কারীগণ প্রকৃতপক্ষে বুত পরস্ত। কিন্তু এরা নিজেদের আমলের জন্য গর্ব করলেও বুঝতে পারে না যে, তারা বুতপরস্তি করছে। অবাক হবার বিষয়টি হলো—এদের জাহেরি নামাজ দেখে সাধারণ মানুষ এসব রিয়াকারগণকে প্রকৃত নামাজি বলে

সম্মান করে, অথচ হাকিকি ছাড়া নামাজ একেবারে মূল্যহীন-শারীরিক কসরত মাত্র।’ (দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন-পৃ: ৪২৫)।

আমরা অনেকবার বলেছি যে, নামাজের যত বড় মর্যাদাই হোক না কেন, নামাজ বেহেস্তের চাবি হোক না কেন, অথবা আরও বড় কিছু হোক না কেন, নামাজ মোমিনের জন্য মেরাজ হোক না কেন, কিন্তু পুরা কোরানের একটি সুরার একটি লাইনেও আল্লাহ বলেন নি যে, আল্লাহ নামাজির সঙ্গে থাকেন। কেন বললেন না? কী কারণ এর পেছনে থাকতে পারে? কারণটি হলো, নামাজের বাহির এবং ভেতর আছে। যে যে বিষয়গুলোতে বাহির এবং ভেতর আছে উহার একটির সঙ্গেও আল্লাহ থাকেন না। কারণ বাহির ও ভেতর যে সব বিষয়ে থাকে সেই সব বিষয়ে খাঁটি ও ভেজাল থাকে।

ভেজাল নামাজিদের ওয়াইল নামক জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে, এটা তো কোরানেরই ঘোষণা। অন্যত্র আছে, লোক দেখানো নামাজিদের জন্য এই এই শাস্তি রেখে দেওয়া হয়েছে। অথচ সবরের তথা ধৈর্যের মধ্যে কোনো বাহিরও নাই, ভেতরও নাই। একদম লেপাপোছা (পরিষ্কার)। তাই সবরকারীদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন বা থাকেন এটা কোরানেরই ঘোষণা। আমানু তথা ইমানদারদের মাঝে ভেজাল থাকতে পারে। যেমন-দুর্বল ইমান, শক্ত ইমান, খাঁটি ইমান ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে। কিন্তু যিনি আমানু ডিঙ্গিয়ে মোমিন হয়েছেন সেই মোমিনের আর

বাহির-ভেতর থাকে না। অল্প শিক্ষিত আরবি-জানা পণ্ডিতরা অবশ্য না জেনে, না বুঝে, না গবেষণা করে মোম্বিনের আগেও প্রকৃত শব্দটি লাগিয়ে দেয়। কারণ এরা আমানু আর মোম্বিনের সামান্য পার্থক্যটি করতে জানে না, অথচ কোরানের তফসির লেখে, বড় বড় জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়ে এবং হিয়াহিয়া বলে বেড়ায়। মানুষ এই জাতীয় হাতুড়ে আরবি-জানা পণ্ডিতদের খপ্পরে পড়ে ইমানে দুর্বলতা এনে নেয়। কারণ এই হাতুড়ে পণ্ডিতেরা ইমানদার আর মোম্বিনকে এক করে ফেলে। যেহেতু মোম্বিনের বাহির ও ভেতর এক হয়ে যায় তাই আল্লাহ কোরানে ঘোষণা করেছেন যে, তিনি মোম্বিনদের সঙ্গে আছেন ও থাকেন। কিছু আমানুদের সঙ্গে আছেন অথবা থাকেন এ রকম একটি আয়াতও পুরা কোরানে নাই। মেক্কা জি কাবা এবং হাকিকি কাবা থাকার দরুণ হজ্জ দুই রকম হয়ে যায়। একটি মেক্কা জি এবং অপরটি হাকিকি হজ্জ। সুতরাং হজ্জের মধ্যে বাহির আছে এবং ভেতরও আছে। বাহির এবং ভেতর থাকার দরুণ কোরানের একটি আয়াতেও বলা হয় নি যে, আল্লাহ হাজ্জিদের সঙ্গে আছেন অথবা থাকেন (ইন্না ল্লাহা মাআল্ হজ্জাজ্)। সত্যিই অবাক হই যখন দেখতে পাই অনুষ্ঠানের কত বেশি দাম দেওয়া হয়। অথচ অণু-পরমাণুর মতো ক্ষুদ্র সত্য থাকে বলেই অনুষ্ঠানের সঙ্গে অণু শব্দটি লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেক্কা জি হজ্জ পালন করার জন্য কী হৈ হৈ রৈ রৈ রব পড়ে যায় মেক্কা জি হাজ্জি হবার তরে। অথচ মেক্কা জি

হাজিরা জ্ঞানলো না, বুঝলো না এবং সামান্য বিবেক খাঁটিয়ে গবেষণা করেও দেখলো না যে, আসল হজ্জ তথা হাকিকি হজ্জটি বহু দূরে দাঁড়িয়ে ম্লেজাজি হাজিদের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। ম্লেজাজি হাজিদেরকে যদি চোখে আঙ্গুল দিয়েও বুঝিয়ে দেন যে, এটা ম্লেজাজি হজ্জ পালন করছেন তা হলে সাপের ফণা তুলে ছোবল মারতে চাইবে, বুঝে নেওয়া তো দূরের কথা। ‘আম্মি কী হনু রে’ ভাবটি প্রায় বিষয়তেই থাকে এবং এটাই নিজের ভেতর লুকিয়ে থাকা খান্নাসের খেলা। এই খান্নাসরূপের খেসালত হতে মুক্ত হতে চাইলে বছরের পর বছর মোরাকাবার ধ্যানসাধনা ছাড়া অসম্ভব। তাও সহজে যেতে চায় না। ইম্মানুল আউলিয়া বায়েজিদ বোস্তামি বলেছেন যে, সবচেয়ে কঠিন ও শক্ত কাজটি হলো আপন খান্নাসরূপী খেসালত হতে মুক্তি লাভ করা। কারণ এই মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে লা মোকাম্মে অবস্থান করা। শেরেকের চির অবসান। অন্যভাবে শেরেকের মাঝে কমবেশি ভুবে থাকা। তৌহিদে তখনই বাস করে যখন বিন্দুপরিমাণ শেরেক আর থাকে না।

ম্লেজাজি কাবা ও আবরাতা

এখন আমরা ম্লেজাজি কাবার কিছুটা ম্লেজাজি বয়ান দিতে চাই। হজ্জরত আদম প্রথম ম্লেজাজি কাবাটি স্থাপন করেন। তারপর বহুকাল পরে মুসলমানদের পিতা হজ্জরত ইব্রাহিম ম্লেজাজি কাবাটি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

মোমিনের দিল হাকিকি কাবা হলেও মক্কায় অবস্থিত মেক্কাজি কাবার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ বাহির না থাকলে ডেতর চেনবার উপায়টি কষ্টকর এবং বিষয়টি ধীরে ধীরে কল্পনাপ্রসূত হতে থাকে। এ জন্যই বাহির তথা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন। এই বাহিরের অনুষ্ঠানটিকে যারা আমলেই আনতে চায় না তারা বোকা। মক্কায় কাবা ঘরটি আছে বলেই মোমিনের দিল-কাবা বললে বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারি। না হলে বিষয়টির আগাম্মাখা কিছুই বুঝবার উপায় থাকতো না। এই জন্যই প্রতিটি বিষয়ের মেক্কাজি ব্যাপারটি দেওয়া হয়েছে। এই মেক্কাজি কাবার উপর অনেক ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে। তবে যে আঘাতটি সবচেয়ে মারাত্মক ছিল উহা ইয়ামেনের শাসনকর্তা কাফের আবরাহার আঘাত। তবে আঘাত দেবার আগেই আল্লাহর ঘর কাবা শরিফ আল্লাহই রক্ষা করেছেন আবাবিল পাখির সাহায্যে। আবাবিল পাখিরা ছিল উসিলা, আসলে আল্লাহই ধ্বংস করেছেন। কারণ উসিলা ছাড়া আল্লাহ কোনো কাজ করেন না। আবাবিল পাখি এবং আবরাহার বিষয়টিতে একমত হলেও ঘটনার বিষয়টি কিছুটা এদিক-সেদিক হবেই। এতে কোনো বিরূপ মন্তব্য এবং সমালোচনা করাটা মোটেই সমীচীন নয়। যেমন ধরুন উসমান ইবনে মুগিরার এবং হাফিজ আবু নুয়ামের মতে আবরাহা নিজে কাবা শরিফ আক্রমণ করতে আসেন নাই বরং শামস ইবনে মাকসুদ নামক এক সেনাপতির নেতৃত্বে বিশ হাজার সৈন্য এবং বারোটি হাতিসহ

আক্রমণ করতে এসেছিল। কিন্তু অধিকাংশ ইতিহাসবিদের মতে শাসনকর্তা আবরাহা কাহাকেও নেতৃত্ব দিয়ে পাঠায় নি বরং নিজেই এসেছিল। অনেক ইতিহাসবিদের মতে আবাবিল পাখিদের পাথরকণার আঘাতে সবাই চাবানো ঘাশে পরিণত হয়েছিল এবং অধম লিখকও তাই মনে করি। কিন্তু মা

আয়েশা বলেছেন যে, না সবারই একই পরিণতি একসঙ্গে হয় নাই যাহা ইবনে ইসহাক হতে জানা যায়। যেমন মা আয়েশা বলেছেন যে, তিনি হাতি-চালকদের তথা মাহতদের অঙ্ক ও পশু অবস্থায় মক্কার অলি-গলিতে ভিক্ষা করতে দেখেছেন। ইতিহাসবিদ ওয়াকিদিও মা আয়েশা হতে পাওয়া কথাগুলো তুলে ধরেছেন এবং আসমা বিনতে আবু বকর হতে পাওয়া কথাগুলো তুলতে গিয়ে আরও পরিষ্কার করে বলেছেন যে, একটি অঙ্ক ভিক্ষুক দুইটি মূর্তির দেবতা একটির নাম আসাফ এবং অপর মূর্তি দেবতা নায়েলার কাছে বসে থাকতো এবং ভিক্ষা করতো। এমন কি সেই ভিক্ষুকটি হাতির মাহত ছিল এবং তার নামটি ছিল আনফসা। এতে বোঝা যায় যে, সবাই চাবানো ঘাশে পরিণত হয় নাই বরং কিছু কিছু বেঁচে ছিল এবং জঘন্য জীবনযাপন করতো।

আবার আবাবিল পাখিগুলোর আয়তন নিয়ে এবং দেহের গঠনপ্রকৃতি নিয়ে মতভেদ আছে এবং এই মতভেদ গবেষণার দরজাকে বন্ধ করে নি বরং খোলাই রেখেছে। যেমন ইবনে জারির, উবায়দ ইবনে উমর

বলেছেন যে, পাখিগুলোর রং ছিল কালো এবং সামুদ্রিক এবং প্রতিটি পাখির ঠোঁটে ও নখে একটি করে কঙ্কর ছিল। পাখিগুলো ভয়ঙ্কর শব্দ করে কঙ্করগুলো নিক্ষেপ করে এবং সেই কঙ্কর মাথায় পড়লে পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যেত এবং শরীরের এক স্থানে পড়লে অন্যস্থান দিয়ে বেরিয়ে যেত। আবার প্রবল বেগে বাতাস বইতে শুরু করেছিল, যাহার ফলে আশেপাশের পাথর কণাগুলো গায়ে লেগেছিল।

সাইদ ইবনে জুবায়ের বলেছেন যে, আবরাতা মারা যায় নি, বরং আহত হয়েছিলেন। এই আহত অবস্থায় ইয়েমেনের রাজধানী সানায় ফিরে গিয়েছিল এবং এই ধ্বংসযজ্ঞের কাহিনী বলতে বলতে কলিজা ফেটে মারা যায়।

আবার ইবনে জারির এবং ইকরিমা আবাবিল পাখিদের বিষয়ে অন্যরকম কথা বলেছেন। তারা বলেছেন যে, পাখিগুলোর রং ছিল সবুজ এবং সাগর হতে উঠে এসেছিল আর পাখিগুলোর মাথা ছিল হিংস্র জন্তুর মাথার মতো।

ওয়াকিদী বলেন যে, পাখিগুলোর রং ছিল হলুদ এবং কবুতরের চেয়ে কিছুটা ছোট। আবার অন্য বর্ণনায় আবাবিল পাখিদের গায়ের রং লাল ছিল।

একটি বিষয়ের বর্ণনাতে সবার এক মত দেখতে পাই। আর সেটা হলো মাহমুদ নামক হাতিটির অবাক-করা আচরণ। কেউ বলেছেন আটটি

হাতি, কেউ বলেছেন বারোটি হাতি, আবার কেউ বলেছেন সাতাশটি হাতি। কিছু মাহমুদ হাতির অবাক-করা আচরণে একমত পোষণ করেছেন সবাই।

আবার কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আবরারাহার সৈন্যরা এত স্বর্ণ নিয়ে এসেছিল যে সবাই অবাক হয়েছেন। মুকাতিল ইবনে সুলায়মান বলেন যে, আবরারাহার ফেলে যাওয়া বিপুল পরিমাণ সম্পদ কুরাইশদের হাতে আসে। এমনকি মহানবীর দাদা আবদুল মোতালিব একটি কুপ সোনা দিয়ে ভরে ফেলেন।

এই বিস্ময়কর ঘটনাটি ঘটবার মূল কারণটি ছিল অর্থনীতি। কারণ মক্কার অধিকাংশ অধিবাসীরা মূর্তিপূজা করতো এবং গোত্রে গোত্রে মারামারি, ঝগড়াঝাঁটি সব সময় লেগেই থাকতো। জুয়া, মদ এবং অবাধ যৌনাচার ছিল তাদের সমাজ জীবনের নিত্য সঙ্গী। এমন কি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো। অবশ্য কিছু ভালো লোক তখনও ছিল। কিছু লোক হজরত ইসার ধর্ম অনুসরণ করতো। আবার কিছু লোক হজরত মুসার ধর্ম অনুসরণ করতো। এই ঘটনাটি ঘটে মহানবীর জন্মের পঞ্চাশ দিন আগে। আবার কেহ কেহ মহানবীর জন্মদিনে ঘটেছিল বলে মনে করেন। সুতরাং মহানবীর অনুসারী মুসলমানদের পাবার প্রশ্নই উঠে না। যদিও হজরত ইসার

অনুসারীরা ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করেছিল। কারণ হজরত ইসা নবী। কোনো নবীরই ইসলাম ভিন্ন অন্য ধর্ম প্রচার করার প্রশ্নই আসে না। কারণ সব নবীই এক ইসলাম প্রচার করে গেছেন। ইহা কোরানের সূরা ইব্রাহিমের প্রকাশ্য ঘোষণা। আবরাহাকে কোনো কোনো গবেষক খ্রিস্টধর্মের অনুসারী বলে থাকেন। খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের খাতায় নামটি লিখালেও মনেপ্রাণে খ্রিস্টান হবার প্রশ্নই উঠে না। তাই কাবা ঘরটিকে আল্লাহর ঘর বলে মেনে নিতে পারে নি। কোনো মুসলমানই ভাবতেই পারেন না বায়তুল মুকাদ্দাসের সামান্য ক্তি করার কথাটি। যে বা যারা মনে করে তারা মোটেই মুসলমান নয়, বরং মুসলমান নামের কলঙ্ক। মক্কার লোকেরা কাবা ঘরে তিনশত ষাটটি মূর্তি রেখেছিল-এটা সবাই জানে। তারা এক আল্লাহর ঘর কাবা শরিফকে তিনশত ষাট দেবদেবীর ঘরে পরিণত করেছিল। টাঁদের হিসাবে তিনশত ষাট দিনে এক বছর হয়। মেজাজি কাবায় মেজাজি তিনশত ষাটটি মূর্তি থাকে আর হাকিকি কাবায় প্রতিদিন বহুবাদের অদৃশ্য সূক্ষ্ম হাকিকি মূর্তিগুলো বিরাজ করছে। কী অপূর্ব বিস্ময়কর পবিত্র কোরানের গোপন রহস্য। ভাবতেও অবাক লাগে যে, মেজাজি কাবা আর হাকিকি কাবার যোগসূত্রটি দেখে। হিজরি সালের গণনা অনুসারে তিনশত ষাট দিনে এক বছর হয়। তাই প্রতিটি দিনকে লক্ষ রেখে মেজাজি কাবা ঘরে তিনশত

ষাটটি মূর্তির কথা বলা হয়েছে। একটি মূর্তি কন্নড় নয়, বেশিও নয়।
রূপকের সাথে আসলের কী মিল! ম্লেজাজি আর হাকিকি পাশাপাখি
রাখা হচ্ছে। ম্লেজাজি দিয়ে হাকিকির পরিচয়টি ধরার জন্য। কেউ ধরতে
পারে আবার কেউ ধরতে পারে না।

কে এই অভিশপ্ত আবরাহা? কী তার পরিচয়? এ রকম কিছু প্রশ্ন তো
আসতেই পারে। ইয়ামেনের শাসনকর্তা আবরাহা। সে কি বাদশা না
শাসনকর্তা? সে কি খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী, না কাফের, না বহুবাদের
পূজারি নাস্তিক? আবরাহা ইয়ামেনে আসে সেনাপতি হয়ে। ইয়ামেনের
বাদশা জুনাওয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। কেন ইয়ামেনের বাদশা
জুনাওয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এলো? তা হলে জুনাওয়াসের বিষয়ে
কিছু বলতে হয়। বাদশা জুনাওয়াস ছিল মূর্তিপূজারক, মূশরিক এবং
খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের ঘোর বিরোধী। খ্রিস্টান ধর্ম এবং
অনুসারীদের নামগন্ধ সহ্য করতে পারতো না বাদশা জুনাওয়াস।
তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতো এবং ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর রূপটি ধারণ করতো। প্রায়
বিশ হাজার খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারীদের সে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা
করেছিল। মাত্র একজন খ্রিস্টান কপালপুণে বেঁচে গিয়েছিল। যিনি প্রাণে
বেঁচে গিয়েছিলেন তার নামটি ছিল দাউস জুলাবান। তিনি রোমের
বাদশার নিকট আশ্রয় চান। কারণ রোমের বাদশাও তখন খ্রিস্টান ধর্মের

অনুসারী ছিলেন। দাউস জুলাবান এই নির্মম অত্যাচার এবং বিশ হাজার নিরাপরাধ খ্রিস্টানদের পুড়িয়ে মারার ঘটনাটি জানিয়ে দেন এবং ইয়েমেনের মূর্তিপূজারক বাদশা জুনাওয়াস যে খ্রিস্টানদের সহ্যই করতে পারে না সেই কথাগুলো জানিয়ে দেন। এর ফলে রোমের বাদশা হাবাশার বাদশা নাজ্জাশির কাছে চিঠি লিখে ইয়েমেনের বাদশা জুনাওয়াসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। হাবাশার বাদশা নাজ্জাশি সেই প্রাণে-বেঁচে-যাওয়া খ্রিস্টান দাউস জুলাবানের সঙ্গে দুই সেনাপতি ও অনেক সৈন্য দিয়ে জুনাওয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিলেন। সেই দুই পাঠিয়ে দেওয়া সেনাপতির একজনের নামটি হল আবরাহা এবং অপরজনের নামটি হল আজ্জাত। আবরাহার বাবার নাম সাবাহ। সাবাহ খ্রিস্টধর্ম পালন করতো। সেই হিসাবে আবরাহাকে খ্রিস্টান বলা হয়। আবার অনেকে আবরাহাকে খ্রিস্টান বলতে ঘৃণা করেন। কারণ খ্রিস্টান ধর্মের কোনো আদর্শই তার মাঝে ছিল না, বরং ক্রমতার দারুণ লোভ ছিল। ক্রমতার লোভ আবরাহার ধর্ম ও বিবেককে খেয়ে ফেলেছিল। অবশেষে ইয়েমেনের বাদশা জুনাওয়াসের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। যুদ্ধে জুনাওয়াস সম্পূর্ণরূপে পরাজয় বরণ করলো এবং জীবন বাঁচাতে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলো। কিন্তু সাঁতার জানা থাকা সত্ত্বেও কিনারায় উঠতে পারলো না। নদীর পানি ছিল ঠাণ্ডা তাই ঠাণ্ডা পানিতেই ডুবে ইয়েমেনের বাদশা জুনাওয়াস ডুবে মারা গেল। যেমন কর্ম

তেন্ন ফলটি আসতে একটু দেরি হয় বলেই জুনাওয়ার ভাবতে পারে নি। আজও কি জুনাওয়ার মতো অনেকেই কর্মের ফলটিকে অস্বীকার করে আসছে না? আমরা ইতিহাসের পাতায় বারবার একই ঘটনার পরিণতি দেখে ও পড়েও কিছুই শিখতে পারি না। কেন পারি না? লোভ আর মোহ মানুষের সব কিছু এমনই অন্ধ করে দেয় যে কর্মফলটি হাসি মেরে উড়িয়ে দেই। কিন্তু কর্মফলটি যখন সামনে এসে দাঁড়ায় তখন আর বলার ও করার কিছুই থাকে না। জুনাওয়ার যখন বিশ হাজার খ্রিস্টানদের নির্মমভাবে আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারছিল তখন অনেকেই অভিশাপ দিয়ে গেছে, কিন্তু জুনাওয়ার তখন হাসছিল; কিন্তু যখন ঠাণ্ডা পানিতে সাঁতার জানা সত্ত্বেও ডুবে মারা যাচ্ছিল তখন কর্মফলটি মর্মে মর্মে টের পেয়েছিল। অভিশাপের কর্মফলটি আসতে দেরি হয় বলেই অত্যাচারী হাসে, কিন্তু এসে গেলেই কাঁদারও সময় পায় না। জুনাওয়ার পতনের পর সমস্ত ইয়েমেন প্রদেশটি হাবাশার বাদশা নাজ্জাশির দখলে চলে এল। কিন্তু দুই সেনাপতির মধ্যে আবার তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এক সেনাপতি আবরাহা এবং অপরজন হলো আরআত। সেনাপতি আবরাহা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল তারই কেনা গোলাম আতুদার আঘাতে। কেনা গোলাম আতুদার সহসা আঘাতে আরআত মারা গেল। আবরাহা আহত হলেও পরে সুস্থ হয়ে ওঠে। অবশেষে আবরাহাকে হাবাশার বাদশা নাজ্জাশি শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সেই থেকে

আবরাহাকে কেউ ইয়েম্মেনের বাদশা বলে, আবার কেউ শাসনকর্তা বলে। সেই যুগের সেই পরিবেশে কেউ বাদশা বললে যে ভুল করা হতো তা মোটেই ঠিক নয়। কারণ প্রজাদের উপর জুলুম অত্যাচারটি ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। শাসনকর্তার সৈন্যবাহিনী যখন যাকে ইচ্ছা মেরে ফেলতে পারতো। এর জন্য কোনো জবাবদিহিতার প্রশ্নই উঠতো না। কারণ ক্রমতা যাদের হাতে ছিল তারাই সব কিছু হর্তাকর্তা ছিল। তাই প্রজারা খুব সাবধানে চলাফেরা করতো। প্রজারা জানতো যে, সামান্য পান হতে চুন খসে গেলেই বিপদ, তাই সব কিছু দেখেও না দেখার ভান করতে হতো। অবশ্য হাবাশার বাদশা নাজ্জাশি আরআত নামক সেনাপতির হত্যাটিকে মেনে নিতে পারেন নি। তাই কিছু কিছু ঘটনা ঘটান পর হাবাশার বাদশা নাজ্জাশি আবরাহাকে ইয়েম্মেনের শাসনকর্তারূপে মেনে নিলেন। এইসব তুচ্ছ অথবা বড় ঘটনার বর্ণনা এখানে অধম লিখক দরকার মনে করি না। যতটুকু না লিখলেই নয় ততটুকুই যথেষ্ট

মনে করি। কারণ সুফিবাদের সঙ্গে যতটুকু ইতিহাসের প্রয়োজন ততটুকুই বর্ণনা করলাম। প্রয়োজনে যত ছোট করা যায় ততই ভাল। আবরাহা এখানে একটি বিরাট বিষয়, কারণ সে মেক্কা জি কাবা ধ্বংস করতে এসেছিল। কিন্তু ধ্বংস তো দূরের কথা, বরং নিজেই তার অনুসারীদের নিয়ে ধ্বংস হয়ে গেল। আল্লাহর ঘর আল্লাহ নিজেই রক্ষা

করেন, তা মেজাজি ঘরই হোক আর হাকিকি ঘরই হোক। প্রাণ আর দেহের যে রকম সম্পর্ক, মেজাজি আর হাকিকির ঠিক সে রকম সম্পর্ক। কোনোটাকেই অবহেলা করা যায় না।

ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গেলে আবরাহাকে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী বলতে হয়। কারণ রোমক রাজা আর হাবাশার রাজা নাজ্জাশির যে খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিলেন—ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। হাবাশার রাজা নাজ্জাশি যে আবরাহাকে সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন মূর্তিপূজারক রাজা জুনাওয়াসকে শাস্তি দিতে তাতেই প্রমাণিত হয় যে আবরাহা খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ছিল। আবার জুনাওয়াস যে বিশ হাজার খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদেরকে হত্যা করেছিল তাতেই প্রমাণিত হয় যে, জুনাওয়াস মূর্তিপূজারক ছিল এবং আবরাহা তারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু ক্রমতা আর বিত্তবৈভব মানুষকে এমনই অন্ধ করে দেয় যে ধর্মের অনুশাসনগুলো আর মনে থাকে না। অন্ধকার যেমন দিনকে ঢেকে দেয়, ক্রমতার মোহ আর বিত্তবৈভবের মোহ তেমনি ধর্মীয় অনুশাসনগুলোকে ঢেকে দেয়। এ আর এমন কী নূতন কথা! এটা তো সবারই কমবেশি জানা থাকার কথা। কারণ প্রতিদিনকার অনেক আপত্তিকর ঘটনা এসব আজগুবি কথা জোর করে মনে করিয়ে দেয়। ধর্মের অনুশাসন হতে স্থলন আর পতন তো সে যুগে অনেক ছিল, কিন্তু এ যুগেও কি কম হচ্ছে বলে মনে করেন?

হাবাশার বাদশা নাজ্জাশি যখন আবরাহাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না এবং বিশেষ করে আজ্জাসকে হত্যা করার পর, তখন আবরাহা রাজনীতির একটি ফন্দি বাহির করে ইয়েমেনের মাটি এবং আবরাহার কপালের দিকের কিছুটা চুল কেটে দিয়ে দূতের মাধ্যমে পাঠিয়েছিল এবং পত্রে লিখেছিল এই বলে যে, মাটি এবং আবরাহার মাথার সামনের দিকের কিছুটা চুল এ জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো যে, সব কিছু আপনার পবিত্র পদতলে ফেলে দিলাম এবং আপনার মহান স্মৃতি ও সুনামের জন্য একটি উচ্চ গির্জা বানানো হবে, যা এ পর্যন্ত কেউ বানাতে পারে নি। বাদশা নাজ্জাশি খুশি হয়ে আবরাহাকে ইয়েমেনের শাসনকর্তারূপে মেনে নিলেন।

তারপর চললো আবরাহার গির্জা বানাবার পায়তারা। একদিকে নাজ্জাশির মন রক্ষা করা এবং অপর দিকে কাবা হতে মানুষের মুখ ফিরিয়ে গির্জার দিকে নিয়ে আসা। অনেক পরিশ্রম অনেক টাকাপয়সা ব্যয় করে অবশেষে একটি গির্জা তৈরি করা হলো। সেই যুগের দৃষ্টিতে খুবই সুন্দর এবং উঁচু। সেই যুগের চাহিদা অনুসারে এতই উঁচু গির্জা বানানো হলো যে, গির্জার নামটি হয়ে গেল ‘টুপি পড়ে যাওয়া গির্জা’। আবরাহার বানানো এই গির্জাকে অনেকেই গির্জা বলে মেনে নিতে পারেন নি, তাই তারা একটাকে গির্জা না বলে মূশরিকদের মন্দির বলতো। যদিও এই গির্জা অথবা মন্দিরে কোন দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন

করা হয়েছিল কি-না তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অনেকে রাগে অভিমানে দেব-দেবীর মন্দির বলে উল্লেখ করেছেন। আর একটি মূল্যবান বিষয় হলো, সেই যুগে সবাই কাবা শরিফকে মনেপ্রাণে মানতো। যদিও তারা মূর্তিই পূজা করতো। মূর্তিপূজারক হলে কী হবে, কাবা শরিফকে মনেপ্রাণে মানতো এবং ইচ্ছতও করতো এবং কাবার বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোতে প্রচুর ধনরত্ন অকাতরে খরচ করতো। এতে মন্দির মূশরিক অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা দিনে দিনেই ভালো হতে থাকে। ইহাও একটি বিরাট ঈর্ষার কারণ ছিল আবরাহার। তাই আবরাহা সুন্দর এবং দামি গির্জা তৈরি করে মানুষের মুখ কাবা হতে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। এতে অনেক ধনরত্ন উপার্জন করা যাবে এবং অর্থনীতির বিশেষ উন্নয়ন হবে। কিন্তু এটা কি সম্ভব? সুন্দর করে বানালেই কি কাবার মর্যাদা খাটো হয়ে যাবে? কারণ কাবার সহজ সরল রূপটি যাই হোক না কেন, মূল্যবান পাথর আর বহু টাকা খরচ করে যত সুন্দর গির্জাই বানানো হোক না কেন, কাবার সামনে কি এর মূল্যায়ন হতে পারে? ধনরত্ন দিয়ে সুন্দর গির্জা বা অন্য কিছু বানানো যায়, কিন্তু হজরত ইব্রাহিমের বানানো কাবার সম্মানে এর এক পয়সাও দাম নাই। এতকালের পুরনো কাবা, এতকালের সম্মানীয় কাবাকে এক মুহূর্তে কি মলিন করা যায়? যায় না। তাই এত ঢাকঢোল পেটানোর পরও কোনো মানুষই এই নকল গির্জাটিকে কাবার মর্যাদার সামনে

মেনে নিতে পারে নি। আবরাহার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির ফলে মক্কার এক লোক গির্জার পাহারাদারকে ফাঁকি দিয়ে পায়খানা করেছিল। এই সুন্দর গির্জায় পায়খানা করার দরুণ আবরাহা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো, কারণ লোকে গোপনে হাসাহাসি করেছিল। যা-ও এত বিজ্ঞাপনি প্রচারে দু'চারজন বিদ্রাস্ত হয়ে গির্জায় আসা যাওয়া করতো তা-ও বন্ধ হয়ে গেল পায়খানা করার ফলে। ধর্মমন্দিরে পায়খানা করাটা সে যুগে ছিল বিরাট অপরাধ এবং যত বড় পাপীই হোক না কেন সে যুগে এমন কাজটি করতে কেউ সাহস করতো না। মুশরিক তারা অবশ্যই ছিল, কিন্তু ধর্মমন্দিরে পায়খানা করাটা ছিল কল্লনার বাহিরে। পায়খানা করার অর্থটি হল, এটা কোনো ধর্মমন্দিরই

নয়। হাবাশার বাদশা নাজ্জাশিকে খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী বলাতে কেউ যেন বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাবেন না। কারণ লোকে যাতে বিষয়টা সহজে ধরতে এবং বুঝতে পারে। আসলে কিছু তারা ইসলাম ধর্মেরই অনুসারী ছিল। আন্তরিকতার প্রশ্ন তোলাটা এই লেখার বিষয়বস্তু নয়। যে সকল কথা লিখছি তা মহানবীর জন্মের আগে। মহানবীর নবুয়ত পাবার আগ পর্যন্ত যারা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী ছিল তারা কিছু সবাই ইসলাম ধর্মেরই অনুসারী। এই বিষয়টা মাথায় রেখেই লিখছি এবং যারা পড়বেন তারাও তাই মনে করবেন। নতুবা বিরাট ভুল করা হবে।

তখনকার দিনে গির্জার মর্যাদা ইসলাম ধর্মেরই মর্যাদা। তাই বলে যে কোনো গির্জাই হোক না কেন বা সেই গির্জার মর্যাদা যতই হোক না কেন, কিছু বায়তুল মোকাদ্দাসের সমান মর্যাদা পাবার প্রশ্নই উঠে না। মুসলমানদের মসজিদ যত মর্যাদাবানই হোক না কেন এবং মসজিদ আল্লাহর ঘর বলে জানা থাকলেও মক্কার পবিত্র কাবা ঘরের মর্যাদা পাবার প্রশ্নই উঠে না। কারণ কাবা কাবাই, আর মসজিদ মসজিদই। কাবাকে কেন্দ্র করেই মসজিদ, সুতরাং বাহির আর কেন্দ্র এক হবার প্রশ্নই উঠে না। মক্কার অধিকাংশ মানুষ তখন মূর্তিপূজা করতো, কিছু সেই মূর্তিগুলো আল্লাহর কাবা ঘরেই স্থাপন করা হয়েছিল—এটা ইতিহাসের কথা। কেবল মক্কা আর মদিনাই (ইয়াসরেব) নয়, বরং আরবদেশ ছেড়ে যে ইয়েমেন সেই ইয়েমেনের অনেক লোক কাবাকে শ্রদ্ধা করতো এবং কাবার বিশেষ অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ ও অর্থব্যয় করতো। এতে মক্কাবাসীদের আর্থিক সম্ভলতা ছিল। আবরাহা অনেক টাকাপয়সা খরচ করে অনেক ঠাট্টা এবং জাঁকজমকপূর্ণ যে গির্জাটি বানিয়েছিল উহা কাবা শরিফ হতে কেমন করে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে? চকচক করলেই যে আসল হয়ে যায় না এটা সেদিনের মানুষও পরিষ্কার বুঝতে পারতো। তাই আবরাহার সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রচুর অর্থব্যয় করাটা বৃথা গেল। তার উপর কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা। এমনিতেই মানুষ নেই, তার উপর মানুষের পুরিষ তথা পায়খানা তথা ও

দেখে তো আরও বেগে যাবার কথাই। আমাদের বাংলাদেশের রাজধানীতে হজরত বাবা শরফুদ্দিন চিশতির মাজার আছে যাকে সবাই হাইকোর্টের মাজার বলেই জানে। কিছুদিন আগেও মাজারটির তেমন শানশওকত ছিল না। অথচ সামান্য কিছু দূরেই তিন নেতার তিনটি কবর সরকারি খরচে সুন্দর ডিজাইন করে বানানো হয়েছে। দেখতে চমৎকার, কিন্তু ভুলেও কেউ সেখানে যায় না। কারণ লোকে অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পারে যে, এই তিনটি জাঁকজমকপূর্ণ কবর। কবর পূজা করা ইসলামে হারাম। নাম দেওয়া হয়েছে মাজার কিন্তু এই তিনটি কবর মোটেও মাজার নয়। মাজার আর কবরের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। যেমন আল্লাহর ওহি তথা বাণীর মধ্যেও আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ওহি নবী-রসুলের কাছে আসলে হয় আলাইহেস সালাতুস সালাম, আবার এই একই ওহি হজরত ইসা নবী এবং হজরত মুসা নবীর মায়ের কাছে আসলে হয় রাদি আল্লাহ আনহা, আবার এই একই ওহি যখন মোম্মাছিদের কাছে নাজেল হয় (সূরা নহলের আটমটি নম্বর আয়াত) তখন আমরা কেউ ভুলেও মোম্মাছি আলাইহেস সালাতুস সালাম বলি না, কারণ মোম্মাছির কাছে যত ওহিই নাজেল হোক না কেন, মোম্মাছি কেবল জীবাত্মার অধিকারী। পরমাত্মা তথা রূহ মোম্মাছিকে দেওয়া হয়েছে এমন কথাটি কোরানের কোথাও নাই। আল্লাহর ওলিকে যেখানে রাখা হয় সেই স্থানটিকে মাজার অথবা রওজা বলা হয়। কারণ

ওলিরা মারা যান না। কোরান আল্লাহর ওলিদেরকে মৃত বলতে মানা করেছে এবং এমন কি মৃত চিন্তা করতেও মানা করে দিয়েছে। কারণ কোরান নিজেই ঘোষণা করেছে যে, ওলিদেরকে গোপনে রেজেক দেওয়া হচ্ছে (বাল্ এন্দা রাব্বিহিম ইয়ার জাকুন), ‘বরং ভেতরে ভেতরে তাহাদের রব হইতে রেজেক দেওয়া হইতেছে।’ এখন প্রশ্ন হলো, রেজেক তো লাশে খায় না, বরং জীবিতর জন্য রেজেক, কারণ যারা জীবিত কেবল তারাই আল্লাহর রেজেক খেতে পারে।

আধুনিক যুগে মুখে না খাওয়ায়ে স্যালাইনের সঙ্গে খাদ্য দিয়ে বছরের পর বছর বাঁচিয়ে রাখছে, আর আল্লাহ সর্বশক্তিমান হয়ে কি ওলিদের অদৃশ্য রেজেক দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন না? অবশ্যই পারেন। যারা পারেন না বলে তারা একশত পারসেন্ট কাফের। সূরা কাহাফে বর্ণিত সাতজন আল্লাহর ওলিকে তিনশত নয় বছর বাঁচিয়ে রেখেছিলেন কোনো খাদ্য ও পানি ছাড়া। এই জ্বলন্ত দলিলটি সামনে দেখেও যারা গৌজাম্বিল দিয়ে এটা সেটা বলতে চায় তারা অবিশ্বাসী। যে বা যারা মানবে না তাদের সামনে হাজার দলিল দাঁড় করালেও মানবে না। যিনি বা যারা আল্লাহর ওলি তারা তো জীবিত। জীবিত ওলিদের আবার কবর হয় কী করে? তাই ওলিদেরকে যেখানে রাখা হয় উহা কবর নয়, বরং মাজার অথবা রওজা। মুসলিম শরিফ-এ বর্ণিত হাদিসে কবরগুলো ভেঙ্গে দিতে

যে আদেশ মহানবী করে গেছেন সেটা সাধারণ মানুষের কবর। এত কবর পাকা করলে চাষের জমি কমে যায় তাই ভাস্কার কথাটি এসেছে। একজন দুনিয়াদার বিখ্যাত মানুষের কবরটিকে যখন মাজারের রূপ দিয়ে তৈরি করে সেই কবরটি দেখতে মাজারের চেয়েও সুন্দর হলে কী হবে জনগণের কাছে কবরই থেকে যায়। ভয়ে ভয়ে হয়তো মাজার বলবে, কিছু আগরবাতি আর গোলাপ জল নিয়ে যাবার প্রশ্নই উঠে না। কারণ ধর্মের ঢোল আপনিই বাজে। হাতের আঙ্গুল আর আয়না দিয়ে দেখতে হয় না। আবরাহা খুব সুন্দর এবং উঁচু গির্জা বানিয়ে মনে করেছিল যে, কাবা শরিফ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, কিছু সাধারণ মানুষ জানে যে, আবরাহার গির্জা যতই চকচক করুক না কেন, যতই আকাশছোঁয়া উঁচু হোক না কেন, অতি সাধারণ সাজে সজ্জিত কাবা শরিফের মানমর্যাদার ধারে কাছেও যাবার প্রশ্নই উঠে না। আবরাহার এই বিষয়টি অর্থনীতিই হোক আর রাজনীতিই হোক, কিছু জনগণের কাছে বলপ্রয়োগ করেও ফলাফলটি হলো বিরাট একটি শূন্য। তাই অসহ্য অপমান সহ্যে না পেরে আল্লাহর পবিত্র ঘর কাবা শরিফকে ধ্বংস করতে এসেছিল। কিছু নিয়তির কী নির্মম পরিহাস-ধ্বংস করতে এসে নিজেই ধ্বংস হয়ে গেল। জীবাত্মার অধিকারী মাহমুদ নামক হাতিটিও আল্লাহর ঘর কাবা শরিফ চিনতে পেরে উল্টো দিকে দৌড় দেয়, আর আবরাহা মানুষ হয়েও কাবা শরিফ চিনতে পারলো না।

জঙ্গলের সবচেয়ে বড় জীব, কলা গাছ যার প্রিয় খাদ্য সেই হাতি, নাম তার মাহমুদ, উল্টো দিকে দাঁড়ায়-আর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব নফস ও রুহের অধিকারী আবরাহা কাবা শরিফ ভাঙতে এগিয়ে আসে আর আসে তার পা-চাটা আজ্জাবহ সৈন্যদল। মানুষ যখন নিচের দিকে নামতে থাকে এবং নিচে নামার শেষপ্রান্তে যখন দাঁড়ায় কোরান তাকে আস্ফালুস সাফেলীন তথা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট বলেছে। সুতরাং আবরাহা পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট একটি মানুষরূপী জীব। এই সমস্ত জ্বলন্ত উদাহরণগুলো তুলে ধরে মানুষকে বারবার সাবধান করে দিচ্ছে কোরান। বস্তুবাদের কতখানি ঘোর পূজারি হতে পারলে পরকাল ভুলে যায় মানুষ! এমন কি আল্লাহ নেই বলেও অনেক রকম মতবাদ বিদ্যা ও জ্ঞান দিয়ে তৈরি করে। ‘আল্ এলমুল হেজাবুল আকবর’-এই জ্ঞানই আল্লাহর পরিচয় জ্ঞানবার পথে সবচেয়ে বড় দেয়াল তথা পর্দা হয়ে দাঁড়ায়। দেহের মাঝে যতদিন আত্মাটি বাস করে ততদিন বলে বেড়ায় বাস্তব জীবন। আশিটি বছর কেটে যাবার পর যখন আত্মা দেহ ফেলে দেয় তখন সূক্ষ্ম বাস্তব আত্মাটি আর একটি সূক্ষ্ম বাস্তব রহস্যলোকে চলে যায়। সূক্ষ্ম বাস্তবটি মানতে চায় না যতদিন দেহটিতে বাস করে। কী অজানা ব্যর্থ আস্ফালন! কী অদ্ভুত অহঙ্কারের উত্তাল তরঙ্গ। কূলে আছড়িয়ে চিৎকার দিয়ে নিম্নে বিলীন হয়ে যায়।

ইতিহাস হতে জানতে পারি যে, উম্মাইয়া এবং আব্বাসীয়া শাসকেরা, যারা খলিফা নামধারণ করে রাজ্যশাসন করেছেন, তাদের কেউ কেউ কাবার ঋতিসাধন করেছে। যারা কাবার ঋতিসাধন করেছে তাদের সময় কেন আল্লাহ পাক আবাবিল পাখির দ্বারা শাস্তিপ্রদান করলেন না? তাদের এই ঋতিসাধনটি ইচ্ছাকৃত ছিল না। যদি ইচ্ছাকৃত ঋতিসাধন হতো তা হলে অবশ্যই কোনো না কোনো শাস্তি আসতো। বিনা শাস্তিতে আল্লাহ ছেড়ে দেবেন এটা হতে পারে না। যারা কাবার ঋতি সাধন করেছে তারা কাবা আল্লাহর ঘর বলে বিশ্বাস করতো, কিন্তু ইহা মোটেই ইচ্ছাকৃত ছিল না। খাজা বাবার মাজারে যেতে হলে সেই দূরের শাহজাহান গেইট হতে পায়ের জুতা খুলতে হয়। সে যেই হোক না কেন, এমন কি ভারতের প্রধান মন্ত্রীই হোক না কেন। কিন্তু উরস মোবারকের সময় যখন খাজা বাবার মাজারের গম্বুজের উপর হরেক রকমের আলোকসজ্জা করা হয় তখন খালি পায়ে মাজারের গম্বুজের উপর উঠতে হয়। যিনি উঠেছেন তিনি বেয়াদবি করার জন্য উঠছেন না, বরং আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে পরিবেশটাকে মনোরম করে তোলার জন্য। নিয়তের উপরই সব কিছু নির্ভর করে। বেয়াদবির নিয়তে উঠলে শাস্তি পাওয়াটা অবধারিত। কারণ কোরানে বর্ণিত সকল নবী মিলেও যতটুকু মুসলমান বানাতে পেরেছেন তা খাজা বাবার বারো ভাগের এক ভাগ হয়

কিনা সন্দেহ। তাই তিনি বলেছেন যে, আমি হলাম দ্বিতীয় ইসা (মান নামিদানাম মাগার ইসায়ে সানি সুদাম)।

আমি ভালো করেই জানি যে, খাজা বাবার উদাহরণ টেনে আনলেই ওহাবিরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে। ওহাবিরা জ্ঞানকে এতই সীমাবদ্ধ করে ফেলে যে, নবীদেরকেও আমাদের মতো মানুষ মনে করে। আর মনের ভেতর খান্নাস তো আছেই, তাই সাধারণ মানুষও মনে করে যে, ওহাবিরা তো ঠিকই বলেছে যে, নবী আমাদের মতই মানুষ। নবী যে আমাদের মত মানুষ মোটেই নয় এটা বুঝতে হলে একটু গবেষণার প্রয়োজন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বার বার উপদেশ দিতেন এই বলে যে, ‘যেখানে জ্ঞান পাবে তা অর্জন করে নিয়ো। আর ফিকাহ শাস্ত্রের আলেমদের বাগড়া ও সমালোচনা গ্রহণ করতে যেয়ো না। কারণ এইসব আলেমেরা খোঁয়াড়ে বাস করা মানুষরূপী ভেড়ার দল। এই সব আলেমেরা একে অপরের উপর চড়াও হয়।’ (‘আন ইবনে আব্বাস-কুজুল এলম্মে হাইসু..... তাওয়ীসে ছিল জাওয়ীইয়াতে।’)

আদব আর বেয়াদবিটা সম্পূর্ণ নিয়তের উপর নির্ভর করে। আবরাহা এসেছিল কাবা ঘরটিকে ধ্বংস করার নিয়তে আর দু’চারজন খলিফাদের দ্বারা যে কাবা ঘরের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে উহা কখনই কাবা ঘরটিকে

ধ্বংস করার নিয়তে নয়। যদি নিয়ত খারাপই হতো তা হলে তারা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতো। সেই শাস্তির মাত্রা ও রকম হয়তো ভিন্ন হত। একটি স্টিল দিয়ে সার্জনের চাকু তৈরি হয়, আবার কসাইর চাকুও তৈরি হয়। সার্জন কাটে

বাঁচাবার নিয়তে আর কসাই কাটে গোস্ত বিক্রির নিয়তে। সুতরাং ম্লেজাজি কাবার গুরুত্ব অনেক। ম্লেজাজি কাবা আছে বলেই হাকিকি কাবার কথা বলতে পারি এবং হাকিকি কাবার প্রয়োজন ও গুরুত্বটি বুঝতে পারি। তবে যে বিষয়টিতে ম্লেজাজি আছে সেই বিষয়টির যতই গুরুত্ব ও মূল্য হোক না কেন সেই বিষয়টির সঙ্গে আল্লাহ থাকেন না। যেমন আল্লাহ হাজিদের সঙ্গে আছেন (ইল্লাল্লাহা মাআল্ হজ্জাজ) এই কথাটি কোরানের কোথাও পাবেন না। হজ্জের মরতবা অনেক এবং হাজিদের মরতবাও অনেক, কিন্তু যতই মরতবা থাক না কেন, তাদের সাথে আল্লাহ আছেন বা থাকেন কথাটি পুরা কোরানের কোথাও নাই।

ধর্মের মূল সত্য

আজকাল মানুষ সব ধর্মেই ম্লেজাজি বিষয়টাকে একমাত্র বিষয় মনে করে। তাই ধর্মের হাকিকি রূপটি দিনে দিনেই হারিয়ে যাচ্ছে। কিছু মানুষ হাকিকি বিষয়টির কথা প্রচার করে বলেই সর্বধর্মে সুফিবাদটি টিকে আছে। আবার সুফিবাদের গবেষণা করতে গিয়ে অন্যধর্মকে

কটাক্ষ করে এবং অন্যধর্মের হাকিকি বিষয়টি যারা ধরে রেখেছেন তাদেরকে রোহবানিয়াতের অপবাদ দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়। অনেকে তো এতদূর পর্যন্ত এগিয়ে বলে ফেলে যে, সিলেটের শাহ জালাল বাবা এবং শাহ পরান বাবা বিয়ে না করে নবীজীর একটি সুন্নত হতে বঞ্চিত। হায়রে সুন্নতের নামে এত বেফাঁস কথা! সরল সহজ মানুষগুলোকে কত রকম যে ধোকার ফাঁদ পেতে রাখে কারেন্ট জালে মাছ আটকাবার মতো, তার হিসাব কে রাখে?

আসলে আমি আগেই বার বার বলেছি যে, কোরানের সব কথার মূল কথাটি হলো, তোমার সঙ্গে যে শয়তানরূপী খান্নাসটিকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে উহাকে সরিয়ে দাও, উহাকে বিদায় করে দাও এবং বিদায় করতে পারলেই জন্মান্তরবাদের বার বার আসা যাওয়ার চক্র হতে মুক্তি পাওয়া যায় এবং আল্লাতে ফানা হওয়া যায় এবং ফানা হতে পারলেই বাকাতে অবস্থান করা যায়। খান্নাস হতে মুক্তি পাবার জন্যই এত আয়োজন, এত বাহারি কথা, এত বাহারি আদেশ আর উপদেশ। মানুষ এত বাহারি আদেশ-উপদেশের মাঝে যদি মূল বিষয়টিকে হারিয়ে ফেলে, নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত আর কোরবানি যে একই সূত্রে গাঁথা, একই মূল বিষয়টি বাহারি কথার শৈলীতে বলা হয়েছে, একই বিষয়ের অনেক রকম নাম আর অনুষ্ঠান বুঝতে পারলেই আসল বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই সূরা মোমিনের ষাট নম্বর আয়াতে

নামাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত আর কোরবানির বিষয়গুলোকে একত্র করে এক কথায় বলেছে যে, তুমি আল্লাহকে একা ডাকো, ডাকের জবাবটি সাথে সাথে পাবে। কী সুন্দর শর্তটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, আর সেই শর্তটি হলো, একা ডাকতে হবে এবং একা ডাকতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে ডাকের জবাব অবশ্যই পাবে। আল্লাহকে ডাকলে জবাব পাই না। কেন পাই না? সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জাকাত আর কুরবানি প্রতিটি বিষয়ে জবাব পাবার কথাটিই বলা হয়েছে। অন্য আর কোনো কথাই বলা হয় নি। ভাষার লালিত্যে মনে হবে অনেক রকম আদেশ-নিষেধ করা হচ্ছে। কিন্তু চোখ থাকলে বুঝতে পারবে যে, না, আর কোনো কথাই বলা হয় নি। কেবল একটি কথাই বলা হচ্ছে আর তা হলো, তুমি আল্লাহকে একা ডাকো, ডাকের জবাবটি সাথে সাথে পাবে। আপনার কাছে মনে হবে যে, কত কথা বলা হচ্ছে, কত আদেশ-উপদেশ দেওয়া হচ্ছে, কত সাবধান আর জাহান্নামের ভয় দেখানো হচ্ছে, কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে বারবার পড়ে দেখুন, দেখতে পাবেন ভাষার বাক্য ভিন্ন কিন্তু বিষয়টি এক। মাহবুবে এলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার প্রধান খলিফা হজরত বাবা আমির খসরু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতের মহীরুহ তথা বটগাছ। উনি আড়াই হাজার রাগ-রাগিনীর জনক। এর মধ্যে উনার এটি বিশেষ রাগের নাম হলো ঠুমরি। ঠুমরি রাগটি হলো মাত্র একটি বাক্যকে অনেক রকম সুরে গাওয়া। যেমন ধরুন একটি বাক্য ‘কায়সে লাগে

জিয়ারা মোরা’, তথা ‘আম্মার উৎসর্গ কেমন লাগলো’ দিয়ে অনেক রকম সুরে গাওয়ার নামটি হলো ঠুমরি। আজ হতে প্রায় ঊনপঞ্চাশ বছর আগে ঢাকা স্টেডিয়ামে বিখ্যাত দুই ভাই ওস্তাদ নাজাকাত আলী ও ওস্তাদ সালমত আলী এই ‘কায়সে লাগে জিয়ারা মোরা’ একটিমাত্র বাক্যটিকে প্রায় তিনশত রকম আলাদা আলাদা সুরে গেয়েছিলেন। এতে দর্শকরা অভিভূত হয়েছিল। এত সুরের এত বাহারি রকমারি দেখে মনেই হয় না যে এই দুই ওস্তাদ মাত্র একটি বাক্যকে সম্বল করে গাইছে। দর্শকবৃন্দ মনের অজান্তে হয়তো ভুলে গিয়ে ভেবেছে যে, এত বড় লম্বা গান আর আগে তো কখনো শুনি নি। আসলে তো সুরের অনেক রকম বাহাদুরি। যারা মনে করে বিরাট বড় একটি গান গাইলেন তাদেরকে বলার কিছুই নাই, কারণ যা বুঝেছে তাই বলেছে। আমি অধম লিখক বলছি যে, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জাকাত আর কোরবানির মূল কথা একটি, আর তা হলো, তোমার ডেতর যে খান্নাসটি আছে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে একা হও এবং একা হতে পারলে ডাকের জবাবটি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে। অথচ মনে হবে কত বিরাট বিষয় নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, পাড়-কূল পাচ্ছি না ইত্যাদি। আমি অধম লিখকও জেনেশুনে অনেক কথা লিখে যাচ্ছি এবং লিখে যেতে বাধ্য

হচ্ছি। কিন্তু ভালো করেই জানি মূল বিষয়টি একটি, মূল বিষয়টি মাত্র একটি বাক্য, মূল বিষয়টি সূরা মোমিনের ষাট নম্বর আয়াতটি : তুমি একা ডাকো, জবাব সঙ্গে সঙ্গে পাবে।

আর একটি প্রশ্ন হয়তো করা যেতে পারে, আর তা হলো-হাক্কুল ইবাদের কথাটি সালাত-সিয়ামের সঙ্গে আনা হলো না কেন? আনলাম না এ জন্য যে, হাক্কুল ইবাদ যার নাই তার জন্য এইসব কথা বলা আর না বলা সমান। কারণ কোরান বলছে যে, তুমি কি সেই মানুষটিকে দেখেছ যে ধর্মের উপর মিথ্যারোপ করে? অথবা, এই মানুষটি ইসলাম হতে প্রথমেই বাদ, যে মানুষটি এতিন হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যারা প্রথমেই ইসলাম ধর্ম হতে বাদ তাদেরকে সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জাকাত আর কোরবানির কথা কেমন করে শোনাই? শোনাবার প্রশ্নটি যেখানে প্রথমেই অবাস্তব আর অবাস্তব সেখানে শোনাবার প্রশ্নটি কি থাকতে পারে? জেনে শুনে একজন মুসলমানকে হত্যা করলে সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়ে যাবে যেখানে বলা হয়েছে, সেখানে শত মুসলমান খুন করা মানুষটিকে গুলিয়ে লাভ কী? হজ্জ করার তো প্রশ্নই আসে না, বরং যেখানে সেখানে বন্দি করে দিয়ে মাহফিলকে নষ্ট করে দেবে। মানুষ তো আল্লাহর মারটা এই হাক্কুল ইবাদের কাছেই থাকবে। সব কিছু জেনেও যারা না জানার ভান করে তাদেরকেই বা বলার কী থাকতে পারে? বরং এ রকম মানুষগুলোকে আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভালো। যেখানে

আল্লাহ পাক বার বার সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে, বান্দার হক মেরে দিলে তথা আত্মসাৎ করলে ক্লাম্বা করার আইনই রাখা হলো না, তবে যে বান্দার হক মেরে দেওয়া হয়েছে সে যদি ক্লাম্বা করে দেয় তো সেটা আলাদা কথা। যদি বান্দা ক্লাম্বা না করে তা হলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়? তারপর কেউ যদি নিজের মনগড়া কথা ও ব্যাখ্যা দিয়ে কিছুটা বলতে চায় তো বলুক—তাতে মনে মনে তৃপ্তি পাবে, কিন্তু বাস্তবে কী হতে পারে তা বুঝবার শক্তি আছে বলে মনে করি। ঘুমের মাঝে স্বপ্ন দেখে কোটি টাকা পেয়ে ঘুমেই খুশি হয়, কিন্তু বাস্তবে কি তা পায়?

জীবাত্মা এবং পরমাত্মা (নফস এবং রূহ)-কে একটি পাত্রে ধারণ করে রাখা হয় একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। সেই পাত্রটির নাম দেহ তথা শরীর তথা লাশ। এই পাত্র হতে নফস ও রূহ বাহির হয়ে গেলে কেবল লাশ নামক খাঁচাটিকে দেখতে পাই। জানি এই খাঁচা নামক লাশের মাঝে নফস ও রূহ নাই, তবু এই খাঁচা নামক লাশটিকে মেজাজি কবরে দিয়ে আজাবের কথাটি বলি। অবশ্যই আজাব হয় তবে যখন খাঁচা নামক লাশটি জীবন্ত থাকে। কারণ নফস ও রূহ তখন জীবন্ত দেহটিতে থাকে। সুতরাং জীবন্ত শরীরটাই নফসের কবর। যত প্রকার আজাব আছে সব এই জীবন্ত দেহের মাঝেই হয়। এই দেহ নামক পাত্রটি ছাড়া নফস ও রূহের পরিচয়টি জানতে পারি না। দেহ নামক পাত্র ছাড়া পরিচয় পাই না তাই দেহটাকেই সব কিছু বলে ভাবতে চায়। এই

ভাবাটাই মনের অজান্তে ভুল করা। বাস্তব ছাড়াও যে কারেন্ট থাকতে পারে তা আমরা জানি, কিন্তু বাস্তবের মাঝেই কারেন্ট আলোকিত হলেই বুঝতে পারি বজ্রপাতের মধ্যেও কারেন্ট আছে, তাই যার বা যাদের উপর পড়ে তারা মারা যায়। এই রহস্যগুলো জানতে হলে ধ্যানসাধনা করতে হবে। আবার ধ্যানসাধনা করলেই হবে না, বরং গুরুর নির্দেশ মতো নিয়ম মতো ধ্যানসাধনাটি করতে হবে। গুরু মোকাম এবং লতিফাগুলোর পরিচয় এবং এর রহস্য মুখে বুঝিয়ে দেবেন, কোন লতিফার সঙ্গে কোন লতিফা মিশিয়ে গুরুর ধ্যানে এগিয়ে যেতে হবে তা গুরু শিখিয়ে দেবেন। কিন্তু ধ্যানসাধনাটি করতে হবে মুরিদের। গুরু বিশেষ নজর তখনই দেন যখন মুরিদ প্রচণ্ড ধ্যানসাধনায় মগ্ন থাকে। এই এলেন্স তথা জ্ঞান বই পড়ে পাওয়া যায় না। বই পড়া জ্ঞানটি ধ্যানসাধনার প্রশ্নে একদম বেকার, কারণ মুরিদ যাহা অর্জন করতে যাচ্ছে উহা হলো সিনার এলেন্স তথা জ্ঞান। ইহা মাথার জ্ঞান হলে বই পড়তে হতো। এই সিনার এলেন্স নির্জনে একাকী মুখ চোখ বন্ধ করে ধ্যানসাধনার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। আপনার ডেতর যে রূহটি অণু-পরমাণু রূপে বিরাজ করছে উহাকে জাগ্রত করতে পারলেই রহস্যের কিছুটা ভেদ জানা যায়। তারপর সাধনার পর সাধনায় বছরের পর বছর ধ্যান করে রহস্যলোকের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। মাদার জাত ওলি পীরানে পীর গাউসুল আজমও তেইশ বছর ধ্যানসাধনা করেছেন। এমন

একজন ওলি-দরবেশ-মুনি-খাম্বি আপনি পাবেন না যিনি বছরের পর বছর ধ্যানসাধনা না করেছেন। ইমাম গাজালির পীর বাবা আবু আলি ফরমাদি যখন বললেন যে, তুমি তো মাথার এলিমের মহাপণ্ডিত, কিছু সিনার এলিমের তো বিদ্যুৎবিসর্গও জ্ঞান না। ছয়টি বছর ধ্যানসাধনা করার নিয়ম-কানুন বলে দিলেন এবং ইমাম সাহেব ছয় বছর ধ্যানসাধনা করার পর সিনার এলিম অর্জন করে আর একটি বাক্যও লিখে যান নি। বলতেন-এ কোন রহস্য লোকের জ্ঞান নিয়ে সুফি দরবেশরা বসে আছেন অথচ আমরা চিনতে পারি না, জ্ঞানতে পারি না, বুঝতে পারি না। মক্কার মিনাতে অবস্থিত তিনটি শয়তানকে যেমন মেক্কাজি শয়তান রূপে মানতেই হবে তেমনি মেক্কাজি মাটির কবরেও আজাব হয় মানতেই হবে। যদি না মানেন তো শরিয়ত থাকে না। মূর্ত না থাকলে বিমূর্তের পরিচয় জানাটা বড়ই কষ্টের হয়। তাছাড়া জ্ঞান অর্জনের প্রশ্নে একতেলাফ তথা ভিন্নমত

থাকবেই। এই একতেলাফটিই গবেষণা করার উৎসাহ দান করে। আর একতেলাফটি না থাকলে আল্লাহ পাকের পরীক্ষা বলে কিছুই থাকে না। এই একতেলাফটি কেবল মানুষ আর জ্বীন জাতিকেই দেওয়া হয়েছে। গরু-ছাগল, বাঘ-ঘোড়াকে দেওয়া হয় নি। বাংলাদেশের গাধা আর পাকিস্তানের গাধার চাল-চলন এবং চিৎকারের ভাষাটি একই হবে। সুতরাং একতেলাফটি মানুষ এবং জ্বীন জাতির জন্য। সুফিরা সোজা বলে

দেয় যে, আমার কথা মতো মাত্র একশত বিশ দিন ধ্যানসাধনা করে দেখ, যদি কিছু না পাও তো আমাকে কিছু বলতে পারবে। একশত বিশ দিনে কামেল হওয়া যায় না, কিছু রহস্যলোক নামক আগুনের ধোঁয়াটুকু তো দেখতে পাবে। এ রকম কথাগুলো একমাত্র সুফিরাই বলে। আর সবাই বাকিতে পাবার কথাটি শোনায এবং শুনতে পাই।

অনেক সময় গবেষকেরা খেই হারিয়ে নফসকেই গালি দিতে থাকে। নফসকে গালি দেওয়া যায় না। তা হলে অস্তিত্বকে গালি দেওয়া হয়। অস্তিত্বের কর্মকে গালি দেওয়া হয়। ‘আমি’ ও ‘আমার’-কে গালি দিতে হয়। ‘আমি’ থাকলে ‘আমার’ থাকবেই। এই ‘আমি’ ও ‘আমার’-কে না বুঝে না জেনে গালি দিলে ফলটা কী দাঁড়ায়? যিনি ‘আমি’ ‘আমার’-কে তৈরি করেছেন তাকেই গালি দেওয়া হয়। সুতরাং ‘আমি’-টা দোষণীয় নয়। নফসটি অপরাধী নয়। ‘আমি’-টার সঙ্গে, নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে দেওয়া হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দিতে বলেছেন আল্লাহ। যখন নফসের উপর শয়তানরূপী খান্নাস ভর করে তখন মোহ আর মায়ার আগমন হয়। মোহ আর মায়াকাই বন্ধন। নফস মোটেই বন্ধন নয়। সোজা কথায় নফসের কাজগুলো বন্ধন নয়। যখন মোহ-মায়া নফসের কাজগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে তখনই নফস কলুষিত হয়। কর্ম বন্ধন নয়, বরং মোহ-মায়াকাই বন্ধন। তাই নফসকে কয়েকটি

ভাগ করতে দেখি। শেষ ভাগের নফসটিকে জ্বালাতে প্রবেশ করার
আস্বাদ জানানো হয়। আর আশ্চর্য্য নামক নফসটিকে গালাগালি করা
হয় এবং জাহান্নামের দুঃসংবাদ দেওয়া হয়। সুতরাং ইসলামের যে
কোনো বিষয়ের উপরই আলোচনা করা হোক না কেন সবগুলো বিষয়ই
মাত্র একটি কথা বলছে, একটি উপদেশ দিচ্ছে, একটি মাত্র আস্বাদ
জানাচ্ছে, একটি মাত্র সুসংবাদ জানানো হচ্ছে : আর সেটাই হলো, তুমি
আল্লাহকে একা ডাক, জবাব সাথে সাথে পাবে। কিন্তু আমি তো একা
নই। আমার সঙ্গে শয়তানটিকে খান্নাসরূপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।
আবার বলা হয়েছে এই খান্নাসরূপী শয়তানটিকে বের করে দাও। এই
বের করে দেওয়ার উপদেশ ছাড়া আর কোনো উপদেশ নাই এবং
থাকতে পারে না। একটি মাত্র বাক্য : কায়সে লাগে জিয়ারা
মোরা-‘আমার উৎসর্গটি কেমন লাগলো?’ কিন্তু একটি বাক্যকে তিনশত
রকম সুরের লালিত্য আর শৈলীর ঠমকে ভরকিয়ে দেয়। মনে হয় অনেক
গান গাইছে। আসলে মাত্র একটি গানের মাত্র একটি লাইন। হজরত
আমির খসরু-র কী বিস্ময়কর অবিষ্কার ঠুমরি নামক রাগটি। মনে হয়
কত কথার কত কান্না কত বেদনার বিলাপ, আসলে যে মাত্র একটি
বাক্য তা শ্রোতা ধরতে পারে না। ধরতে না পারাটাই হল বাহারি ঠুমরি।
কোনো গুরু বুঝিয়ে দেন যে, তুমি কি শুনতে পাও না যে মাত্র একটি
বাক্যের কত রকম লালিত্যের সাজ আর ঠমক।

রোজার হাকিকত

রোজা কথাটি যদিও বাংলায় চালু, কিন্তু ইহা ফারসি ভাষা হতে এসেছে। উর্দুতেও রোজাই বলা হয়, কিন্তু আরবিতে ইহাকে সিয়াম বলে। যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করে তাকে বলে সায়েম। এখন প্রশ্নটি হলো, সিয়াম বলতে কী বুঝায়? সিয়াম অর্থ হলো, প্রত্যাখ্যান, বর্জন, ত্যাগ, বিরত থাকা। ইংরেজিতে রিজেকশন বলা যেতে পারে। সুতরাং যে ব্যক্তি এই প্রত্যাখ্যান, বর্জন, ত্যাগ এবং বিরত থাকার প্রচেষ্টায় লিপ্ত তাকে সায়েম বলে তথা রোজাদার বলে। এখন কথাটি হলো যে, সায়েম তথা রোজাদার কোন বিষয়টি হতে বিরত থাকবে? এবং কী তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে? প্রত্যাখ্যান করার অথবা বর্জন করার একমাত্র বিষয়টি হল আন্নিত্ব। আন্নিত্ব বলতে কী বুঝায়? যে ‘আন্নি’-টি নির্ভেজাল নয়, বরং ভেজাল আছে সেই ভেজাল ‘আন্নি’-টিকে বলা হয় আন্নিত্ব। ‘আন্নি’-টি কখন ভেজালে পরিণত হয়? যখন ‘আন্নি’-র সঙ্গে খান্নাসরুপী শয়তানটি বহাল অবস্থায় বাস করে এক ‘আন্নি’-কে দুই ‘আন্নি’-তে পরিণত করে। এক ‘আন্নি’-র মাঝে দুই ‘আন্নি’ থাকাটাকেই ভেজাল বলে। এই দুই ‘আন্নি’-র ভেজাল হতে পরিত্রাণ পাবার জন্য, মুক্তিলাভ করার আশায় যে ‘আন্নি’-টি নকল ‘আন্নি’-টিকে বর্জন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত তাকেই

রোজাদার বলা হয়। আরবিতে তাকে বলা হয় সায়েম। ইহাই রোজার তথা সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য। মূল উদ্দেশ্যটিকে সামনে রেখে যে ব্যবস্থাপত্রটি দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থাপত্রটিতে নানা প্রকার আদেশ-উপদেশ থাকে। কারণ যে কোনো মূল বিষয়টিকে প্রয়োগ করতে গেলে ব্যবস্থাপত্রে অনেক রকম আদেশ-উপদেশ থাকতে বাধ্য। মনে রাখতে হবে যে, ব্যবস্থাপত্রের আদেশ-নিষেধগুলোর পেছনে যে মূল উদ্দেশ্যটি আছে উহা যেন ভুলে না যায়। মূল উদ্দেশ্যটি ভুলে গেলেই অথবা গুরুত্ব না দিলেই বিষয়টি কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতার বলয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং

অনুষ্ঠানগুলোকেই মূল বিষয় মনে করে মতভেদের উদ্ভব হয়। এই মতভেদ জন্ম দেয় নানা প্রকার ফেরকাবাজির। তখন সমাজ জীবন এবং জীবন পরিচালনার দর্শনগুলো ফেরকাবাজিতে ডুবে যায় এবং বাকবিতণ্ডা ও ঝগড়াঝাঁটি করে মূল বিষয়টি হতে অনিচ্ছায় বহু দূরে সরে পড়ি। অধম লিখক যেমন বললান যে, নফসের ভেতর খান্নাসরুপী শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার সাধনার নামটি হল সিয়াম, কিন্তু অন্য গবেষণা হয়তো একথাটি এভাবে না বলে অন্যভাবে বলবে। বলবে দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে। বলবে তাপ্তত ত্যাগ করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো, দুনিয়া বলতে কী বুঝায়? দুনিয়া বলতে কিছু এই পৃথিবী নামক গ্রহটিকে পরিত্যাগ করার কথাটি মোটেই বলা হয় নি। কারণ দুনিয়া

বলতে আপন নফ্সের স্বেচ্ছাচারটিকে বুঝানো হয়েছে। নফ্সের এই স্বেচ্ছাচারটি কেমন করে আসতে পারে? যখন নফ্সের সঙ্গে খাল্লাসরূপী শয়তানটিকে জড়িয়ে দেওয়া হয়। কেন খাল্লাসরূপী শয়তানটিকে একটি পবিত্র নফ্সের সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়? জড়িয়ে দেওয়া হয় এই জন্য যে, একটি নফ্স তথা একটি মানুষ কি আল্লাহকে চায়, না চায় না, এই আল্লাহকে চাওয়া আর না-চাওয়ার নামটিই হল পরীক্ষা। এই পরীক্ষাটির জন্যই মানুষকে বানানো হয়েছে। এই পরীক্ষাটি একমাত্র মানুষ ও জ্বীন ছাড়া আর কাউকেই দিতে হয় না। ফেরেষ্টা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, যতই হিয়া হয়া করতে পারুক না কেন, কিছু ফেরেষ্টাদের পরীক্ষা দিতে হয় না। কারণ হলো, ফেরেষ্টাদেরকে আল্লাহ নফ্স এবং রুহ একটিও দেন নাই। নফ্স এবং রুহ দুটো একত্রে থাকলেই পরীক্ষাটি অবধারিত। যাদের কেবলমাত্র নফ্স আছে, কিছু রুহ নাই, তাদেরকেও পরীক্ষা দিতে হয় না এবং পরীক্ষা দেবার বিধানটি রাখা হয় নি। কারণ যদি রুহ না থাকে এবং কেবলমাত্র নফ্সটিই থাকে তা হলে সেই জীবগুলোকে মানুষ এবং জ্বীন জাতির মধ্যে গণ্য করা যায় না এবং যাবে না। সেই জীবগুলো হয়ে যাবে তখন অনেক রকম জানোয়ার এবং অনেক রকম পাখি। মানুষ এবং জ্বীন ছাড়া কোনো পশু, কোনো পাখি, কোনো মাছ অথবা মাছ জাতীয় কোনো প্রাণীকেই রুহ দেওয়া হয় নি। কারণ রুহ আল্লাহর আদেশ। আল্লাহর আদেশ আল্লাহ হতে আলাদা

নয়। সুতরাং ঢাকনা খুলে যদি বলতে হয় তো বলতে হয় যে, রুহ স্বয়ং আল্লাহ। মানুষের মাঝে এবং জ্বিনের মাঝে রুহ আছে বলেই সেফাতি নূরের তৈরি রোবট ফেরেস্টাদেরকে আদমকে সেজদা দেবার আদেশটি দেওয়া হল। সেফাতি নূরের তৈরি আল্লাহর রোবট নামক ফেরেস্টাগুলোর সবাইকে আদমকে সেজদা দিতে বলা হলো এবং সবাই সেজদা করলো এবং সেজদা করতে বাধ্য হলো। কারণ, ফেরেস্টাদের নফসও নাই এবং রুহও নাই, তথা ভালো-মন্দ বিচার করার সীমিত (মৃত্যুর আগ পর্যন্তকে সীমিত বলা হয়) স্বাধীনতাটাই দেওয়া হয় নাই। যেহেতু আজাজিল জ্বিন জাতি হতে আগত এবং আজাজিল মোটেই ফেরেস্টা নয়, যদিও আজাজিলকে ফেরেস্টাদের সরদার বানানো হয়েছিল এবং সরদার এ জন্যই আল্লাহ বানিয়েছেন যে আজাজিলের মধ্যে নফসও ছিল, রুহও ছিল। আজাজিল নফস এবং রুহের অধিকারী বলেই ফেরেস্টাদের সরদার বানিয়েছেন, নতুবা সরদার বানাবার প্রশ্নই উঠে না।

অনেক গবেষক এই অতি সূক্ষ্ম বিষয়টি ধরতে পারেন না বলেই এটা সেটা বলে একটা গোঁজামিলের খিস্তি তৈরি করেন এবং না বুঝলে খিস্তি তৈরি করতে বাধ্য। সব শিয়াল যখন একই রকম শব্দ করে তখন এত শব্দের মাঝে আসল বিষয়টা চাপা পড়ে যায়। আজাজিল যেহেতু নফস এবং রুহ দুটোরই অধিকারী সেই হেতু সীমিত স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির

অধিকারী। তাই আজাজিল আদমকে সেজদা দেয় নাই। যেহেতু ফেরেষ্টাদের ওপর সেজদা দেবার হুকুমটি আজাজিলের ওপরও পড়েছিল তথা বর্তিয়েছিল সেই হেতু আজাজিলকে ইবলিসে পরিণত হতে হয়েছিল। বালাসা অর্থ অহকার। যদিও বালাসা শব্দটি আরবি নয়, বরং হিব্রু শব্দ এবং হিব্রু ভাষায় অহকারকে বালাসা বলা হয় এবং যে বা যিনি অহকার করে বা করেন সে বা তিনি অহকারী তথা ইবলিস। জ্বিনের মধ্যে যেমন অহকার করার অধিকারটি দেওয়া হয়েছে সে রকম মানুষের মাঝেও অহকার করার অধিকারটি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ফেরেষ্টাদেরকে অহকার করার অধিকারটি দেওয়া হয় নাই, কারণ ফেরেষ্টাদের মাঝে নফসও নাই রুহও নাই। তাই ফেরেষ্টাদেরকে আল্লাহ পাকের সেফাতি নূরের তৈরি রোবটও বলা যেতে পারে। ফেরেষ্টাদেরকে যেটুকু শক্তি ও ক্লমতা দেওয়া হয়েছে সেটুকুর বাহিরে একটি পা ফেলবার প্রশ্নই উঠে না। তাই তো আমরা দেখতে পাই যে, মহানবী যখন মেরাজে যাচ্ছেন ফেরেষ্টা জিবরিল তখন সিদরাতুল মুনতাহায় এসে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন যে, আর একটি পা এগিয়ে যাবার অধিকারটি তাকে দেওয়া হয় নাই। মহানবী লা মোকাম্মে চলে গেলেন আর ফেরেষ্টা জিবরিল সিদরাতুল মুনতাহায় দাঁড়িয়ে রইলেন। এত বড় জলজ্যান্ত বিষয়টি জানবার পরও কী করে মহানবীকে মাটির তৈরি বলে ওহাবিরা প্রচার করে! এরা গাছের শিকড় কেটে মাথায় পানি ঢালে। ফেরেষ্টারা আল্লাহর সেফাতি

নূরের তৈরি হয়েছে আদমকে সেজদা করতে হয়েছে, কারণ আদমের ভেতর জাত নূরটি মগজুদ। তাই আল্লাহ বলছেন যে, ‘আমরা তোমার শাহারগের নিকটেই আছি।’ কিন্তু আল্লাহ কখনোই একথাটি বলেন নি যে, ফেরেস্টাদের

শাহারগের নিকটে আছেন, অথবা জীব-জন্তুদের শাহারগের নিকটে আছেন, অথবা নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বতের নিকটেই আছেন। আল্লাহর এই অবস্থানটি জাত-রূপে অবস্থান। তাই তিনি কেবলমাত্র মানুষ এবং জ্বিনের সঙ্গেই জাত-রূপে অবস্থান করতে পারেন। আর তাঁর সৃষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু সেফাতি নূর এবং নূরের অনেক রকম বিবর্তনের ধারা বজায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। তাই আল্লাহ বলছেন যে, ‘তুমি যদিকেই তাকাও না কেন, আমি ছাড়া আর কিছুই নাই।’ আল্লাহ ছাড়া কিছুই নাই যেখানে বলা হলো সেখানে নাস্তিক্যবাদ আসে কেমন করে? কারণ নাস্তিক্যবাদ বিষয়টিই তো একটা বিরাট আত্মার রোগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আসলে নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাসী নাস্তি কেঁরা আল্লাহর এই বিষয়টি অবগত নয়। যদি বিষয়টি ভাল করে বুঝতো তো তওবা করে নাস্তিক্যবাদটি পরিত্যাগ করতো। আসলে মূল বিষয়টি বুঝতে না পেরেই নাস্তিক্যবাদের প্রচার করে।

রোজা কী বর্জন করতে শেখায়? একটি প্রশ্নে গবেষকদের মতামত এক নয়। এতে দুঃখ অথবা বিস্ময় প্রকাশ করার কিছুই নাই। কারণ গবেষণার জ্ঞানটি আন্তরিক কিছু কিছুটা তো মতভেদ থাকবেই। কোরান তফসির, হাদিসের ব্যাখ্যা, এজমা, কেয়াস, প্রতিটি বিষয়ের গবেষণার জ্ঞানটিতে আমরা অনেক রকম মতভেদ দেখতে পাই এবং এই মতভেদটিকে স্বাভাবিক মনে করেই নেওয়া হয় এবং এর মাঝে কোনো প্রকার জোর তথা বলপ্রয়োগ খাটাবার প্রশ্নই উঠে না। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা যায়। যেমন অনেক গবেষক বলেন যে, রোজা তাপ্তত পরিত্যাগ করতে শেখায়। অনেকে আবার তাপ্ততের সঙ্গে জীবতে পরিত্যাগ করতে শেখায়। এখন প্রশ্নটি হল, তাপ্ততই হোক আর জীবতেই হোক, এদের থাকবার স্থানটি কোথায়? তাপ্তত আর জীবতে থাকবার বাসাবাড়িটি কোথায়? সৃষ্টিরাজ্যের কোথাও তাপ্তত এবং জীবতে বাস করে না, কারণ সৃষ্টিরাজ্য তৌহিদে বাস করে। তৌহিদের রাজ্যে তাপ্ততও থাকতে পারে না এবং জীবতেও থাকতে পারে না। আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে মাত্র দুইটি স্থানে বা জায়গায় তাপ্তত এবং জীবতে বাস করে। একটি জ্বিনের অন্তর তথা হৃদয় এবং অপরটি মানুষের অন্তর। এই দুটো প্রাণী-জ্বিন এবং মানুষ ছাড়া আর কোথাও এইসব বাজে বিষয় থাকতে পারে না এবং থাকার আইনও নাই। সুতরাং শব্দ এবং অর্থ ভিন্ন, কিছু থাকবার স্থানটি মানুষ এবং জ্বিনের অন্তর। আবার অনেক গবেষক

বলেন যে, রোজা বর্জন করতে শেখায় লোভ, মোহ, হিংসা, অহঙ্কার এবং সর্বপ্রকার অবৈধ কাজ। প্রশ্ন করতে পারেন যে, আমরা কি রোজার সাধনাটি করে এতগুলো আবর্জনা দূর করতে পেরেছি? এমন কথাটিও তো মহানবী সোজা বলে দিয়েছেন যে, যারা রোজা থেকে মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয় তাদের রোজাগুলো নিতান্ত উপবাস ছাড়া আর কিছুই নয় (হবহ নয়)।

আবার যদি প্রশ্ন করা হয় যে, দুনিয়া, তাগুত, জীবতে, লোভ, মোহ, হিংসা, অহঙ্কার এবং খান্নাসরূপী শয়তানটিকে তাড়াতে পারলো না অথচ সারা জীবন প্রতি বছর ত্রিশটা রোজা রেখে গেল তাদের রোজার ফলটি কী হবে? উত্তরটি আল্লাহর হাতেই ছেড়ে দেওয়া হলো। নিরাশ শব্দটি উচ্চারণ করলাম না তবে ফলটি যে কী হবে তা সবাই কমবেশি বুঝতে পারে। প্রতিটি বিষয়ের একটি উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু উদ্দেশ্যটিকে বাদ দিয়ে কাজ করলে কী হয় বা হবে তা সবাই বুঝতে পারে। মানুষ এত কচি খোকা নয় যে কিছুই বুঝতে পারে না। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে, মানুষ ভালো করে বোঝে যে ধূমপান শরীরের জন্য ক্ষতিকারক, কিন্তু তবু ধূমপান করছে। বিষয়টি ভালো করে বোঝে অথচ বুঝেও কচি খোকার মত না বোঝার ভান করে। এই মানুষ যে কত রকম রং তামাসা করতে জানে এবং করে চলছে তার হিসাব কে রাখে

আর এর হিসাব রেখেই বা লাভ কিসের? উপদেশের ফলটি যখন শূন্য তখন উপদেশ দেবার উৎসাহটি দুর্বল হয়ে পড়ে। ধর্মের বাণী প্রতিদিন রেডিও-টেলিভিশনে, মাইকে, ওয়াজ মাহফিলে, নামাজের খোৎবায়, পথে ঘাটে শোনানো হচ্ছে, কিন্তু লোভ-মোহের কালো অন্ধকারে সব বিষয়গুলো ঢেকে যায়। সূর্যগ্রহণ আর চন্দ্রগ্রহণের মত আস্তে আস্তে মহৎ বিষয়গুলো গিলে ফেলে। সাপ যেমন হুঁদুর গিলে খায়, কুমির যেমন আস্ত একটা মুরগি গিলে খায় তেমন লোভ-মোহের সর্প আর কুমির মানুষের মহৎ গুণগুলোকে গিলে খায়? কেন গিলে খায়? কেন মহৎ উপদেশগুলো মানতে চায় না? কেন প্রয়োজনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি পেয়েও কেবল পেতেই চায়? এই এত পাবার প্রচণ্ড নেশাটি কোথা হতে এল? উত্তর মাত্র একটি। মূল বিষয় মাত্র একটি। সেই উত্তর আর মূল বিষয়টি কী? প্রতিটি মানুষের অন্তরে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ পাক খান্নাসরুপী শয়তানটিকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এই খান্নাসরুপী শয়তানটি কখনো ইবলিসরূপ ধারণ করে অহংকার করে। এই ইবলিস রূপটি যদি ভয়ঙ্কর হয় তাহলে মানুষের রূপটিও ভয়ঙ্কর হয়। হিটলার, মুসোলিনি, চেঙ্গিস, হালাকু, হাঙ্গাজ বিন ইউসুফ আর জারারেসের মত মানুষরূপী দানবের চেহারাটি ইতিহাসের পাতায় কলঙ্কের কালিতে লিখা হয়ে থাকে। আবার এই খান্নাসরুপী শয়তানটি কখনো মরদুদরূপ ধারণ করে

সীমাহীন লোভীতে পরিণত হয়। এমনই লোভ যে লোভের সীমা নাই, শেষ নাই। যেমন আলেকজান্ডার দি গ্রেট। পৃথিবীটাই খেয়ে ফেলার মহাপরিকল্পনা যার অন্তরে বাসা বেঁধেছিল। এ রকম লোভীদেরকে যদি সমগ্র পৃথিবী নামক গ্রহটা দিয়ে দেওয়া হয়, হয়তো বলবে আর একটা পৃথিবী কি আছে? সব বিষয়ের একটা না একটা তলা থাকে, কিন্তু লোভের কোনো তলা নাই। এইসব ভয়ঙ্কর লোভীদের ঠিকানা হাবিয়া নামক নরক। হাবিয়া নরকটি কী ও কেমন? হাবিয়া হলো এমন একটি গর্ত যে গর্তে কেবল পড়তে থাকবে, কিন্তু তলা পাবে না তথা তলাহীন একটি গর্ত। কী ম্লেচ্ছাজি তথা রূপক ভাষায় হাবিয়ার বর্ণনা! এই খান্নাসরুপী শয়তানটি যখন কেবলই শয়তানরূপটি ধারণ করে তখনই পাথরের আঘাত খেতে হয়। শয়তান মানুষের অন্তরে বাস করে মানুষের দেহে কত যে প্রতিদিন প্রতিঘণ্টায় পাথরের আঘাত খেয়ে যাচ্ছে তার হিসাব নাই। অথচ মানুষটি এই পাথরের আঘাতগুলো টের পেয়েও পায় না। এ যেন ক্যানসারের উপর রেডিয়ামের থেরাপি। রোগী টের পায় না, অথচ ক্যানসার ক্রমটিকে পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। শয়তান প্রতিনিয়ত পাথরের আঘাত খেয়ে চলছে আর মানুষের চেহারায তা আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে, কিন্তু বুঝতে পারে না। কী বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আঘাত খাবার ব্যবস্থাপত্রটি দিয়ে রেখেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। তাই হয়তো বলা হয়, যেমন কর্ম তেমন ফল। কর্মের ফলটি যে ভোগ করতেই

হবে তা এ জন্মে হোক অথবা আর এক জন্মে। (কোরান দর্শন-সদরউদ্দিন আহমদ চিশতী)।

প্রথমেই এই কথাটি বলে রাখা ভালো যে, রোজায়ে মেজাজি এবং রোজায়ে হাকিকি বিষয়টি জানতে হবে। হাকিকি রোজার বিষয়টি আমরা খাজা বাবার আসরারে হাকিকি নামক গ্রন্থ হতে তুলে ধরবো যাহা পরম শ্রদ্ধেয় জেহাদুল ইসলাম সাহেব বহু পরিশ্রম করে খাজা বাবার ফারসি ভাষায় রচিত রচনা সমগ্র দিওয়ানে মুইনুদ্দীন নামক গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সুফিবাদে বিশ্বাসীদের জন্য একটি বিশেষ নজরানা দিয়ে গেছেন।

রহস্যের জ্ঞান লাভের উপায় মোরাকাবা

এত কথা এত বিষয় এত বিভিন্নতা এত উপমা এত ব্যাখ্যা আর বিশ্লেষণ কেন করছি? মাত্র একটি বিষয়ের জন্য। মাত্র একটি উপদেশ দেবার জন্য। কারণ বিষয় যে একটি, উপদেশ যে একটি, আদর্শ যে একটি, নীতি যে একটি, প্রেম যে একটি, শেষ কথাটি যে একটি। কেউ বুঝতে পারে, কেউ পারে না। কেউ ধরতে পারে, কেউ পারে না। কেউ ভুবে যায়, কেউ ভেসে থাকে। কেউ বেশি বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিকারী হয়েও এগিয়ে যেতে পারে না। কেউ কম বুদ্ধি ও জ্ঞানের অধিকারী হয়েও

এগিয়ে যায়। কী এমন রহস্যটি এত কথার মাঝে লুকিয়ে আছে তা বুঝাবার জন্য সাহস করে এগিয়ে যায়।

কী এমন রহস্যটি এত কথার মাঝে লুকিয়ে আছে বুঝতে পেরেও সাহস করে এগিয়ে যেতে পারে না। কেন পারে না? উত্তরটি হলো তকদির! সাহস করে কোথায় এগিয়ে যেতে হবে? ধ্যানসাধনা করার জন্য নির্জন হেরাণ্ডহার মত কোনো এক নির্জন স্থানে। এখানেই পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন। যিনি পথ দেখাবেন, যিনি অজ্ঞানতার অন্ধকার হতে আলোর পথটি দেখাবেন তিনিই তো গুরু। তিনিই তো পীর-মুর্শিদ। তিনিই তো বাবা। তাই তো সুলতানুল হিন্দ খাজা বাবা, যার শান মান এত উর্ধ্বে, যে কোরানের বর্ণিত সকল নবী-রসুলেরা মিলে যত মুসলমান বানাতে পেরেছেন তার চেয়ে অনেক অনেক মুসলমান অখণ্ড ভারতে আট শত বছর আগে চার কোটি লোকের বাসস্থান হতে নব্বই অথবা বিরানব্বই লক্ষ মুসলমান একা বানিয়ে গেছেন, সেই খাজা বাবা আসরায়ে হাকিকি নামক গ্রন্থে উপদেশের ভাষায় বলেছেন যে, ‘মনে রেখো, যে ব্যক্তির পীর-মুর্শিদ বা পথ প্রদর্শক নাই, তার কোনো ধর্মই (দ্বীন) নাই। যার ধর্ম (দ্বীন) নাই, তার মারোফতে এলাহি নাই। যার মারোফতে এলাহি নাই, সত্যপথের পথিকদের সাথে তার সম্পর্ক নাই। সত্যপথের পথিকদের সাথে যার সম্পর্ক নাই, তার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী নাই। যার শুভাকাঙ্ক্ষী

নাই, তার কোনো বন্ধু বা মাওলা নাই।' (দিওয়ানে মুঈনুদ্দীন : জেহাদুল
ইসলাম)।

মহানবীর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ : যে দুনিয়াতে অন্ধ থাকবে সে
পরকালেও (আখেরাতে) অন্ধ থাকবে। এই উপদেশটি আমরা কোরানেও
পাই। অথচ এই কথার আসল রহস্যটি অনেকেই বুঝতে পারে না।
দুনিয়ার জীবনে আপন পবিত্র নফসের সঙ্গে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে
নিয়েই মারা গেলে পরকালে কী হতে পারে তা তো বুঝাই যায়।
খান্নাসরূপী শয়তানটিকে পবিত্র নফস হতে কেমন করে তাড়িয়ে দিতে
হবে তারই আর একটি ব্যবস্থাপত্রের নাম রোজা। রোজার বিষয়ে
কোরানের আদেশ-নিষেধ, রোজার বিষয়ে হাদিসে অনেক কথা বলা
হয়েছে, তবু কয়জনে মেনেজাজি রোজার সঙ্গে যে হাকিকি রোজার কথাটি
আছে তাহা ধরতে এবং বুঝতে পারে? মেনেজাজি দিয়েই হাকিকি বুঝতে
হয়, আর এই বিষয়টি বুঝবার জন্য মহানবী কতভাবে বুঝিয়েছেন।
অনেকে মেনেজাজি রোজাকেই একমাত্র রোজা মনে করে। আবার অনেকে
হাকিকি রোজার রহস্য বুঝতে পেরে মেনেজাজি

রোজার বিষয়টি এড়িয়ে যায়। এই মেনেজাজি রোজার যে কত বড়
প্রয়োজন কেবল হাকিকি রোজার বিষয়টি অনুধাবন করতে, তাহা মেনে
নিতে হয়। কতবার বলেছি যে, মূর্ত না থাকলে বিমূর্তটি ধরা বড়ই
কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।

এই দুনিয়াতে থেকেই রহস্যলোকের বিষয়টি জানতে হবে। যিনি বা যারা এই রহস্যলোকের বিষয়টি অবগত আছেন তাদের কাছে গিয়ে বিষয়টি ভালো করে জেনে নিতে হবে। নতুবা জানবার তো আর কোনো উপায় খুঁজে পাই না। কেমন করে ধ্যানসাধনা করতে হবে তথা মোরাকাবাটি করতে হবে তা জেনে নিতে হবে। কতদিন ধ্যানসাধনা করলে রহস্যলোকের সামান্য কিছু নিদর্শন দেখতে পাব অথবা বুঝতে পারবো সেটাও জেনে নিতে হবে। কোরান প্রথমে একশত বিশ দিন ধ্যানসাধনা করতে বলেছে এবং বলেছে যে ধ্যানসাধনার পর বুঝা যাবে যে আল্লাহ কোথাও পরাভূত নয়। সুতরাং একশত বিশ দিন মোরাকাবা করার পর যদি কোনো নমুনা দেখতে না পাই তো আপনাকে ছেড়ে অন্য গুরু ধরতে বাধ্য হব। কারণ গুরু ধরাটা এখানে মুখ্য নয়, বরং আল্লাহর রহস্যলোকের কিছুটা জ্ঞান অর্জন করাটাই মুখ্য। আমি যদি রহস্যলোকের কিছুই বুঝতে ও জানতে না পারি তো গুরু ধরে লাভটা কী হবে? গুরু যদি পথ দেখিয়ে দেবার পর সেই পথে অগ্রসর হয়ে কিছুই বুঝতে না পারি তো এই গুরুর আর প্রয়োজন থাকে না। বরং অন্য গুরুর সন্ধান করা উচিত, যার উসিলাতে রহস্যলোকের কিছুটা বুঝতে পারবো। আগের দিনের ওলিরা গুরুর কথামতো মোরাকাবা করে রহস্যলোকের বিষয়টি অবগত হতে না পারলে গুরুকে সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করে অন্য গুরুর আশ্রয়ে চলে গিয়ে ধ্যানসাধনা করতেন।

ফরিদউদ্দিন আঠারের লিখা তাজকেরাতুল আউলিয়া নামক গ্রন্থে দেখতে পাই যে, একজন সাধক কয়েকবার পীর বদলিয়েছেন। এখানে পীর বড় নয়, বরং রহস্যলোকের জ্ঞান অর্জন করাটাই বড়। প্রত্যেক সাধক ভালো করেই জানেন যে, বই পড়ে এই জ্ঞান অর্জন করা যায় না, কারণ এই জ্ঞানটি মাতার জ্ঞান নয়, বরং এই জ্ঞানটি সম্পূর্ণ সিনার জ্ঞান। সিনার জ্ঞানটি যার জানা আছে কেবল তার কাছেই সিনার জ্ঞানটি পাবার আশা করা যায়। চুক্তির বিষয়টি প্রকাশ্যে না থাকলেও গোপনে শক্ত চুক্তি থেকে যায়। আপনার কথামতো ধ্যানসাধনা করে যদি কাঁচকলা পাই তো আপনার মুরিদ হয়ে কেন থাকতে যাবো? এখানে এসেই অনেক মুরিদ বিরাট ভুলটি করে ফেলেন এবং বাহারি ফতোয়া আবিষ্কার হয়ে যায়। যেমন, একবার পীর ধরলে আর বদলাবার বিধান নাই, ক্রতি হতে পারে, অভিশাপ লেগে যেতে পারে ইত্যাদি বাহারি ফতোয়ার ভয় দেখানো হয়। আমি পীর দিয়ে কী করবো যদি মারেফতের গোপন বিষয়টির কিছুই জানতে না পারলাম? অবশ্য এটাও সত্যকথা, এ রকম পীর পাওয়াটা ভাগ্যের ব্যাপার। যদি কোনো পীর সাহস করে বলতে পারে যে, আসো, বসো, মুরিদ হও, মোরাকাবার বিষয়গুলো বুঝে নাও। তারপর মাত্র একশত বিশ দিন মোরাকাবা করো এবং একশত বিশ দিন মোরাকাবাটি করে যদি রহস্যলোকের কিছুই জানতে পারলে না, বুঝতে পারলে না, তা হলে আমাকে ফেলে দিয়ে

এবং অন্য পীরের কাছে চলে যেয়ো। এ রকম খাড়াদারা কথা বলার মত পীর থাকলে যারা ওহাবি অথবা অধ্যাত্মবাদ মানেন না তারাও বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য অবশ্যই এগিয়ে আসবেন। বাবা শেখ ফরিদের মুরিদ ও খলিফা বাবা বু আলী শাহ কলন্ডর এ রকম খাড়াদারা কথাই কেবল বলেন নি, বরং সোজা বলে দিয়েছেন যে, যদি আমার কথা মতো মোরাকাবা করে কিছুই না পাও তো দুই হাতে দুইটি পাথর নিয়ে আমার মাজারে ছুড়ে মেরে দিয়ে বলে দিয়েো যে, কলন্ডর মিথ্যুক। কলন্ডরের মোরাকাবার আংশিক আশ্মি সুফিবাদ আত্মপরিচয়ের একমাত্র পথ নামক বইতে লিখে দিয়েছি। কিন্তু পুরোটা লিখে দেই নি। পুরো মোরাকাবাটি কেবলমাত্র মুরিদ ও খলিফারাই জানে। তাদের কাছে মুরিদ হয়ে মোরাকাবার বিষয়টি জেনে নিয়ে একবার ধ্যানসাধনাকে করেই দেখুন না! তবে অপ্রিয় বিষয়টি হলো, বাবা বু আলী শাহ কলন্ডর শরিয়তের কোনো বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দেন নি এবং কলন্ডররিয়া তরিকায় শরিয়ত বিষয়টির কোন প্রাধান্য পায় নি। আবার অনেক পীর সাহেব শরিয়তের প্রাধান্যটি বেশি দিয়ে গেছেন। আসল কথাটি হলো, আসল বিষয়টি জানতে চাই, দেখতে চাই। তাই বু আলী শাহ কলন্ডর বলেছেন, যে ইম্মান কিছু দেখে নাই সেই ইম্মানে দুর্বলতা আসতে পারে, কিন্তু যে ইম্মান প্রত্যক্ষভাবে কিছু দেখে ফেলেছে সেই ইম্মানে দুর্বলতা আসার প্রশ্নই উঠে না। ইংরেজিতে একটা কথা

আছে-সেই বিশ্বাসের কোনো মূল্য থাকে না যে বিশ্বাসের মাধ্যমে কিছু পাওয়া না যায়। শরিয়ত বিষয়ের হাদিসগুলো তো মহানবীর সাহাবা হজরত আবু হোরাযরা বলে দিয়েছেন, কিছু মারফত বিষয়ের একটি হাদিসও তিনি প্রকাশ্যে বলে যান নি। হজরত ইবনে আব্বাস, হজরত হজায়ফা, হজরত আবু জর গিফারি এ রকম বহু জলিল কদেরের সাহাবারা মারফত বিষয়টি তাদেরকেই বুঝিয়েছেন এবং দিয়ে গেছেন যারা বুঝবার এবং পাবার যোগ্য। অপাত্রে দিতে গেলে সমূহ বিপদ থাকতে পারে। এ যুগেও তো কত নকল বাবা দেখতে পাই। যেমন, মাটি বাবা, জুতাবাবা (হুমায়ুন আহমদের নাটক) নাম নিয়ে কত বাবার সমাবেশ। তাই বলে যারা আসল বাবার উপযুক্ত তাদের কথা বলাই বাহুল্য। চুন খেয়ে মুখ পুড়ে গেল বলে সাদা দই (রং করা দই নয়) দেখে ভয় করে এবং করাটা স্বাভাবিক। এ রকম আজব বাবাদের দেখে সুফিবাদটাই ফেলে দেবেন-এটা কি ঠিক? তা ছাড়া যারা গুরুবাদে বিশ্বাস করেন না তারা তো এদের দেখে বিরাট ছুতানাতা পেয়ে যায় এবং সুফিবাদের কথা শুনলে দাঁত বের করে দার্শনিকদের মত ওজনি হাসি মারে। হায়রে খোদা! পীরের মত পীরের পাল্লায় পড়লে এবং মোরাকাবা করতে পারলে এরা যে কী ভয়ঙ্কর ভক্ত হয়ে যায় তা দেখলে অবাক হতে হয়। এমন মানুষটিও দেখেছি যে, পীর-ফকিরদের নাম গন্ধটি শুনতে পারতেন না এবং ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন; যখন

চার মাস মোরাকাবা করলেন এবং মোরাকাবা করার পর যে কী কান্না আর অনুশোচনা! এখন তো তিনি একটার পর একটা মোরাকাবা করে যাচ্ছেন এবং পরে জানতে পারলাম যে, উনি আর বিয়ে করছেন না। ভাবতেও অবাক লাগে—আল্লাহ পাক কী না পরিবর্তন এনে দিতে পারেন!

এই মোরাকাবাটি খান্নাসকে তাড়াবার মোরাকাবা। এই মোরাকাবায় বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়াটা কমিয়ে দেয়, কারণ এটা বৈষয়িক চাওয়া-পাওয়ার অদম্য নেশাটিকে চুরমার করে দেয়। সুতরাং যাদের আকাঙ্ক্ষা কেবলই বৈষয়িক বিষয়ের প্রতি তাদের এই জাতীয় মোরাকাবাটি না করাই ভাল। ইমামুল আউলিয়া হজরত বায়েজিদ বোস্তামি তাঁর মুরিদদেরকে মোরাকাবা করার তালিম তথা শিক্ষা দিতেন। মুরিদরা মোরাকাবা করার পর বায়েজিদের সামনে আসলে বলতেন, বাবা কী কী হারাতে পেরেছ? আর আজ? আজ আমাদের বলতে হয়, কী কী পেয়েছ? কেন বলতে হয়? হতাশার বাণীটা শুনতে চায় না। পাবে কথাটি জানলে সাধকেরা খুশি হয়। মোরাকাবা ছাড়া যে ধর্মের এক বোঝা কথা শেখা যায়, অন্য দশজনকে এটা সেটা বলে হারিয়ে দেওয়া যায়, দলিল প্রমাণ জোগাড়-করা কথার মহাপণ্ডিত হওয়া যায় এবং সব কিছু মনে যাবার পর পাওয়া যাবার কথাটি শুনতে হয়, তখন বাকিতে কেনা-বেচা

চলে। আজকাল সব ধর্মেই চলে বাকিতে কেনা-বেচা। মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করতে পারলে সাধক বুঝতে পারে যে দর্শনের ইম্মানটি আর হাসতে হাসতে অথবা দেখতে দেখতে অথবা কথায় কথায় চলে যাবার কোনো ভয় থাকার প্রশ্নই উঠে না। (সিররে হক জাম্মে নূর : বাবা জ্ঞান শরিফ শাহ সুরেশ্বরী)। যে ইম্মান অন্ধ বিশ্বাসের ভিত্তির উপর দাঁড়ানো সেটা যে কোনো সময় ভেঙ্গে যেতে পারে, যে কোনো সময় দুর্বল হয়ে যেতে পারে, কারণ এই প্রকার ইম্মানটি হল রহস্যলোকের কিছুই দেখতে না পাওয়া ইম্মান। আর রহস্য লোকের কিছু দেখবেই বা কী করে? রহস্যলোকের ধ্যানসাধনাটিই তো জীবনে একবারও করে নি। এই রকম ইম্মান যাদের আছে অথবা এ রকম ইম্মানের অধিকারীদেরই কোরান আম্মানু বলেছে। তাই আম্মানু আর মোম্মিন এক নয়। কারণ মোম্মিনের সঙ্গে আল্লাহ আছেন। কিন্তু আম্মানুর সঙ্গে আল্লাহ আছেন এমন কথাটি পুরা কোরানের কোথাও নাই।

মহানবী জগতবাসীকে আল্লাহর ঘর কাবাটির পরিচয় করিয়ে দিলেন। কাবার মরতবা জানিয়ে দিলেন। অথচ মহানবী কাবা শরিফে ধ্যানসাধনার মোরাকাবাটি করলেন না। ধ্যানসাধনার মোরাকাবাটি জাবালুন নূর পর্বতের আড়াই হাজার ফিট উঁচুতে এক অন্ধকার মহানির্জন হেরাণ্ডহায় ধ্যানসাধনাটি করতে গেলেন। মহানবীর এই পনের

বহুরের ধ্যানসাধনাটি কি প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ না সুন্নত? এই কথাটি আমরা আলেমদের মুখে কেন শুনতে পাই না? কেন আলেমেরা বলেন না যে, মহানবীর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি মনে রেখে আমাদের জীবনেও একবার কম করে হলেও কিছুদিন ধ্যানসাধনাটি করা উচিত? আরও মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহর ঘর কাবা শরিফে কোরান নাজেল হয় নি। কোরান সর্বপ্রথম নাজেল হয়েছে মহানির্জন একটি অন্ধকার গুহায়, যাহা ভূপৃষ্ঠ হতে আড়াই হাজার ফুট উঁচুতে। আবার সেই পবিত্র কোরানটি নাজেল হয় রমজান মাসে। এসব ঘটনা মহানবীর জাহেরা নবুয়ত পাবার আগের ঘটনা। এটা সবাই কমবেশি জানে। রমজানের রোজা রাখার ব্যবস্থাপত্রটি তো নবুয়ত পাবার পর দেওয়া হলো। তা হলে রমজান মাসে কোরান নাজেল হবার রহস্যটি কোথায়? তারপর আরও এক ধাপ এগিয়ে বলা হয়, কদর রাত্রিতে কোরান নাজেল হয়েছে। অবশ্যই কোরান কদর রাত্রিতে নাজেল হয়েছে। তা হলে কদর রাত্রি বলতে কী বুঝায়? কদর অর্থ যদি শক্তিশালী রাত্রি হয় তা হলে শক্তিশালী বলতে কী বুঝায়? সব রাত্রিই তো সমান, কিন্তু শক্তিশালী রাত্রিতে কোরান নাজেল হবার গোপন রহস্যটি বলতে কী বুঝায়? বলা হয়েছে শক্তিশালী কদর রাত্রিতে কোরান নাজেল হয় তথা বর্তমান কালের তথা প্রজেক্ট ইনডেফিনিট টেসে কেন বলা হলো? কেন বলা হলো না যে, কদর রাত্রিতে কোরান নাজেল হয়েছিল তথা অতীত কালটি তথা পাস্ট

ইনডেফিনিট টেসটি কেন ব্যবহার করা হলো না? এই শক্তিশালী তথা কদর রাশিটি কি কোনো আধ্যাত্মিক শক্তিশালী রাশি? নৈসর্গিক রাশি কেমন করে শক্তিশালী হয়? নৈসর্গিক রাশিতে ঝড়-তুফান, সুনামি, হারিকেন, টর্নেডো আর ভূমিকম্প হলেও তো সেই বিশেষ রাশিটিকে আজ পর্যন্ত কেউ শক্তিশালী রাশি বলে না বা বলার কোনো রেওয়াজ দেখতে পাই না? তা হলে এই কদর তথা

শক্তিশালী রাশি বলতে কী কী বুঝাতে চেয়েছে? গবেষণা করুন, নিরপেক্ষ হয়ে গবেষণা করুন, ফেরকাবাজির সাইনবোর্ড ফেলে দিয়ে গবেষণা করুন—এই কদর রাশি বলতে কী বুঝানো হয়েছে। গৌজামিলের উত্তরটি আর চাই না। বহু গৌজামিলের বাহ্যিক কথা শুনেছি। তবে একটি কথা পাঠক বাবাদের জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য মনে করলাম আর সেটা হলো, শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতীর সূরা কদরের ব্যাখ্যাটুকু পড়ে দেখতে পারেন : হয়তো কদর রাশির রহস্যটি কী তা কিছুটা হলেও জানতে এবং বুঝতে পারবেন বলে আশা করি।

মোরাকাবা তথা ধ্যানসাধনার মাধ্যমেই সিনার এলেম, তথা রহস্যজ্ঞান, তথা এলমে লাদুনি অর্জন করতে হয়। তাই মহানবী তাঁর নিজের জীবনে হেরাণ্ডহায় পনের বছর ধ্যানসাধনা করে দেখিয়ে গেলেন যে, যদি সিনার এলেম তথা রহস্যের জ্ঞানটি জানতে চাও, বুঝতে চাও তো মোরাকাবা

ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। তা সেই মোরাকাবার প্রয়োগ-পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে, অনেক রকম হতে পারে, কিন্তু ধ্যানসাধনাটি করতেই হবে। মোরাকাবার বিষয়গুলো বইতে লিখে দেওয়া যায় এবং কিছুটা প্রথম খণ্ডে লিখে দিয়েছি। কিন্তু বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করতে হলে যারা মোরাকাবাটি করেছেন তাদের কাছ হতে শিখে নিতে হবে। কখন জিকির করতে হবে, কখন কোন অজিফা গুরুর ধ্যানসহ পাঠ করতে হবে এবং কোন অজিফা কতবার পাঠ করতে হবে—এসব কিছু বিস্তারিত জানার পরই মোরাকাবায় বসতে হবে। লতিফা ও মোকামগুলোর খেয়াল রাখা এবং সেই সঙ্গে গুরুর ধ্যানটি সব সময় রাখতেই হবে। কারণ শয়তান আপনাকে সব কিছু করার মাঝে তেমন বাধা না-ও দিতে পারে, কিন্তু গুরুর ধ্যান করাটাকে শয়তান মোটেই সহ্য করতে পারে না। কারণ শয়তান কখনো আদম-পূজা করে না এবং আদম-পূজাটি মোটেই সহ্য করে না। তাই শয়তান গুরুর ধ্যান করা হতে সাধককে উনিশ প্রকার ধোঁকা দেয়। প্রথম খণ্ডে প্রতিটি ধোঁকার বিষয়গুলো লিখে দেওয়া হয়েছে। যদি বিস্তারিত লিখে দিলেই মোরাকাবার বিষয়টি পরিষ্কার বুঝতে পারতো তা হলে বার বার লিখে দিতাম। অধম লিখকের বিশেষ সাধক খলিফাদের নামের তালিকা দিয়েছি এ জন্য যে, যদি কেউ ধ্যানসাধনাটি করতে চান তো তাদের কাছ থেকে জেনে নিন। একজন সাধক খলিফা যদি ভালো করে বুঝতে না পারেন তো অন্য আর একজন খলিফার

নিকট হতে শিখে নিন। যা কিছু অর্জন করতে হবে তা আপনাকেই ধ্যানসাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। গুরুর ধ্যান আর গুরুর গাইড লাইনটিকে অনুসরণ করে ধ্যানসাধনাটি আপনাকেই করতে হবে। কারণ ফকিরি বিষয়টি কোনো ইংলু অথবা কোয়ালিটি আইসক্রীম নয় যে হাতে তুলে দিলেই ফকিরি পেয়ে গেলেন। এত সোজা নয় ফকিরি। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে এই বিষয়ের ব্যতিক্রমটি দেখা যায়। কিছু ব্যতিক্রমটি কখনো সবার বেলায় খাটানো যায় না এবং খাটেও না।

রোজা সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা

এখন আমরা আবার রোজা তথা সিয়াম বিষয়টিতে চলে এলাম। যদিও সালাত, সিয়াম, জাকাত, হজ্জ এবং কোরবানির মূল বিষয়টি মাত্র একটি আর সেই বিষয়টি হলো : তোমার পবিত্র নফসের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে উহাকে বের করে দাও, উহা হতে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা চালিয়ে যাও। আর এই চেষ্টা চালাবার বিভাগটির নামই হল সুফিবাদ তথা ফকিরি। তাই সুফি কবি আল্লামা ইকবাল বলেছেন, 'তেরা তরিকা আমিরি নাই ফকিরি হ্যায়।' এই বিষয়টি সূরা মোমিনের ষাট নম্বর আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তুমি একা ডাকো (দুইজন ডাকলে হবে না) ডাকের জবাবটি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে। এই পবিত্র নফস তথা আমি এবং আমার সঙ্গে

খান্নাসরুপী শয়তান মিলে দুইজন হয়ে গেলাম। দুইজন হলেই ‘উদউনা’ হয়ে যায়। কোরান ‘উদউনা’ শব্দটি ব্যবহার করে নি। কোরান ‘উদউনা’-র বদলে ‘উদউনি’ বলেছে। ‘উদউনা’ হল দুইজন আর ‘উদউনি’ হল একজন। সুতরাং সিয়াম হলো পরিত্যাগ। কী পরিত্যাগ করতে হবে? নিজের নফসের সঙ্গে যে খান্নাসরুপী শয়তানটিকে পরীক্ষামূলকভাবে দেওয়া হয়েছে তাকে বর্জন করার নামটি হল সিয়াম। বর্জনের প্রথম মূহূর্তটিকে বলা হয় ইফতার। তাই মহানবী বলেছেন যে, আমার যে বান্দা সবচাইতে তাড়াতাড়ি ইফতার করতে পারে সেই হলো আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা (হবহ নয়)। এই ইফতারটি হাকিকি ইফতার এবং এই হাকিকি ইফতারটিকে বুঝিয়ে দেবার জন্য মেক্জাজি ইফতারটিকে রাখা হয়েছে। বিমূর্তটির পাশেই মূর্ত। এই হাকিকি ইফতারটি যে বান্দা করতে পেরেছেন তাঁর বাকি জীবনটাই রোজা। তাই হাকিকি রোজার প্রথমে ইফতারের অনুশীলন, তারপর রোজা এবং এই রোজাটি সারা জীবনের রোজা; আর মেক্জাজি রোজার প্রথমে রোজা এবং পরে ইফতার—এই বিষয়ের উপর খাজা গরিবে নেওয়াজ আসরাতে হাকিকি নামক ফারসি ভাষার বইটিতে চমৎকার ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। খাজা বাবা আসরাতে হাকিকি নামক বইটিতে যাহা লিখেছেন তার কিছুটা তুলে ধরলাম। বইটির যিনি অনুবাদ করেছেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষার অধ্যাপক ড.

সাইফুল ইসলাম খান। অনুবাদের কিছু অংশ তুলে ধরার আগে পাঠক বাবাদের জানিয়ে দিচ্ছি : রোজার হাকিকি এবং মেজাজি বিষয়টি অপূর্ব সুন্দর স্বচ্ছ ভাষায় যিনি লিখেছেন তাঁর নাম শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী এবং বইটির নাম হল সিয়াম দর্শন। রোজার বিষয়ে কোরানের যতগুলো আয়াত আছে সবগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং রোজার উপর যতগুলো হাদিস আছে প্রায় অধিকাংশ হাদিস (সবগুলো নয়) তুলে ধরেছেন এবং এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণগুলো পড়লেই বুঝতে পারবেন রোজার গুরুত্ব কতটুকু।

এখন আমরা রোজার বিষয়ে খাজা বাবা কী বলেছেন তারই কিছু অংশ নিম্নে তুলে ধরলাম : ‘মহানবী বললেন, হে উম্মর, রোজার হাকিকির অর্থটি হচ্ছে, মানুষ তার অন্তর বা দিল হতে সর্বপ্রকার দ্বীন ও দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ তথা দূরীভূত করবে। কারণ দ্বীনের খাহেশ, যেমন-বেহেশ্বের আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি ও হরদের আকাঙ্ক্ষা-দ্বীনের এই সব খাহেশ আবেদ ও মানুষের মধ্যে পর্দার অন্তরাল তৈরি করে। এই রকম চাওয়া-পাওয়া দিলের মধ্যে থাকলে বান্দা কখনো তার মাবুদের হাকিকতের নৈকট্য লাভ করতে পারে না।

‘অপরদিকে দুনিয়ার খাহেশ তথা চাওয়া-পাওয়ার মোহনীয় আকাঙ্ক্ষাটি হলো- ধন-দৌলত, শান-শওকত, ক্লমতার অহঙ্কার,

নফসের অনেক রকম খাহেশ, দুনিয়া অর্জনের নেশায় মত্ত থাকা ইত্যাদি জাগতিক বিষয়গুলোর আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আল্লাহ হতে দূরে সরিয়ে দেয় এবং এই সব বিষয়ের আকাঙ্ক্ষায় ডুবে থাকাটাই হলো শেরেকে ডুবে থাকা। আল্লাহকে ছেড়ে এই সব বিষয়ের প্রতি খেয়াল ও ফেকের করা এবং আবার কেয়ামতের ভয়, বেহেশতের আশা করা এবং আখেরাত বিষয়টির ফেকের করা—এই সবগুলো বিষয়ই রোজার হাকিকি তথা আসল রোজা নষ্ট তথা বরবাদ করে দেয়। আসল রোজা তথা রোজার হাকিকি তখনই সঠিক হবে যখন বান্দা আল্লাহ ছাড়া অন্য সবগুলো বিষয় দিল থেকে তথা অন্তর হতে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। এমনকি গায়রুল্লাহর (বিষয়মোহ) এলেন পর্যন্ত থাকে না এবং সব রুম উম্মিদ (আশা) ও ভয়ভীতি দেল হতে তথা অন্তর হতে দূর করে দিতে পারে। হে উম্মর, আল্লাহর দিদার ছাড়া আর অন্য কিছুর জন্য আমি মোহতাজ নই। আসল রোজার ইফতার শুরু হয় দিদারে এলাহি দিয়ে এবং শেষও হয় দিদারে এলাহি দিয়ে, তাই চেষ্টা করে যেতে হবে যে, দিদারে এলাহি দিয়ে রোজা রাখা এবং দিদারে এলাহি দিয়ে ইফতার করা। হে উম্মর, রোজার হাকিকির শুরু ও শেষ বিষয়ের উপর ভালভাবে খেয়াল রেখো। মনে রেখো, রোজার হাকিকির শুরু হয় আল্লাহর মারোফত অর্জন থেকে এবং এর শেষ বা ইফতার হচ্ছে আল্লাহর দিদার লাভ করা।

রোজাদারদের জন্য দুইটি খোশ খবর থাকে-একটি ইঁফতারের সম্ময় এবং অপরটি আল্লাহর দ্বিদারে মধ্যে ডুবে যাওয়া।

‘হে উমর, সাধারণ মানুষের জন্য প্রথমে রোজা রাখা এবং রোজা শেষে ইঁফতার করা। (অবশ্য সাধারণ হতেই অসাধারণের বিষয়টি অবগত হওয়া যায়। সাধারণ না থাকলে অসাধারণের বিষয়টি বিমূর্ত হয়ে যেত। তাই সাধারণটিকে উপেক্ষা অথবা অবহেলা করতে নাই)। কিন্তু মেজাজি রোজার সিদ্ধান্তটি এক রকম আর হাকিকি রোজার সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ অন্য রকম। হাকিকি রোজার আরম্ভ হয় ইঁফতার দিয়ে তারপর রোজাই রোজা তথা জীবনটাই রোজা। মাজ্জুব, সালেক এবং যারা খোদার পথের পথিক তাঁরা সদা-সর্বদা তথা সব সময় এবং সর্বাবস্থায় রোজার মধ্যে দিয়ে দিনযাপন করেন। আরও মনে রাখতে হবে যে, খোদার পথের পথিকেরা তথা মাজ্জুব এবং সালেকেরা ঋণকালের জন্যও আর রোজা ভাস্কেন না তথা ইঁফতার গ্রহণ করেন না। কারণ আসল রোজা তথা হাকিকি রোজার জন্য ইঁফতার করাটি শর্ত নয় বরং ইঁফতারের জন্য রোজা রাখাটাই একমাত্র শর্ত। আবার ওয়াসেলানে এলাহির (খোদার সঙ্গে মিলনকারীগণ) অবস্থা এমন কখনো হয় না যে, তাঁরা কখনো কখনো রোজা রাখবে আবার কখনো কখনো ইঁফতারও করবে। এর প্রধান কারণটি হল, তাঁরা সদা সর্বদা সর্ব অবস্থায় রোজার মধ্যে থাকে।

‘হে ঊম্মর, সাধারণ মানুষ যে রোজা রাখে তা হাকিকি তথা আসল রোজা নয়। কারণ ইহাতে শুধু পানাহার ও জেমাহ থেকে পরহেজ থাকে। সাধারণ মানুষের রোজাটিকে মেজাজি রোজা বলে জানিও। এই মেজাজি রোজা দ্বারা আসরারে এলাহি (খোদার রহস্য জ্ঞান) হাসিল হয় না। মেজাজি রোজাটি কেবলমাত্র জাহেরি সুরতে সীমাবদ্ধ। এই মেজাজি রোজা হাকিকত বিষয়টির কিছুই বুঝতে পারে না, বরং অন্ধকারে থেকে যায়। এই মেজাজি রোজা দ্বারা গায়রুল্লাহ পরিত্যাগ সম্ভব হয় না। বরং এই মেজাজি রোজায় সর্বপ্রকার নফসানি ও মানবীয় কলুষতা থেকে যায়। মেজাজি রোজাদারদের যাবতীয় কথাবার্তা এবং কাজকাম তথা কার্যাবলি গায়রুল্লাহ হতে পরিপূর্ণ থাকে। এইরূপ জাহেরি ও মেজাজি রোজা দ্বারা এতটুকু লাভ হতে পারে যে, গরিব, দুঃখী ও মিসকিনদের দুঃখ-ব্যথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় এবং তাতে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তাদের অভাব কিছুটা লাঘব করা যায়।’ (দিওয়ানে মুহ্মিনুদ্দিন-পৃ. ৪৩৭)।

হাকিকি রোজা যতই আসল রোজা হোক না কেন, মেজাজি রোজাটি অবহেলা করা যায় না। মহানবী সমস্ত আলমের জন্য রহমত, সুতরাং বিশেষ শ্রেণীই এই রোজার রহমত পাবে আর সবাই পাবে না এটা হতে পারে না। তাই সাধারণকেও এই রহমতটি দিয়ে যাবার যে ব্যবস্থাপত্রটি মহানবী দিয়ে গেছেন উহাকেই মেজাজি রোজা বলা হয়। তবে মেজাজি

রোজার অনুশীলনের মধ্য দিয়েই হাকিকি রোজার রহস্যটি যখন বুঝতে পারা যায় তখনই রোজার বিষয়টির সার্থকতা বুঝা যায়। সুতরাং মেকজাজি রোজাটি আছে বলেই মানুষ এই মেকজাজি রোজা পালন করতে করতে হাকিকি রোজার রহস্যটি বুঝতে পারে। এই সিয়াম বিষয়টির কোরান হাদিস হতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা যায়, কিন্তু আমি অধম এ বিষয়ে আর এগিয়ে গেলাম না এ জন্য যে, এই সিয়াম বিষয়টির মেকজাজি এবং হাকিকি ব্যাখ্যাগুলো খুবই সুন্দর এবং মার্জিত ভাষায় যিনি তুলে ধরেছেন তিনিই শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতি এবং তাঁর অমর গ্রন্থটির নাম সিয়াম দর্শন। এই অমূল্য বইটি কয়েকবার পড়লে সিয়াম বিষয়টি দিবালোকের মতো পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং সিয়াম বিষয়টির উপর একটি মোটামুটি ধারণা তৈরি হবে। তবে রোজার বিষয়টি শেষ করার আগে একটি কথা বলে শেষ করতে চাই। আর সেই বিষয়টি হলো, আল্লাহর একটিবারও পুরা কোরানে বলেন নি যে, তিনি রোজাদারদের সঙ্গে থাকেন অথবা আছেন। যেমন- ‘ইল্লাল্লাহা মাআস্ সায়েমিনা’, তথা ‘নিশ্চয় আল্লাহ রোজাদারদের সঙ্গে থাকেন’-এই বাক্যটি পুরা কোরানে নাই। আমরা পুরা কোরানে আল্লাহকে মাত্র চারটি স্থানে থাকার ঘোষণাটি পাই : সবরকারি তথা ধৈর্যশীলদের সঙ্গে, তাকওয়াকারীদের সঙ্গে, মুহসীনিনদের সঙ্গে এবং মুমিনদের সঙ্গে থাকার ঘোষণাটি পাই। এই চারটি স্থান ছাড়া আর

কারো সঙ্গে আল্লাহ থাকেন বলে ঘোষণাটি অধম লিখকের চোখে পড়ে নি।

আমি রোজার বিষয়ে অনেকগুলো হাদিসের মধ্য হতে মাত্র একটি হাদিস তুলে ধরলাম। হজরত আবু হোরাযরা হতে বর্ণিত আছে যে, মহানবী বলেছেন, ‘যখন রমজান প্রবেশ করে, আকাশের দরজা খুলে যায় (অপর আর একটিতে আছে যে, জান্নাতের দরজা খুলে যায়), জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং শয়তানদের শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হয় (এবং অপর আর একটি হাদিসে বলা হয়েছে যে, রহমতের দরজা খুলে যায়)’। এই হাদিসটি এ জন্যই তুলে ধরলাম যে, বুখারি এবং মোসলেম শরিফ-এ বলা হয়েছে। তবে সব হাদিসই গুরুত্বপূর্ণ।

এই হাদিসটির সামান্য ব্যাখ্যা দেওয়া হলো। রমজান প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দরজা অথবা জান্নাতের দরজা খুলে যায়। রমজান মাসটি বলা হয় নি। বলা হয়েছে রমজান প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ অথবা জান্নাতের দরজা খুলে যায়। এই হাদিসটিতে মেরাজি রোজা হতে বেশি হাকিকি রোজার কথাটি বলা হয়েছে। কারণ রমজান কোথায় প্রবেশ করে অথবা ঢুকে? রমজান প্রবেশ করে সাধকের অন্তরে। যখন খান্নাসরূপী শয়তান হতে মুক্ত হয়ে যায় তখনই সাধক বুঝতে পারে যে, জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যভাবে এই হাদিসটির ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এই রমজান সাধকের অন্তরে প্রবেশ করার সঙ্গে

সঙ্গে আকাশের দরজা খুলে যায় তথা রহস্যের দরজা খুলে যায়। ধ্যানসাধনার মাধ্যমে লোভ-মোহ যাহা খান্নাসরূপী শয়তান সর্বদা ফুৎকার দিচ্ছে, ওয়াসওয়াসা দিচ্ছে, কুমন্ত্রণা দিচ্ছে তাহা যখন আর অবশিষ্ট থাকে না তখনই সাধক বুঝতে পারেন যে, রমজান সাধকের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তথা ঢুকতে পেরেছে। আর যেইমাত্র সাধকের মাঝে রমজান প্রবেশ করে, সেই সময় হতে খান্নাসরূপী শয়তান বিদায় গ্রহণ করে, তথা চলে যায়, তথা শয়তানের আর কোনো রকম কার্যকারিতা থাকে না। হাদিসটিতে বলা হয়েছে, জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। যখনই শয়তানের কাজকাম আর থাকে না তখন আপনা হতেই জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। গাছের শিকড় কেটে দিলে গাছ বাঁচে না, তেমনি শয়তানকে বেঁধে ফেললে জাহান্নামটির গুরুত্ব আর থাকে না এবং থাকার প্রশ্নই উঠে না। সাধক তখন নূতন নূতন রহস্যলোক অবলোকন করে মহা-আনন্দে ডুবে যায়। এই মহা-আনন্দলোকটি তো জান্নাতে থাকে। সুতরাং জান্নাতের দরজাগুলো যে খুলে যায় বা যাবে এটা তো অন্ধের হিসাবের মতো সত্য। হাদিসটিতে আরও বলা হয়েছে যে, শয়তানদের (একটি নয়, বরং বহুবচনে বলা হয়েছে) শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়। নফসের খাহেশিয়াত এবং প্রবৃত্তিগুলোই তো খান্নাসরূপী শয়তান। তাই সাধকের অন্তরে যখন রমজান প্রবেশ করে তখন আকাশ তথা মনোলোকের রহস্যময় বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে এবং

জান্নাতের মহা-আনন্দে ডুবে থাকে। এখানে আকাশ বলতে মনের জগতের কথা বলা হয়েছে। আবার নফসের অবৈধ চাওয়াগুলো, দূষিত বিষয়ে হাত বাড়ানোর পা-গুলোকে শিকল পড়িয়ে দেওয়া হয়। শয়তানদের কাজকামগুলো শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলাটিকে যদি ম্লেজাজি রোজার বেলায় খাটাতে চান তো কোথায় শান্তি? যত প্রকার অপকর্মের হোতাই তো শয়তান, আর সেই শয়তানকে শিকল দিয়ে বেঁধে ফেললে তো দুনিয়াতে রমজান মাসটিতে

শান্তি বিরাজ করার কথা। অশান্তির জনকই তো শয়তান। বিভেদ, মারামারি জাতীয় কু-কাজগুলো তো শয়তানই করায়। তা হলে রমজান মাস আসলে কল্প সে কল্প উনত্রিশ কি ত্রিশ দিন তো শান্তির অমৃতধারা বইবার কথা। সুতরাং এই হাসিদটি ম্লেজাজি রোজার কথা নয়, বরং হাকিকি রোজার কথা। হজরত আমির খসরুর ঠুমরি রাগে যেমন মাত্র একটি বাক্য থাকে, কিন্তু সুরের বাহারি ঠকম আর চমকের শৈলী শ্রোতাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যে অনেক কথা বলা হচ্ছে—সে রকম রোজা আর রমজানের রহস্যটি ঐ একটি কথাই ঘোষণা করছে যে, তোমার অন্তরের মাঝে ইচ্ছাকৃত দেওয়া (পরীক্ষার জন্য) খান্নাসরুপী শয়তানটিকে বাহির করে দাও, নতুবা বার বার জন্মচক্রের মাঝে আটকা পড়ে জাহান্নামের জ্বালাযন্ত্রণার নিত্যসঙ্গী হতে হবে। জাহান্নামের আগুন তো ঘরবাড়ি জ্বালায় না, কারণ ঘরবাড়ি তৌহিদে বাস করে।

তৌহিদে জাহান্নামের প্রবেশ নিষেধ। তৌহিদে শয়তানের প্রবেশ নিষেধ। জাহান্নামের আগুন তো কাপড়চোপড় জ্বালায় না, কারণ কাপড় চোপড় তৌহিদে বাস করে; জাহান্নামের আগুন তো দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জ্বালায় না, কারণ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তো তৌহিদে বাস করে : জাহান্নামের আগুনটিকে মাত্র একটি জিনিস জ্বালাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, আর সেটা হলো মানুষ ও জ্বিনের অস্তর। এই মানুষ আর জ্বিনের দুইটি অস্তরই তৌহিদে বাস করে না। তাই শয়তানের একমাত্র উপযুক্ত বাসস্থানটি হলো মানুষ আর জ্বিনের অস্তর। এই অস্তর দুইটিকে শয়তান কখনো কখনো এতই জ্বালায় যে, যন্ত্রণা এত ভয়ঙ্করভাবে মাত্রা ছাড়িয়ে যায় যে, অবশেষে সইতে না পেরে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে ফেলে। কারণ আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে জাহান্নামের অগ্নির জ্বালা হতে মুক্তি চায়, কিন্তু আত্মহত্যা কি সেই মুক্তি দেবার ক্ষমতা রাখে?

ম্লেজাজি রোজা, ম্লেজাজি শয়তান আছে বলেই তো জ্ঞানীদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়ে গেছে বুঝার জন্য জানার জন্য। সুতরাং অনুষ্ঠানকে রাখতেই হবে। অনুষ্ঠানই জ্ঞানীকে রহস্যলোকের পথ দেখাবে। অনুষ্ঠানই আর এক জনমের জন্য মুক্তির বারতা বহন করবে। আদর্শলিপি আর পাঠশালা রাখতেই হবে। তা না হলে স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন কেমন করে? তাই সিনার এলেন হাসেল করতে হলে সিনার

এলেমের অধিকারীর কাছে আপনাকে যেতেই হবে। নতুবা কে আপনাকে পথ দেখাবে? মাথার এলেমের তো এ পথ দেখাবার বিধানই নাই। তা হলে মাথার এলেম দিয়ে না হয় আর একটু উন্নত মানের মাথার এলেম হাসেল করতে পারবেন। সিনার এলেম যিনি হাসেল করতে পেরেছেন তিনি মাথার এলেম হয়তো জানেন না। মাথার এলেম যিনি জানেন না তাকে আমরা নিরঙ্কর, টিপসই, উন্নি ইত্যাদি বলি। এত বড় মাথার এলেমের জ্ঞানী রুম্মি আর গাজ্জালি কেন সিনার এলেমের গুরু নিরঙ্কর শামসেতাব্রিজ আর নিরঙ্কর আবু আলি ফরমাদির কাছে মুরিদ হতে গেলেন? কেবল কথা আর কথা! কিছু খোদা তো কথা বলেন না, কারণ খোদার মধ্যে কথা নাই এবং কথার মধ্যে খোদা নাই। যদি খোদা কথাই বলতে চান তো আদমের সুরতে কথা বলেন। যদি পাথর অথবা বাঁশি ছুঁড়ে মারতে চান তো আদমের সুরতেই মারতে হবে। ঐ হাত খোদার হাত, ঐ বাঁশি ছুঁড়ে মারাটাই খোদার মারা। তাই আবার বলতে হচ্ছে, বার বার বলতে হচ্ছে যে, আল্লাহ জাত-রূপে, (ওরিজিনাল) খাস-রূপে থাকেন তিনটি স্থানে : একটি লা মোকাম, অপর দুটি জ্বিন ও মানুষের অন্তরে। সুতরাং আল্লাহর জাত-রূপের পরিচয় জানতে চাইলে মানুষ ধরতে হবে। গাছপালা, ইঁট, পাথর, নদী, সাগর আর পাহাড় পর্বতের পূজা করলে আল্লাহর পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রতীক করা এক বিষয়, আর প্রতীকই সব কিছু বলা অন্য বিষয়। বিষয়টা বড় জটিল,

বড়ই পিচ্ছিল তাই সব কিছু মনের অজান্তে গুলিয়ে ফেলি, জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলি, লাবড়া বানিয়ে ছাড়ি। ভিত্তির পরিচয় জানা নাই, কেবল ডালপালার লাফালাফি করা। এই বাহারি লাফালাফিতে সমাজ জীবনে সার্বজনীনতার দর্শনটি আর থাকতে চায় না। কেবলই নোংরামি, কাদা ছুড়াছুড়ি আর বলপ্রয়োগের শক্ত পেশী, হাত চালাবার বাহারি শক্তি। অথচ দ্বীনের মধ্যে কোনো বলপ্রয়োগ নাই, নাই কোনো প্রকার জোর জবরদস্তি। ‘আল্লাহ সামাদ’ তথা ‘আল্লাহ হলেন মহানিরপেক্ষ’। মহানিরপেক্ষ আল্লাহর বাণী অবশ্যই মহানিরপেক্ষ। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতাই ইসলাম। এ বিষয়টা না বুঝার দরুন কত রকম কথা বাজারে চালু হয়ে গেছে। যার যার মতামত সেই বিষয়টাই ধারণ করে নেয়। এক ভুল শত ভুলের জন্ম দেয়। শত ভুল অগণিত ভুলের জন্ম দেয়। আজ ভুলটাই হয়ে গেছে নির্ভুল। আর নির্ভুলটাকেই ভুল মনে করা হচ্ছে। কে বুঝাবে? কে প্রচার করবে? কে জানিয়ে দেবে? মোহমায়ার শক্ত বাঁধনে খান্নাসরূপী শয়তান বেঁচে রাখলে কে এগিয়ে আসবে? তাই আজ দশ অসুরের পাল্লায় পড়ে আসল মানুষটিকেও অসুরের চাচা বা মামা মনে করা হচ্ছে।

নফস ও রহ নিয়ে আরও কিছু কথা

দেহটি জীবাত্মা তথা নফস নহে : পরমাত্মা তথা রূহ হওয়াটা তো অনেক পরের কথা। দেহটিকে রূপক ভাষায় খাঁচা বলা যায়। খাঁচা আর পাখি দুটো

আলাদা বিষয়। পাখি উড়ে গেলে খাঁচাটি পড়ে থাকে। খাঁচা পাখি নয়, আবার পাখি খাঁচা নয়। দুটোকে মনের অজান্তে মিলিয়ে ফেলি। এটাই দৃষ্টিবিভ্রম। এটা দড়িকে সাপ মনে করার মতো। দড়ি সাপ নয়, কিন্তু ভুল হয়ে যায়। পরমাত্মা তথা রূহ তো এতই সূক্ষ্ম, এতই চিকন বিষয় যে এর অবস্থান অণু-পরমাণুর মত। স্থূল চোখে দেখতে গেলেই ভুল হয়। মনে হয় রূহ তথা পরমাত্মাটিও সৃষ্টি। আবার অনেকে মনে করে থাকেন, রূহ তথা পরমাত্মাটি সৃষ্টিও নয়, স্রষ্টাও নয়। এই মনে করার মাঝেও সংকীর্ণতা থেকে যায়। ফেরাউনরা বিশ্বাস করতো, আত্মাটি দেহ ছাড়া থাকতে পারে না। তাই দেহটিকে কেবল মম্বি করাই হতো না। বরং মম্বির সঙ্গে অনেক প্রকার জিনিসপত্র দিয়ে দিতো। ফেরাউনরা এক আজব জীব বানিয়ে মূর্তির রূপ দিয়ে পূজা করতো। এক ফেরাউন অনেক জ্ঞান-গবেষণা করে বুঝে নিলেন যে এই আজব মূর্তিটার কোনো কিছু করার ক্ষমতাই নাই, বরং সূর্য আলো দেয়, সেই আলোতে সব কিছু বেঁচে থাকে তাই সূর্যকে দেবতা মনে করে পূজা করার হুকুম জারি করলো এবং আগের চলে আসা মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করা হলো। এমন কি অনেক মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হলো এবং মূর্তিপূজা হতে সূর্যপূজার

বিবর্তন দেখা দিল। কিন্তু সেই ফেরাউনের মৃত্যুর পর আবার বাপ দাদারা যে মূর্তিপূজা করতো উহাই চালু হয়ে গেল। সূর্য দেবতাই নয় বলে সেইদিনের জ্ঞানী-গুণীজনেরা যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। বিবর্তনের লেজ আবার জোড়া লেগে গেল। মুসা নবীর তুর পাহাড়ে কিছু দিন অবস্থান করার দরুন উন্নতদের মাঝে মরে যাবার সংশয় জেগে উঠলো। সামরি নামক এক বিরাট (?) জ্ঞানীর উপদেশে সোনার তৈরি গরুর বাচ্চার (বাছুর) পূজা করতে আবার শুরু করে দিল। নবী হারুনের শত চেষ্টা বিফল হয়ে গেল। পরে অবশ্য নবী মুসার আগমনে ভুল ভাঙলো এবং সামরি নামক জ্ঞানীর (?) মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলো। কিন্তু একটি বিষয়ে সব ফেরাউন একমত ছিল আর সেটা হলো দেহ-মন্দির মাঝেই জীবন ফিরে আসবে। তাই দেহ-মন্দিরটিকে খুব যত্ন করে কবর নামক ঘরে রাখা হতো। কবর নামক ঘরে মন্দির মধ্যে আত্মা প্রবেশ করবে তাই সুখে থাকার ব্যবস্থা। এই সব চিন্তাধারাগুলোকে সেমিটিক চিন্তাধারা বলা হয়। এই চিন্তাধারা কমরোশি এখনো চালু আছে। মারা যায় নি, সম্রাট আকবরের দীনে এলাহির মতো। আজও দীনে এলাহির অনুসারী এবং উপাসনার ঘর দিল্লিতে দেখে চমকে উঠলাম। ভাবলাম-দীনে এলাহি মারা গেছে, কিন্তু গন্ধাট সামান্য হলেও থেকে গেছে।

আমি একটি রুহ বিষয়ের উপর অনুবাদের বই পড়ে চমকে গেলাম। কিছু জানেন না, কিন্তু অনেক কিছু জানার মতো করে রুহ বিষয়ের উপর বিরাট বইটি লিখেছেন, আর রুহকে যারা পরমাত্মা বলেন তাদেরকে

নানা প্রকার গালাগালি করেছেন। অথচ ঐ ভদ্রলোকটি রুহকে প্রথমে একবচন না বলে বহুবচন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আবার লিখক একবার রুহকে সৃষ্ট বলেছেন, আবার নুরানি মাখলুক বলেছেন, আবার ফেরেস্তা জিবরিলকে বুঝাতে চেয়েছেন। অথচ ফেরেস্তার কোনো জীবনই নয়; কারণ এদের নফসও নাই, রুহও নাই। ফেরেস্তার হলে আত্মাহুর বানানো আত্মাহুর অগণিত রহমতের রোবট। কদরের রাতে ফেরেস্তাদের নাজেল করা হয় এবং নাজেল করা হয় রুহ। কিন্তু ভদ্রলোক রুহ শব্দটির অনুবাদ করেছেন জিবরিল ফেরেস্তা। কদর রাতে জিবরিল ফেরেস্তাকে পাঠানো হয় লিখেছেন। জিবরিলের কাজই হলো ওহি নিয়ে আসা। সেই ওহি মহানবীর পর হতে যদি বন্ধ থাকে তো জিবরিলকে বেকার পাঠিয়ে লাভ কী। যিনি বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছেন তিনি হয়তো জানেন না যে, যিনি রুহের উপর বইটি আরবি ভাষায় লিখেছেন উনার আর একটি চমৎকার বিস্ময়কর বইতে কোরান-হাদিস-এজমা-কেয়াস দিয়ে বহু গবেষণা, বহু কষ্ট, ত্যাগ স্বীকার করে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন যে, পৃথিবী গ্রহটিকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে। কী চমৎকার আবিষ্কার করে গেছেন আজ হতে প্রায় সাত শত বছর আগে! আর সেই মহাগবেষকের মহামূল্যবান রুহ নামক বইটি বাংলায় অনুবাদ করে অন্য গবেষকদের চৌদ্ধ গোষ্ঠী ধোঁত করে ফেরকাবাজির অপবাদ দিয়ে উপহার দিয়েছেন। এই অমৃততুল্য বইটি পড়ে কত সরল পাঠক যে

বিদ্রাস্ত হবেন তার কথা কী বলবো। বড় বাবার পোলায় খায় নামক চকবাজারের ইঁফতারির মতো লেখকের সে কি মান-গর্ব-অহঙ্কার! দলের হয়ে কলম ধরা আর নিরপেক্ষ হয়ে লিখার মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আজকের পাঠকেরা কোন মুড নিয়ে লিখছেন, কোনো সাইনবোর্ড কাঁধে ঝুলছে কি না, পরিষ্কার বুঝতে পারে। তবে মানুষরূপী গাধাও যে আছে তা অবশ্যই স্বীকার করেন। গাধা আছে বলেই তো এই লিখা। রোগী আছে বলেই তো ডাক্তার। সংকীর্ণতার জ্বালা যেসব ধর্ম-গবেষকদের মাথার মগজে কিলবিল করছে তাদের কাছ হতে সার্বজনীনতার বাণীটি কী করে আশা করতে চান? আশা করাটাই বৃথা। যে না মানার সিদ্ধান্তটি আগেই নিয়ে ফেলেছে, তাকে শত দলিল শত যুক্তি দেখিয়েও কোনো লাভ নাই। দলের সাইনবোর্ড যাদের ঘাড়ের ঝুলছে তাদের কাছে দলের গীতই শুনবেন। যদি দু'চারটা সার্বজনীনতার কথা শুনতে পান তো তার মাঝেও কয়েকটি 'কিছু' পাবেন। তার মানেটা হলো 'কিছু' শব্দটি বসিয়ে সার্বজনীনতাটিকে উপহাস করা। আসল কথাটি হলো, ইসা নবীকে আল্লাহ রুহ বলেছেন। তাই রুহের প্রকারভেদ করতেই হবে। এমন কি নফসটিকেও আরবি ব্যাকরণের যাদু-মারকা ঘোরপঁচা খাটিয়ে রুহ বানিয়ে ছেড়েছেন। কিছু একটা প্রতিবাদ করতে গেলেই অন্য ফেরকার অনুসারী বলে যা-তা গালমন্দ করে ছাড়বে। কথায় বলে, চোরের মায়ের গলা বড়। এ রকম

ভাবভঙ্গি নিয়ে কত কথার পঁচাচ আর যাদু দেখাতে চাইবে যে আপনি অবাক হবেন। সাধারণ মুসলমান এসব বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না বলে তাদের পাতে দেওয়ামাত্র খেয়ে ফেলে। যার দরুণ আসল আর নকল চেনাটা বড়ই মুশ্কিল হয়ে পড়েছে। এক সাইনবোর্ড ওয়ালা ইসলাম গবেষক তো নবী হতে রসুল অনেক বড় প্রমাণ করার জন্য বিরাট একখানা বই লিখে ফেলেছেন। কত দলিল যে দাঁড় করিয়েছেন তার ইয়াত্তা নাই। এতে কী হয়েছে? অনেক চিন্তাশীল ধর্ম গবেষকরাও রসুলকে নবী হতে বড় করে দেখে। একবার আমি চট্টগ্রামের সি পোর্টে মরম মাসে ওয়াজ করার দাওয়াত পাই। দু'দিন ওয়াজ করলাম। আমি বুঝিয়ে দিলাম যে, রসুল হতে নবীর মর্যাদা অনেক বড়। সেদিনে পোর্ট সচিব ছিলেন একজন ইসলাম গবেষক। নাম তাঁর ফারুক। উনি বিরাট আকারে ইসলাম ধর্মের উপর একটি গবেষণামূলক বই লিখেছেন। বইটিতে তিনি আগাগোড়া রসুলকে নবী হতে অনেক মর্যাদাবান বলে লিখে গেছেন। আমার মুখে উল্টা কথা শুনে আমাকে বার বার প্রশ্ন করছেন আর আমি প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। জানী ভদ্রলোক। বুঝতে পারছি উনি আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করে নিচ্ছেন। যখন উনাকে একটি কথা বুঝিয়ে বললাম যে, আপনি একটিবার ডেবে দেখুন তো, আল্লাহ রসুল নির্বাচন করেন মানুষ এবং ফেরেশতা হতে, কিন্তু নবী নির্বাচন করে কেবলমাত্র মানুষ হতে। আপনি একটিবারের তরেও

দেখাতে পারবেন না যে, ফেরেস্ভাদের থেকে একজন নবী নির্বাচন করেছেন। ফেরেস্ভাদের থেকে আল্লাহ রসুল বানিয়েছেন কথাটি বেশ কয়েকবার পাবেন, কিন্তু নবী বানাবার প্রশ্নে পুরা কোরানে একটিবারও ফেরেস্ভাদের কথাটি বলা হয় নি। ফেরেস্ভা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ফেরেস্ভারা যতই মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন, কিন্তু ফেরেস্ভাদের সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় নি। বলা হয়েছে মানুষকে। কারণ মানুষকে নফস এবং রুহ দেওয়া হয়েছে। ফেরেস্ভাদেরকে নফস আর রুহ দুটোর একটিও দেওয়া হয় নি। সূরা কদরে পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সেই শক্তিশালী রাতে নাজেল করা হয় ফেরেস্ভাদের এবং রুহ! রুহ যদি ফেরেস্ভারাই হতো তা হলে আল্লাহ আলাদা করে, ভাগ করে বলতেন না যে, কদর রাতে তথা শক্তিশালী রাতে ফেরেস্ভাদের এবং রুহ নাজেল করি। রুহ বিষয়টি এমনিতাই গোপন। যদি রুহ বিষয়ের উপর যথেষ্ট ধারণা না থাকে তো সোজা বলে দিন যে, এ বিষয়টি আমার জানা নাই অথবা জানি না। জানি না বলার মাঝে এমন কী লজ্জা আছে? বরং সত্যতার আদর্শটিই ফুটে উঠবে। এবং মানুষ আপনার গবেষণায় ধন্যবাদই জানাবেন। অবশেষে আমাকে আর একদিন রেখে সি পোর্টের অনেক অফিসার এবং তাদের বন্ধুরা মিলে এককভাবে অনেক রাত পর্যন্ত ওয়াজ করালেন এবং ওয়াজটি ক্যাসেট করে রাখলেন। আমাকে সি পোর্টের গেস্ট হাউসে রাখা হয়েছিল। সেই ইসলাম গবেষক অফিসারটি

এসে আমার সামনে শিশুর মত কাঁদলেন আর বললেন, জীবনে কি কেবল ভুলই শিখে গেলাম। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম যে, আমাকেও এই রকম ভুলের ফাঁদে অনেকবার পা ফেলতে হয়েছে। আল্লাহর রহমতে সত্য জ্ঞানবার ফরিয়াদ করলে আল্লাহই সত্যপথটি দেখিয়ে দেয়। বেশিক্ষণ উনি থাকতে পারেন নি কারণ নৌ-মল্লী আসার কথা। যতদূর মনে পড়ে যে, সেই সময় নৌ-মল্লী ছিলেন জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী। পরে অবশ্য কয়েকবারই ঢাকাতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। রুহ বিষয়টির উপর পরিষ্কার ধারণাটি রাখতে হলে শাহ সুফি সদরউদ্দিন আহমদ চিশতী সাহেব রচিত মসজিদ দর্শন বইটি পড়তে পারেন। আরো বেশি জ্ঞানতে হলে মহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি এবং আহমদ রেফাইয়ের রচনা সমগ্র পড়তে পারেন। অধম লিখক রুহ বিষয়টি বিস্তারিত লিখেছি মারফতের বাণী নামক বইটিতে। যতবার রুহ বিষয়টি কোরানে বলা হয়েছে ততবারই এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি। মনে হয় কোরানে রুহ বিষয়টি সতেরোবার উল্লেখ করেছে এবং সতেরোবারই ব্যাখ্যাটি দেওয়া হয়েছে।

জাকাতের হাকিকত

এবার আমরা জাকাত বিষয়টির উপর সামান্য আলোচনা করবো। তবে মেনজাজি জাকাত নিয়ে নয়, হাকিকি জাকাত নিয়ে সামান্য আলোচনা

করবো। মেজাজি জাকাতের বিষয়টিকে এতই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে হাকিকি জাকাত বলে যে কিছু একটা বিষয় আছে বা থাকতে পারে তার সামান্য ধারণাটাও দিনে দিনে মূছে যাচ্ছে। যে কোনো বিষয়ের অনুষ্ঠানটি যখন খুব বেশি প্রাধান্য পায় তখন আসল বিষয়টি তথা মূল বিষয়টি হারিয়ে যায়। অনুষ্ঠানগুলোর যখন আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হারিয়ে যেতে থাকে তখন অনুষ্ঠানগুলোতে প্রাণ বলতে কিছু থাকে না। তাই বলা হয়ে

থাকে : আচার যখন এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে তখন উহা অনাচারে পরিণত হয়।

এখন আমরা জাকাত বিষয়টি নিয়ে ছোট করে আলোচনা করতে চাই। ছোট করে এ জন্য বললাম যে, মেজাজি জাকাত বিষয়টি অনেক বড় এবং জটিল। তবু সামান্য আলোচনা মেজাজি জাকাতের উপর করতে চাই। তবে আলোচনাটি নিরপেক্ষ হয়েই করতে চাই। তবে স্বার্থের সামনে নিরপেক্ষতা শূন্য হয়ে যায়। অবশ্যই মেজাজি জাকাতের উপর বিশদ আলোচনা করা যায়, কিন্তু সুফি দর্শনের দৃষ্টিতে পল্লবগ্রাহিতার ছকে পড়ে যায়। সুফিবাদে পল্লবগ্রাহিতা যতই হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। আগেই বলেছি প্রায় প্রতিটি বিষয়ের দুইটি রূপ আছে। একটি মেজাজি রূপ এবং অপরটি হাকিকি রূপ। জাকাতের হাকিকি রূপটি লিখার আগে কোরান হতে মাত্র একটি দলিল তুলে ধরতে চাই।

যে দলিলটির উত্তর নিয়ে মহান সাহাবাদের মাঝে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। এবং আসহাবে সুফ্ফার একজন জলিল কদরের সাহাবা হজরত আবু জর গিফারিকে নির্বাসনে যেতে হয়েছিল। নির্বাসন জীবনেই একমাত্র কন্যার সামনে তিনি পরদা গ্রহণ করেন। দাফন করার কেউ ছিল না। পরদা নেবার আগে কন্যাকে বলেছিলেন মহানবীর ভবিষ্যৎ বাণীর কথাটি। তাই কন্যা সাহাবার লাশ মোবারক নিয়ে বসে ছিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই কিছু লোক এসে লাশ মোবারকের দাফনের ব্যবস্থা করলেন। এখানেও কিছুটা মতভেদ দেখতে পাই। একজন বলেছেন যে, মহানবীর কিছু সাহাবা এসেছিলেন এবং তাঁরাই দাফন করেছেন। অন্যদল বলেছেন যে, জনমানবহীন মরুভূমিতে সাহাবাদের রূপধারণ করে ফেরেষ্টারা দাফন করে গেছেন। কদর রাত্রিতে ফেরেষ্টা নাজেল হয়, তা হজরত আবু জর গিফারীর মত অতি উচ্চ মানের সাহাবার কাছে ফেরেষ্টাদের আগমনটি এমন কী অবাক হবার কথা। মানুষ সব সময় নিজেকে দিয়ে অন্যকে মাপে বলেই এত মতভেদের দৃশ্য দেখতে হয়। যারা কারামত-মোজেজা মানেন না তারা ফেরেষ্টাদের আগমনটি মেনে নেবেন না। কিছু এই সেদিন এই একবিংশ শতাব্দীর যুগে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী রাম বাহাদুর সাত আট মাস খাদ্য-পানি ছাড়া একটি গাছের তলায় ধ্যানমগ্ন হয়ে ছিলেন। তাঁকে দেখার জন্য নেপালে দুনিয়ার বহু দেশ হতে বহু পর্যটক এসে দেখে গেছেন। যার দরুন নেপাল

সরকারকে সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বিবিসি, সিএনএন এবং অবশেষে ডিসকভারি চ্যানেলে সমস্ত বিষয়টি দেখিয়ে দিল। পৃথিবীর সব ঝানু বিজ্ঞানী আর ডাক্তারেরা একমত হয়ে বললেন যে, পানি পান না করে মানুষ দু’তিন দিনই বা কী করে বেঁচে থাকে? তাঁরা একমত হয়ে বলেছেন যে, এটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এটাকে নিঃসন্দেহে অলৌকিক ঘটনা বা নিদর্শন বলা যায়। কারণ বিজ্ঞান আর চিকিৎসা বিজ্ঞান এ বিষয়ে কোনো উত্তর দিতে পারে না। অবশ্য পবিত্র কোরানে আসহাবে কাহাফ তথা কাহাফবাসীরা যে তিনশত নয় বছর খাদ্যপানি বিহনে ঘুমিয়ে ছিলেন তার দলিলটি পাই। আল্লাহ তাঁর ঔলিদের যে খাদ্যপানি ছাড়া বাঁচিয়ে রাখেন তার দলিল কোরানের সূরা আল ইমরানে পাই। ‘বান ইনদা রাব্বিহিম ইয়ারজাকুন’, তথা ‘বরং ভেতরে ভেতরে তাহাদের রব হইতে রেজেক পাইতেছে’। ঔলিরা মারা যায় না তাই রেজেক পাবার কথাটি বলা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে না পারে তার জন্য বলা হয়েছে ভেতরে ভেতরে তথা গোপনে রেজেক দেওয়া হচ্ছে। রেজেক তো মরা মানুষ খেতে পারে না। মরা মানুষকে স্যালাইন দেওয়াই যায় না। তাই স্যালাইনের সাহায্যে খাওয়াবার প্রশ্নই উঠে না। সুতরাং ঔলিদের কবরগুলো মাজার অথবা রওজা। আম্ম মানুষের কবর নয়। আম্ম মানুষের কবর ভেসে ফেলার কথাটি মুসলিম শরিফ-এ পাওয়া যায়। আর দুনিয়ার বড় বড় নেতাদের

কবরগুলোকে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে রাখার জন্য গুলিদের মাজার হতে অনেক বেশি পয়সা খরচ করে বানাতে দেখি। যদিও দুনিয়ার নেতাদের কবরগুলো আসলেই কবর, কিন্তু বিশেষ মর্যাদার জন্য স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তুলে ধরা হয় যাতে অনাগত কালের মানুষেরা সেই রাজনৈতিক নেতাদের সম্মান করতে পারে এবং দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হতে পারে। সাধারণ মানুষের কবরগুলো রাখতে গেলে সমগ্র বাংলাদেশই একদিন কবরস্থান হয়ে যেতে পারে। সুতরাং কবর আর মাজারের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এইডস রোগটি যেমন দুনিয়াতে হেঁচো ফেলে দিয়েছে এবং এ রোগের নামটি জীবনেও গুনি নি সে রকম বীর বাহাদুর সাত/আট মাস খাদ্যপানি ছাড়া বেঁচে আছেন এবং আরও একজন বেঁচে আছেন তাঁর নাম প্রহ্লাদ জানি। আজব আজব ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ পাক বুঝিয়ে দেন তাঁর আজবের কথাটি এবং সুফিবাদ যে একদম নিরেট সত্য তা বুঝিয়ে দেন দু'চারটি অসাধারণ ঘটনা দেখিয়ে। আমরা তো গণনার বাইরে-সমগ্র ইউরোপ আমেরিকার বড় বড় জ্ঞানীপণীদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে। আল্লাহর খেলা বুঝা বড়ই কষ্টকর। বিজ্ঞানের আজব বিষয়গুলো সহজে কেউ মেনে নিত না যদি চোখের সামনে আজব বিষয়গুলো দেখতে না পেত। কম্পিউটার, রোবট, অপটিক ফাইবার এ রকম হাজারো বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারগুলো

মনের একান্ত অনিচ্ছায় মেনে নিতে হয়। এই কিছুদিন আগেও মোবাইল ফোন আবার

সঙ্গে অডিও, ছবি এবং ভিডিও করার কৌশলগুলো দেখা তো দূরের কথা কল্পনা করাটাও অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আর আজ? বিবর্তনবাদের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এগিয়ে চলছে। এখানে শক্ত মনও মেনে নিতে বাধ্য হয়। রাম বাহাদুর আর গুলশাদ জানির খাদ্যপানি ছাড়া মাসের পর মাস ধ্যানসাধনাটি ইউরোপ আর আমেরিকার মানুষ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। সুফিবাদ যে নিজের পরিচয় জানার একমাত্র পথ সেটা চোখে আসুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। বুঝিয়ে দিয়েছে ধ্যানসাধনা ছাড়া রহস্যলোকের কিছুই জানা যায় না। কেবল বড় বড় কথা শেখা যায় এবং অনুমানের বিশ্বাসটি ধারণ করতে হয়। প্রত্যক্ষ দর্শনের বিশ্বাসটি অর্জন করা যায় না। মহানবী কেন পনেরোটি বছর উঁচু পাহাড়ের একটি নির্জন গুহায় ধ্যানসাধনা করতে গেলেন? আল্লাহর ঘর কাবা তো সামনেই ছিল। আল্লাহর ঘর কাবাতে ধ্যানমগ্ন না হয়ে কেন হেরাগুহায় ধ্যানমগ্ন হতে গেলেন? গৌজামিল আর মনগড়া কথাবার্তা ফেলে একটু নিরপেক্ষ মন নিয়ে কি চিন্তাভাবনা করতে পারেন না? হ্যাঁ—এখানেও তকদির দাঁড়িয়ে আছে। তকদিরে থাকলে ধ্যানসাধনায় এগিয়ে আসবেন, নতুবা কেবল কতকগুলো কথার ফুলঝুড়ি শিখে মহাপণ্ডিত হতে পারবেন, যেখানে বড় বড় ওলিরি বার বার বলেছেন যে, সিনার জ্ঞান তথা সিনার এলেক্স অর্জন

তথা হাসেল করতে হলে ধ্যানসাধনা করতেই হবে। ধ্যানসাধনার জ্ঞান অর্জন করতে হয় চোখ বন্ধ করে বিরাট ধৈর্যধারণ করে। আর মাথার জ্ঞান তথা এলেন্ন অর্জন করতে হয় চোখ খুলে বই পড়ে। বই-পড়া জ্ঞান দিয়ে সিনার জ্ঞানের কিছুই বুঝবার উপায় থাকে না, বরং খুব বেশি হলে সিনার জ্ঞানের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা যায়। এর বেশি কিছু নয়। মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি এত বড় জ্ঞানী হয়েও সিনার এলেন্নের অধিকারী নিরঙ্কর হজরত বাবা শামসেতাব্রিজের কাছে কেন মুরিদ হতে গেলেন? মুরিদ হয়ে ধ্যানসাধনা করার পর যে অমূল্য মহাগ্রন্থটি রচনা করে গেছেন সেই অমর গ্রন্থটির নাম মসনভি। আমরা রুমির রচিত মসনভি-র পরে একটি শ্রদ্ধার বিশেষণ লাগাই আর সেই বিশেষণটির নাম হলো শরিফ তথা পবিত্র। এই শরিফ তথা পবিত্র বিশেষণটি আর কোনো বইতে আজ পর্যন্ত দেখতে পাই না, সে যত বড় সুফিবাদের গবেষকই হোক না কেন। ইবনুল আরাবির জগত বিখ্যাত বই ফতুহাতে মক্কী-র আগে পিছে শরিফ নামক বিশেষণটি নাই, নাই ইমাম গাজ্জালির কোনো রচনাতে, নাই কোনো মহান সুফি দার্শনিকের কোনো রচনায়। ইহা অপ্রিয় হলেও একদম সত্য কথা। তা ছাড়া আরও যা অবাক করে তা হলো রুমি নিজেই মসনভি শরিফ-কে মানুষের রচিত ফারসি ভাষার কোরান বলে ঘোষণা করে গেছেন এবং অবাক হবেন যে, এক ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা বাদে সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছে। সেই

মাগুলানা রুমি ধ্যানসাধনা করার পরই এই মসনতি শরিফ রচনা করে গেছেন। এই বিশাল মসনতি শরিফটি রচনা করার পর তিনি তাঁর পীর বাবা শামসেতাব্রিজ সন্থকে বলেছেন যে, ‘মোল্লা রোম নিজে নিজে কামেল হতে পারে নি, যতক্ষণ না শামসেতাব্রিজের গোলামি গ্রহণ করতে পেরেছি।’ এই জ্ঞান সিনার জ্ঞান বলেই গুরুর মাধ্যমে পাওয়া যায়। ধ্যানসাধনার কথাটি বললে অধম লিখক নিজেই দেখতে পায়, মুরিদদের মাঝে মোচড়ামোচরি (না করার অজুহাত খোঁজা) শুরু হয়ে যায়। আমি সোজা বলে দেই, আসো, মুরিদ হও, আমার কথা মতো মোকাম আর লতিফার বিষয়গুলো জেনে নিয়ে মাত্র চার মাস ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবা করে যাও—যদি রহস্যলোকের কিছুই দেখতে বা জানতে না পারো তো সোজা আমাকে ফেলে অন্যস্থানে মুরিদ হয়ে যেয়ো। সারা জীবন ‘বাবা, বাবা’ ডাকবে, অথচ পাবে না কিছুই, এ বাবা ডেকে কোনো লাভ নেই। জানি, চার মাসের ধ্যানসাধনায় কামেল হতে পারবে না, কিন্তু ধুঁয়া দেখলে যেমন আগুন আছে বোঝা যায় সে রকম একটা স্পর্শ ধারণার দর্শন অবশ্যই পাবে। যদি ধ্যানসাধনার উপযুক্ত না হও তো একটা না একটা উসিলায় উঠিয়ে দেওয়া হবে। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, অনেকে ধ্যানসাধনা করার মনোবল নিয়ে শুরু করেছে, কিন্তু বিশ-পঁচিশ দিন করার পর উঠে গেছে। আবার একদম ওহাবি মতবাদের সমর্থক হয়েও আমার বোবা চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করে চার মাস ধ্যানসাধনা করার

পর সে কী কান্না এবং মোরাকাবা হতে না উঠে আরও চার মাস মোরাকাবার অনুমতি নিয়ে মোরাকাবা করছে। এখানেই তকদিরের খেলা আর এই খেলার মর্ম বুঝা বড়ই জটিল। অনুমানের ইমান যে কোনো মুহুর্তে ভেঙ্গে যেতে পারে। কারণ অনুমানের ইমান অন্ধ। অনুমানের ইমান মরে যাবার পর পাবার খোশ খবরটি শোনায়। অনুমানের ইমান বাকিতে কেনাবেচা করে। অনুমানের ইমানে যে সকল গুরুভক্ত মুরিদ আছে তারা বিলাপের গান শোনায়। বিলাপের ভাষাটি অনেকটা এ রকম, ‘মরণকালে, দয়াল, তুমি দেখা দিও রে’। সারা জীবনে রহস্যলোকের কিছুই জানতে না পেরে গুরুভক্ত হয়ে তো এ রকম বিলাপের গানই গাইবে।

কোরান দুইবার ওলিদের বিষয়ে বলেছে যে, ওলিরা মারা যান না, ওলিরা গোপনে তাদের রব হতে রেজেক পাচ্ছেন; তবু কেন অবিশ্বাস আর সংশয় জাগে? কারণ এই বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া যায় না। প্রমাণ থাকলে আল্লাহর পরীক্ষা থাকে না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিম্নিষে সবাইকে এক উন্মত্তে

পরিণত করতে পারেন, কিন্তু তাতে আল্লাহর মহামূল্যবান পরীক্ষাটি আর থাকে না। এই পরীক্ষা করার জন্যই শয়তানকে খান্নাসরূপে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার খান্নাসকে তাড়িয়ে দেবার তাগিদ দেওয়া হয়েছে

কত রকম বিষয়ের নমুনা তুলে ধরে। কোরানের সমস্ত বিষয়ের মূল বিষয়টি হলো, তোমার পবিত্র নফসের ভেতর যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে পরীক্ষা করার জন্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে উহাকে বের করে দাও, উহা হতে পরিব্রাণ চাও, উহার অপকারিতা হতে সাবধান হও, উহার সূক্ষ্ম ধোঁকাবাজি বুঝতে চেষ্টা করো, উহার অহঙ্কার-উহার প্রতিযোগিতার মনোভাব হতে সজাগ থাকো।

এই শয়তানই সব অপকর্মের মূল হোতা। আর রমজান এলে (মাস শব্দটি নাই) শয়তানদের বেঁধে ফেলা হয়। যদি শয়তানদের বেঁধে ফেলাই হয় তো শয়তানি করার জন্য কোনো শয়তান থাকছে না। তা হলে তো একমাস দুনিয়া জুড়ে কেবল শান্তি আর শান্তি বিরাজ করার কথা। কিন্তু জাগতিক অর্থে এই কথাগুলো বলা হয় নি। সাধকের ভেতরের শয়তানগুলোকে বেঁধে ফেলার কথা এখানে বলা হয়েছে। শয়তান দুনিয়ার সব মানুষগুলোকে বিপথে পরিচালনা করার অনুমতি পেয়েছে। আজরাইল ফেরেস্টা দুনিয়ার সব মানুষের জীবন কেড়ে নেবার অনুমতি পেয়েছে। আর যাকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করা হতো না, আদম যখন মাটি ও পানিতে অবস্থান করছেন তখনও মহানবী নবী আর সেই নবী কি হাজার মিলাদ মাহফিলে হাজির হতে পারেন না? মহানবীর জাত-নূরের তৈরি নূরানি দেহ মোবারকটি কি মহানবীর মহাপবিত্র নফস ও রুহ? এই চিকন কথাগুলোর গবেষণা করতে শিখুন। নূরানি দেহ

মোবারকটিও যে মহানবীর নিকটতম নূরানি পোশাক আগে এই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করতে শিখুন। খোদার কসম, যদি তকদির সহায় থাকে তো এরই মাঝে রহস্যময় প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে যেতে পারেন। তবে রহস্যময় প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবেন মোরাকাবার ধ্যানসাধনায়। মাথার এলিমেন্টর স্কুল-কলেজ আছে, কিন্তু সিনার এলিমেন্ট হাউস করার কোনো স্কুল-কলেজ থাকা তো দূরে থাক, সামান্য প্রশিক্ষণ পাবার সুযোগটিও নাই। মানুষ সত্যকে আলিঙ্গন করতে আগ্রহী, কিন্তু সেই আগ্রহটি উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে মার্চে মারা যায়। কেবল কতকগুলো কেতাবি কথা শেখে এবং এই কেতাবি কথা শিখে তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়। অথচ কিছু কেতাবি কথা শেখা যে আদৌ সুফিবাদ নয় এটা বুঝাবে কে? কোরানের তফসির বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রশ্নে গবেষণার নিরিখে মতপার্থক্য থাকবেই, কিন্তু মূল কোরানের হুবহু অনুবাদটিও যদি ঠিকমত না রাখা হয় তো কী শিখবে? যেমন সামান্য একটি উদাহরণ তুলে ধরছি। কোরান বলছে যে, কাফেররা আল্লাহকে ঢেকে রাখে। অনুবাদক মহাফাঁপরে পড়ে যায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহকে কী করে কাফেররা ঢেকে রাখতে পারে? অনুবাদক অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে অনুবাদটিকে একদম উল্টা করে ফেলে। অনুবাদ করা হয়, ‘কাফেরদের আল্লাহ ঢেকে রাখেন।’ যদি বলি যে, যদি ধরে নিলাম আল্লাহ কাফেরদের ঢেকে রাখে তা হলে বিষয়টা কী দাড়ালো? বিষয়টা এই

দাঁড়ালো যে, কাফেরদের ঢেকে রাখার দরুন কুফুরি করার আর কেউ রইল না। কারণ কুফুরি করেই কাফেররা। কাফেরদের তো ঢেকেই রাখা হয়েছে তাই কুফুরিটা করবে কে? কাফের থাকলে তো কুফুরি করবে। কাফের আছে, কিন্তু ঢেকে রাখা হয়েছে। খোলা রাখা হয় নি যে যা ইচ্ছে তাই করবে। একটি পবিত্র নফসের সঙ্গে রুহ আছে (অবশ্যই জ্বিন এবং ইনসান) এবং খান্নাসরূপী শয়তানও আছে আবার আল্লাহ জাত-রূপ ধারণ করে প্রতিটি মানুষের শাহারগের নিকটেই আছেন। এই রুহকে এবং জাতরূপী আল্লাহকে খান্নাসরূপী শয়তান দুনিয়ার বাহারি লোভ-মোহের চাদর দিয়ে ঢেকে রাখে। তাই রুহ আর আপন রূপ ধরে জেগে উঠতে পারে না। নফসের মাঝে যে শয়তানটি লুকিয়ে আছে তাকে বাহির করার ধ্যানসাধনা করে তাড়িয়ে দিতে পারলেই রুহ আপন মূর্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

এখন আমরা কোরানের সূরা বাকারার দুই শত উনিশ আয়াতে আল্লাহ কী বলেছেন তাই হবহ তুলে ধরছি। ‘এবং আপনাকে প্রশ্ন করে মদ ও জুয়া সম্পর্কে’ (‘ইয়াস্‌আলুনাকা আনিল খামরে ওয়াল খাইসীরে’।) ‘বলুন, ইহাদের দুইটির মধ্যেই বড় গুণাহ রহিয়াছে’ (‘কুল ফিহিমা এমম্মুন কাবিরুন’) ‘এবং মানুষের জন্য উপকারিতাও রহিয়াছে’ (‘ওয়া মানাফেউ শিন নাসে’।) ‘এবং ইহাদের গুণাহ উপকারিতা হইতে অধিকতর বড়’ (‘ওয়া এসম্মুহমা আকবারু মিন নাফয়েহিমা’।) ‘এবং

তাহারা আপনাকে প্রশ্ন করে তাহারা কী ব্যয় করিবে’ (‘ওয়া ইয়াসআলুনাকা মা জা ইউনফিকুনা’।) ‘বলুন, প্রয়োজনের অতিরিক্টটুকু’ (‘কুলিল আফওয়া’) ‘ঐ ভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাহার আয়াতসমূহকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন’ (‘কাজালিকা ইউবাইয়্যেনুল্লাহ লাকুমুল আয়াতে’) ‘সম্ভবতঃ তোমরা চিন্তাশীল হইতে পারিবে।’ (‘লা আল্লাকুম তাতাফাক্ কারুনা।’)

আমার বক্তব্যটি তুলে ধরার জন্য এতগুলো আয়াতের অনুবাদ তুলে না ধরলেও চলতো। কিন্তু বিষয়টি খুবই নাজুক ভেবে পুরোটাই তুলে ধরলাম।

এখানে আমার আসল কথাটি হলো যে, কতটুকু ব্যয় করবে বলে প্রশ্ন করাতে আল্লাহ বললেন, ‘বলুন, প্রয়োজনের অতিরিক্টটুকু’ (কুলিল আফওয়া।) এখন প্রয়োজনের বেশি কিছু থাকলে, থেকে গেলে, ব্যয় করতে বলা হয়েছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ট কিছু থাকলে সেই অতিরিক্টটুকু ব্যয় করলে জাকাত দেবো কেমন করে? জমাই তো থাকছে না, তা হলে জমা টাকা অথবা মালের জাকাত দেবার প্রশ্নই উঠে না। জমা টাকাই নাই তো জাকাত দেব কেমন করে? এখানে এসে এই বিষয়টিতে হজরত আবু জর গিফারি বলছেন যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ট রাখা যাবে না তথা জমা করা যাবে না। সূরা হোমজাতেও এ রকম উপদেশটি পাই। যারা ধন জমা করে এবং গুণে বেছে রাখে তাদেরকে

হতাম্মা নামক জাহান্নামের শাস্তিভোগ করতে হবে। অবশ্য আরও অনেক স্থানে এ রকম কথাগুলো কোরানে পাওয়া যায়। বিস্তারিত জানতে চাইলে অধর্মের মারফতের গোপন কথা এবং শাহ সুফি সদরউদ্দিন আহমদ চিশতীর মসজিদ দর্শন এবং ইসলাম এগেইনস্ট ইনইকুইটি ইংরেজি ভাষায় রচিত বইটি পড়লে পরিষ্কার ধারণাটি হবে বলে আশা করি। হজরত আবু জর গিফারির কথাটির পাল্টা প্রশ্ন করা হলো এই বলে যে, তা হলে জম্মা টাকা না থাকলে বুড়ো বয়সে চলবে কেমন করে ইত্যাদি ইত্যাদি। এক কথায় বলছি যে, হজরত আবু জর গিফারি বললেন যে, মুসলিম রাষ্ট্র বায়তুল মাল নামক ফান্ড বানিয়ে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেবে। কিন্তু সেটা আর হলো না। কিন্তু হজরত আবু জর গিফারির এই দর্শনটির সামান্য অংশ ইউরোপের অনেক দেশ গ্রহণ করে নিয়েছে এবং নেবার পর সেই দেশে আর কমিউনিজম প্রবেশ করতে পারে নি। তবে উনার দর্শনটির সামান্য একটি ভগ্নাংশ গ্রহণ করার দরুন সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানির মত বেশ কয়টি দেশে বেকার এবং বৃদ্ধদের চলার মতো ভাতা দিয়ে যায়। এখন আমাদের গরিব দেশ বাংলাদেশেও বয়স্ক ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা দেবার প্রথা চালু করা হয়েছে। তা যা-ই নামমাত্র দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু দর্শনটি তো চালু হয়েছে। তারপর হজরত আবু জর গিফারির বিষয়ে অনেক কথা আছে, কিন্তু এখানে আর না।

মাও সে তুং-এর দর্শনটিকে আমূল পরিবর্তন করলেন দেং জিয়াও পিং। তিনি সীমিত পুঁজিবাদ মেনে নিলেন এবং তাই মেনে নেয়ার পর বিশ্ববাজারে চীন আজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। হো চি মিনের দেশ ভিয়েতনামে কমিউনিজম রোগা হয়ে যাচ্ছে দেখে কৃষকদেরকে ভূমির অধিকার দেওয়া হলো এই শর্তে যে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে পরিমাণ ধান উৎপাদন হয় উহা সরকারকে দিয়ে বাকি যা থাকবে তা কৃষকের। এই প্রয়োগ-ব্যবস্থায় ধান উৎপাদনে এক বিস্ময়কর অবদান রাখলো কৃষকেরা। দেখা গেল, সরকারকে বেঁধে-দেওয়া ধানটুকু দেবার পর দশগুণ ধান উৎপন্ন করছে কৃষক। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষক উৎপাদন করছে ধান এবং এত বেশি ধান হচ্ছে যে, আগের চেয়ে দশগুণ ধান হচ্ছে। এক ভাগ সরকারকে দিয়ে বাকি ন'ভাগ কৃষক পেয়ে কী যে আনন্দ পাচ্ছে! (বিষয়টি নিজের ভাষায় খুবই ছোট করে লিখেছি, কিন্তু বিষয়টি জেনেছি মাটি ও মানুষ-এর উপস্থাপক শ্রদ্ধেয় জনাব শাইখ সিরাজ হতে)।

যেহেতু হজরত আবু জর গিফারির দর্শনটি গ্রহণ করা হয় নি এবং ধনসম্পদ জমা করার বিধানটি রাখা হলো, তাই জাকাত নামক একটি ট্যাক্স চালু করা হল। এই ট্যাক্স নামক জাকাতটিই এখন বাজারে একমাত্র জাকাত হয়ে গেছে। হাকিকি জাকাত তথা আসল জাকাত

বিষয়টির রহস্য বেশির ভাগ মানুষই জানে না। ‘আল বদর’, ‘রাজাকার’ এ দুটো বড়ই পবিত্র নাম ইসলামে। বদরের যুদ্ধটি ছিল ইসলামের বাঁচা-মরার যুদ্ধ। ‘রাজাকার’ মানে যারা গরিব, অসহায়, এতিম ইত্যাদির সাহায্য-সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসেন অথবা এসেছেন। অথচ বাঙলার মানুষ এই দুটো নাম শুনে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। মীর জাফর আলী খাঁ-কে মীরজাফর বলে, আর এই নাম রাখা তো দূরের কথা, বরং বিশ্বাসঘাতকতার প্রতীকরূপে গালি দেয়। সুনীতি লেবাসে নামাজে রোজায় কোনো অংশের কোনো ঘাটতিই ছিল না, অথচ জাতির সঙ্গে বেইমানি করার দরুন সব কিছু ভেঙে গেল। বহু মানুষের আত্মানত খেয়ানত করে, বহু মানুষের জন্ম দখল করে, এতিমের হক মেরে দিয়ে প্রায় প্রতি বছর একজনকে হজ করতে দেখি; অবশ্য আমার রোগী, তাই বলেছিলাম যে, প্রতি বছর হজ করতে আপনার কষ্ট হয় না? বললেন, এ জন্য হজ করি যে হজ করার পর সমস্ত গুণাহ আল্লাহ মাফ করে দেন এবং নবজাত শিশুর মতো হয়ে যায়। অধম লিখক বললাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। কী করবো? প্রতিবাদ? না, করবো না। কারণ সূরা আরাফের একশত আটানব্বই নম্বর আয়াতের এক অংশে আল্লাহ মহানবীকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, ‘আপনি দেখছেন-তারা আপনাকে দেখছে, অথচ তারা আপনাকে দেখছে না।’ দেখা শব্দটি তিনবার বলা

হলো। বলা হলো দেখছে, অথচ দেখছে না। এর ব্যাখ্যাটুকু পাঠকের কাছেই ছেড়ে দিলাম।

মনে রাখতে হবে, অথবা বিষয়টি গবেষণা করা উচিত যে, যেখানেই মালের জাকাত কথাটি বলা হয়েছে অথবা অবতারণা করা হয়েছে সেখানেই সদকা শব্দটি কোরান ব্যবহার করেছে। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও থাকতে

পারে। একটি সুক্ষ্ম প্রশ্ন থেকে যায় বলে কোরান সেই প্রশ্নের অবকাশ রাখে নি। সেই প্রশ্নটি কী? প্রশ্নটি হলো প্রত্যেক নবী-রসূল সালাত ও জাকাত দান করেছেন। এটা সবারই জানা থাকার কথা। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখতে গেলেই মূল জাকাতে মালের জাকাতটি থাকছে না। প্রথম পূর্ণ মানব হজরত আদম নবী ও রসূল ছিলেন। তিনি কাকে মালের জাকাত দেবেন? শরিয়তের আইনে স্বী-পুত্র-কন্যাদের জাকাত দেওয়া যায় না। আদম নবীর স্বী মা হাওয়া, পুত্র হাবিল আর কাবিল এবং কন্যাদের মালের জাকাত দেবেন কেমন করে? দুনিয়াতে হজরত আদমের এই পরমাত্মীয় ছাড়া আর কেউ তো নাই। থাকলে তো মালের জাকাত দেবার প্রশ্নটি আসে। প্রত্যেক নবী সালাত আর জাকাত আদায় করলে হজরত আদমও তো নবী। কেবল নবীই নন, বরং রসূলও। হজরত আদমের মালের জাকাত নেবার কেউ নাই অথচ প্রত্যেক নবীদের

বেলায় বলা হয়েছে সালাত ও জাকাত আদায় করেছেন। এ জন্যই মালের জাকাতের কথাটি যখন আসে তখন সাদকা শব্দটি কোরআন ব্যবহার করেছে।

কোরানের সূরা আত্ তাওবার ষাট নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে ‘নিশ্চয়ই সাদকা ফকির এবং মিসকিন (-দের জন্য)।’ ‘ইন্নামা সাদাকাতু লিল্ ফুকারায়ে ওয়াল মাসাকিনে।’ ‘এবং (এই বিষয়ের) আলেমিনা (-দের জন্য)।’ ‘ওয়াল আলেমিনা’। ‘এবং ইসলামের দিকে যাহাদের হৃদয় আকর্ষণ করা প্রয়োজন তাহাদের জন্য।’ ‘আলাইহা ওয়াল মুআল্লাফাতে কুলুবুহুম।’ ‘এবং দাস মুক্তির জন্য।’ ‘ওয়াফির রেকাবে’। ‘এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য।’ ‘ওয়াল গায়েমিনা’। ‘এবং আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য’। ‘ওয়া ফিসাবেলিল্লাহে’। ‘এবং মুসাফিরদের জন্য’। ‘ওয়াব নিস্‌সাবিলে’। ‘এই সব হইল আল্লাহর পক্ষ হইতে নির্ধারিত ব্যয়ের খাত’। ‘ফাবিফাতান্ মিনাল্লাহে’। ‘এবং আল্লাহ সর্ব বিষয়ে অবগত এবং সর্বজ্ঞ হেকমতওয়ালা।’ ‘ওয়াল্লাহু আলিমুন হাকিমুন।’

এই সাদকারূপী জাকাত ফকির এবং মিসকিনদের একটি অংশ দেবার কথাটি পাই। ফকির এবং মিসকিন শব্দ দুটো দিয়ে বুঝানো হয়েছে মেজাজি ফকির এবং হাকিকি ফকির, মেজাজি মিসকিন এবং হাকিকি মিসকিন। অভাবগ্রস্ত ফকির এবং আল্লাহর ধ্যানসাধনায় রত ফকির।

কিছুই নাই-কে বলে মিসকিন তথা এক কথায় সর্বহারা, আবার আল্লাহর ধ্যানসাধনায় রত মাজ্জুব, যাদের কোনো কিছুই নাই, তথা যেখানে রাত সেখানেই কাত, এ রকম ধ্যানসাধনায় রত যারা তাদেরকে মিসকিন বলা হয়। সমাজ জীবনে অনেকেই মেকাজ্জি অর্থটিকে গ্রহণ করে নেয় এবং হাকিকি অর্থটি সমাজে চালু না থাকাতে অনেকেই হাকিকি অর্থটি জ্ঞানবার ইচ্ছা থাকলেও জ্ঞানতে পারে না। কোরানের মাত্র হাতে-গোনা কয়েকটি বিষয় আছে যাদের অর্থের মাঝে মেকাজ্জিও নাই আবার হাকিকিও নাই। তা না হলে প্রতিটি বিষয়ের মেকাজ্জি আর হাকিকি অর্থ আছে। আবার কোরানের প্রতিটি বিষয়ের একটি মাত্র উদ্দেশ্য বলা হয়েছে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন শৈলীতে তথা স্টাইলে। আর সেই একমাত্র বিষয়টি হলো, তোমার মনের ভেতর আল্লাহ কর্তৃক ইচ্ছাকৃত পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া খান্নাসরূপী শয়তানটিকে মন হতে দূর করে দিয়ে সম্পূর্ণরূপে একা হয়ে যাও। মনের মাঝে খান্নাসরূপী শয়তানকে নিয়ে বাস করাটাকেই বলা হয় শেরেকে বাস করা। এই শেরেক দূর করে তৌহিদে আসার জন্য এত কথা, এত আয়োজন, এত উপদেশ, এত বিলাপ, এত ভয় দেখানো ইত্যাদি ইত্যাদি। শেরেক কোথাও বাস করে না এবং শেরেককে কোথাও বাস করার বিধান কোরান দেয় নাই। সুতরাং সমস্ত জগতও তৌহিদে বাস করে। কেবলমাত্র মনটাই তৌহিদে বাস করে না, কারণ শয়তানের থাকবার একমাত্র বাসস্থানটিই হল মন।

এই মন ছাড়া আর কোথাও শয়তানকে থাকবার অনুমতি দান করা হয় নাই। আমরা শয়তানকে বাহিরে খুঁজি এবং এই বাহিরে খোঁজাটাই একদম বোকামি। আমরা আল্লাহকে বাহিরে খুঁজি, কিন্তু বাহির আল্লাহর সেফাতসমূহ দিয়ে ভরপুর। বাহিরে আল্লাহর জ্ঞাত নাই এবং থাকার বিধান নাই। আল্লাহর জ্ঞাত রূপটিও মানুষের অতি নিকটেই আছে। তাই কোরান বলছে যে, আল্লাহ মানুষের শাহারগের নিকটেই আছে। তাই দেখতে পাই যে, আল্লাহ জ্ঞাতরূপে থাকেন অথবা আছেন মাত্র তিনটি ঘরে : একটি লা-মোকামে এবং অপর দুইটি হলো জ্বিনের অতি নিকটে এবং মানুষের অতি নিকটে। এই কথাগুলো, এই বিষয়গুলো ভালো করে জানা না থাকলে কথায়, লিখনিতে কেবল উল্টাপাল্টা কথার বস্তা ও বুড়ি পাওয়া যায় এবং কলুর চোখে বাঁধা বলদের মতো সারাদিন ঘুরে মনে হবে অনেক পথ এগিয়ে গেলাম, কিন্তু চোখের বাঁধন খুলে দেবার পর দেখতে পায় যে, একই স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। কত বড় হেকমতওয়ালা হলে আল্লাহ এই মানুষগুলোকে লোভ ও মোহের ঘানি টানাচ্ছে আর ‘আমার, আমার’ করছে। কিন্তু দেহধারণ করা মানুষগুলো খুব বেশি হলে শত বছর আয়ু পায় এবং দেহটি ত্যাগ করার পর জীবাত্মা তথা নফস দেখতে পায়—অনেক পথ হাঁটলাম, অনেক কিছু করলাম, কিন্তু একই স্থানে দাঁড়িয়ে আছি এবং কিছুই করলাম না। একখণ্ড জমির আমানতদার (মালিক বলা হারাম, কারণ সব কিছুর মালিক হলেন

সর্বশক্তিমান আল্লাহ) হয়ে কত খুশি আর আনন্দ, কিন্তু জম্মি হাসে আর বলে যে, জম্মিটি মাটি

এবং তোমার দেহটিও মাটি, তাই মাটি মাটিকে আকর্ষণ করে এবং খান্নাসরূপী শয়তান লোভ ও মোহের কালো কবুল দিয়ে বিবেকটিকে ঢেকে রাখে এবং বিবেকটাকে কালো কবুল দিয়ে ঢেকে রাখার জন্যই শয়তানটিকে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয় শয়তানটিকে মুসলমান বানাও, নয়তো শয়তানটিকে ধ্যানসাধনা করে তাড়িয়ে দাও। কথা দুইটি, আসলে বিষয় একটি। হজরত আমির খসরুর ঠুমরি রাগের মত। ‘কায়সে লাগে জিয়ারা মোরা’ বাক্য মাত্র একটি, কিন্তু সুর আর শৈলীর ছন্দ কত বাহারি রকমে আর চমকে ভরপুর।

তারপর আসে ‘ওয়াল আলেমিনা’ তথা ‘এবং আলেমদের জন্য মালের জাকাত।’ এখানেও মেজাজি এবং হাকিকি আলেমদের জন্য বলা হয়েছে। যারা মালের জাকাত সংগ্রহ করবে সেই সব কর্মচারীদের জন্য। মেজাজি জাকাতের মাল যারা সংগ্রহ করার কাজে লিপ্ত থাকবে তাদের জন্য ব্যয় করার কথাটি বলা হয়েছে। মেজাজি জাকাত সংগ্রহের প্রশ্নে একটি বিভাগ খোলার ইঙ্গিত পাই। মালের জাকাত সংগ্রহ করে কোথায় কীভাবে ব্যয় করতে হবে তার একটি ইশারা দেওয়া হচ্ছে। তাই ‘আলেমিনা’ শব্দটির দ্বারা যারা মালের জাকাত সংগ্রহ করার কর্মচারী

তাদের কথাটি ম্লেজাজি অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আর হাকিকি অর্থে যারা আলেম তথা জ্ঞানী অথচ গরিব তাদের দেবার কথাটি বলা হচ্ছে। যারা ইসলামকে গ্রহণ করতে চায় অথচ সমাজবদ্ধ হয়ে আছে অথবা অন্য কোনো বিধানে জড়িয়ে আছে এবং সেই বিধান ভঙ্গ করে ইসলামকে গ্রহণ করতে গেলে নানা রকম অর্থনৈতিক বাধাবিলম্বের মুখোমুখি হতে হবে তাদের জন্য মালের জাকাত দিয়ে উদ্ধার কথাটি বলা হয়েছে তথা ইসলামের ছায়াতলে আসতে গেলে সামাজিক বন্ধন ভেঙ্গে আসার দরুণ অর্থকষ্টের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকলে তাদেরকে মালের জাকাত দেবার কথাটি বলা হয়েছে। তারপর বলা হচ্ছে ‘ওয়াফির রেকাবে’ তথা ‘এবং দাসমুক্তির জন্য’। এখানেও দাসমুক্তির কথাটিতে ম্লেজাজি এবং হাকিকি অর্থ আছে। ম্লেজাজি অর্থে যারা দাস তথা কেনা গোলাম তথা যে যুগে হাটবাজারে মানুষ কেনাবেচা হতো সেই যুগে মালের জাকাত দিয়ে দাসমুক্তির কথাটি বলা হয়েছে। এখন এ যুগে হাটবাজারে মানুষ কেনাবেচা হয় না তাই দাসমুক্তির প্রশ্নের এই আয়াতটিকে মনসুক তথা এর কার্যকারিতার প্রশ্নটি আসে না। ম্লেজাজি অর্থে ইহা সঠিক, কিন্তু হাকিকি অর্থটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। হাকিকি অর্থটি হলো, যারা আপন আপন নফসের খাহশের গোলামি করছে তারাও দাস। নফসের খাহশের যারা গোলাম তারা তো চিরন্তন দাস। এদের বেলায় কোরানের এই আয়াতটিকে কেমন করে মনসুক তথা

কার্যকারিতা নাই বলতে চাইবেন? তবে একটি কথা থেকে যায় আর সেটা হলো, মেজাজি জাকাত দিয়ে মেজাজি গোলামকে যেমন মুক্ত করা যায় সে রকম যারা আপন নফসের খাহেশিয়তের গোলামি করছে তাদেরকে হাকিকি জাকাত দেবার কথাটি আসে। হাকিকি জাকাত তিনিই দিতে পারেন যিনি হাকিকি জ্ঞান তথা সিনার জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছেন। কারণ নফসের প্রবৃত্তির যারা গোলাম তাদেরকে মূর্তিপূজা করছে বলা হয়েছে। নফসের প্রবৃত্তির এক একটি শাখা-প্রশাখা এক একটি মূর্তি, সুতরাং নফসের প্রবৃত্তির পূজা করার মানেই হল অনেক মূর্তির পূজা করা। বাহিরের মেজাজি মূর্তির পূজা করার চেয়ে ভয়ঙ্কর হলো আপন নফসের প্রবৃত্তির ভেতর লুকিয়ে থাকা অদৃশ্য মূর্তিগুলোকে পূজা করা। এই জাতীয় মূর্তিপূজা হতে মুক্তিলাভ করার উপায় যাদের নিকট হতে পাওয়া যায় তাদেরকেও জাকাত দেবার কথাটি আসে। কারণ পবিত্র নফসের সঙ্গে খান্নাসরুপী শয়তানদের গোলামি হতে মুক্তিলাভ করাটাই হলো হাকিকি জাকাত পাওয়া। হাকিকি জাকাত তারাই দিতে পারেন যারা পবিত্র নফস হতে খান্নাসরুপী শয়তানটিকে বের করে দিতে পেরেছেন, তথা মুক্ত হতে পেরেছেন, তথা খান্নাসরুপী শয়তানটিকে মুসলমান বানিয়ে ফেলতে পেরেছেন। একটিমাত্র কথা, কিন্তু উপদেশের ভাষা ও বাক্যগুলোর কত রকম বাহারি ঢং। এই বাহারি ভাষার ঢংগুলোকে ধরতে না পারলে তথা বুঝতে না পারলে মনে হবে

কত যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার ইয়াত্তা নাই। আল্লাহ হেকমতওয়ালা, আল্লাহ জুল জালাল, আল্লাহ ইকরাম তাই তাঁর ভাষার শৈলী বুঝাটা চারটিখানি কথা নয়।

তাই আমরা পদে পদে ভুল করি। বুঝতে চেষ্টা করেও অদৃশ্য কারণে বুঝতে পারি না। কারণ খান্নাসরুপী শয়তানটি যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র নফসের সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভুল করাটা স্বাভাবিক। তাই এই শয়তানটিকে তাড়িয়ে দেবার আশ্বান করছে কোরান। বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্যই এই শয়তানটিকে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেবলমাত্র পরীক্ষা করার জন্য। তাই বড় বড় ওলিদের প্রশ্ন করতে গেলে তারা বলেন যে, এই শয়তানটিকে মুসলমান বানাতে গিয়ে বারো বছর, পনের বছর ধ্যানসাধনা করতে হয়েছে তথা মোরাকাবা-মোশাহেদা করতে হয়েছে। তাই ওলিরা বলেন যে, মনে হবে কত রকম পরীক্ষা দিতে হবে, কিন্তু আল্লাহর পরীক্ষাটি মাত্র একটি পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষাটি হলো, নিজের পবিত্র নফসের সঙ্গে যে শয়তানটি খান্নাসরুপে বিরাজ করছে সেই শয়তানটিকে মুসলমান বানিয়ে ফেলা। কারণ এই শয়তানের চাওয়া আর পাওয়ার কোনো

শেষ নাই। যত পাবে ততই চাইবে। অথচ এই শয়তানের একমাত্র বাসস্থানটি হল প্রতিটি মানুষের অন্তর (জিনদের কথাটি ইচ্ছা করেই

বলা হলো না)। মানুষের হাত-পা, চোখ-কান তথা এক কথায় সমস্ত দেহটি মুসলমান, কিন্তু অন্তরটি মুসলমান নয়। কারণ অন্তরের মাঝেই আর একজন বাস করছে আর তারই নাম শয়তান। (অবশ্য রুহুও বাস করছে তবে এখানে বুঝাবার জন্য বলা হলো না)। এই শয়তানটি অন্তরে বাস করে মানুষকে যে কত রকম নাজেহাল করে, কত রকম যে মিথ্যা বলতে হয়, কত রকম যে ঘৃণ্য প্রতিযোগিতা করতে হয়, কত রকম যে দাতা সাজতে হয়, কত রকম যে কুপণ হতে হয়, কত রকম যে স্বার্থ হাসিলের জঘন্য চালাকি করতে হয়, কত রকম যে হিংসা-বিদ্বেষ করতে হয় তা বলে এবং বুঝিয়ে শেষ করা যাবে না। হাকিকতে প্রতিটি মানুষ শয়তানের গোলামি করছে, কিন্তু মেক্জাজিতে মনেই হবে না যে শয়তানের গোলামি করছে। তাই আল্লাহর ওলিরা দুনিয়ার এই চাকচিক্যের মাঝেও নির্জনে ধ্যানসাধনাটি করে যায়। মেক্জাজি ইবাদতের অনুসারীরা বুঝতেই পারে না যে শয়তানটি বহাল তবয়তে আপন আপন অন্তরে বাস করছে। অন্তর হতে শয়তানটি পরিষ্কার করতে পারে নি, অথচ চলনে-বলনে-লেবাসে তাদেরকেই খাঁটি মনে করে ভুল করছি। হায় রে আল্লাহর পরীক্ষা! সব কিছু বুঝেও শয়তান কিছুই বুঝতে দেয় না। কারণ শয়তান শিখিয়ে দেয় যে, বাহিরে খুঁজে দেখ শয়তান কোথায় আছে। বাহিরে শয়তান থাকে না। থাকবার বিধানটি কোরানে দেওয়া হয় নাই। অথচ মানুষ বাহিরের শয়তান খোঁজে। আপন অন্তরে শয়তান বাস করছে,

অথচ খুঁজতে হয় বাহিরে। মানুষ জানে যে, আসমান-জমিন আল্লাহর তসবিহ পাঠ করছে, আসমান জমিন আল্লাহর তৌহিদে বাস করছে, তবু এত বড় মহাসত্যটি জানবার পরও মানুষ ভুলে যায় যে, তার আপন হৃদয়ঘরেই শয়তান বাস করছে, শয়তান মিটি মিটি হাসছে। এই আপন হৃদয়ঘরে বাস করা শয়তান মানুষকে শয়তানের গোলাম বানিয়ে রেখেছে, মানুষকে শয়তানের কেনা গোলাম বানিয়ে রেখেছে। আপন হৃদয়ঘরে শয়তান বাস করে কত প্রকার শোষণ, নির্যাতন, জুলুম-অত্যাচার, ঘৃণ্য প্রতিযোগিতা, খুনখারাপি, দুর্নীতি আর ঘুষ-চুরি-ডাকাতি শিখিয়ে দিচ্ছে তার ইয়াত্তা নাই। আরও চাই আরও চাই করেও চাওয়ার শেষ নাই। ঠুনকো সম্মানের মূল্য নাকের ওপর ঝুলিয়ে শয়তান মানুষকে দিয়ে গাধার মতো ঘুরাচ্ছে অথচ মানুষ বুঝতেই পারে না যে, সে শয়তানের গোলামি করছে। গাবতলি বাজারের গরু-ছাগলে হাট হতে কিনে আনা গরুর মতো শয়তানের গোলামি করছে এটা মানুষ বুঝতেই পারে না। যখন বুঝতে পারে তখন নফস মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে ফেলেছে। মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার পর সব কিছু দিবালোকের মত পরিষ্কার। তখন আর বুঝেও লাভ নাই। শয়তান তখন কী বলে সূরা হাশরটি ভালো করে বার বার পড়ে দেখুন। ফেরকাবাজির তফসির দিয়ে বাজার ছেয়ে গেছে। তাই কোরানের কয়েকটি তফসির পড়ুন। তখন বুঝতে পারবেন যে, বিষয়টি কত পরিষ্কার, কত স্বচ্ছ। এই

জীবনের আমলনামা তথা কর্মফল নিয়ে আখেরাতে বিচার হবে। বিচার অনুসারে কর্মফলের ভোগটি দেহধারণ করে করতেই হবে। ইহাই অমোঘ বিধান। বার বার দেহধারণ করে মানুষ তার কর্মফল ভোগ করে চলছে। এই কর্মফলের ভোগটি কর্ম অনুসারে করতে হয়। তাই বাহারি শাস্তিভোগের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। তাই আল্লাহ কোরানের সূরা মুলককে বলছেন, আমাদের সৃষ্টির মাঝে কোনো ভুল নাই, তুমি বার বার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চেষ্টা কর, দেখতে পাবে কোনো ভুল তো নাই, বরং তোমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে। সুতরাং অনুরোধ করছি, আস্তান জানাচ্ছি যে, কিছুদিন গুরু দেওয়া মোরাকাবাটি করে দেখুন নির্জনে একাকী-কদর রাতের মত কোনো একটি সৌভাগ্যের রজনী তথা রাতের রহস্য আপনার ভাগ্যে জোটে কি না। যদি না জোটে, যদি সেই রহস্যের রজনীর দর্শনটি না হয়, তো গুরু ফেলে দিয়ে আরেক গুরু ধরুন। কারণ গুরু এখানে মুখ্য নয়, বরং বিষয়টি হয়ে রহস্যের রজনীটি পাওয়া। এই মোরাকাবা তথা ধ্যানসাধনাটিই হল নফসের সঙ্গে লুকিয়ে থাকা শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। এই জেহাদ তরবারি অথবা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আশি বছরের বেশি দৌড়াদৌড়ির জেহাদ নয়। ওহাবিরা গুরুই মানে না এবং কিছু ফেরকা বা দল এক ইসলামে আছে যারা গুরু তথা পীর মানে, কিন্তু পীর কেমন হবে তার সংজ্ঞা তথা ব্যাখ্যা দিয়েছে। কী সুন্দর (?)

ব্যাখ্যা! কোরানের তফসির জানতে হবে, মেশকাত শরিফ জানতে হবে, মাসলা-মাসায়েল জানতে হবে ইত্যাদি। এ রকম পীর বা গুরু বাজারে অনেক অনেক পাওয়া যায়। এই জাতীয় পীরেরা মাথার জ্ঞান দেবার পীর, কারণ সিনার এলেন কাকে বলে তা বিশ্বাসই করতে পারে না। ধ্যানসাধনার জ্ঞানটিকে সম্মান করা তো দূরে থাক বরং ধ্যানসাধনাটাকে বিশ্বাস করতে চায় না এবং এই জাতীয় পীরদের পাল্লায় পড়ে সরল সহজ মানুষগুলো পীর-মুরিদের রহস্যটাই বুঝতে পারে না। সুফিবাদের মাঝে সৈনিক ধর্মের কতগুলো উপাসনা শিখিয়ে দেওয়া হয় এবং মরে যাবার পর সব কিছু পাবার কথাটি শুনিয়ে দেয়। সব কিছু বাকি। নগদ পাবার একটি বাক্যও এদের কাছে পাওয়া যায় না। সারা জীবন কেবল ‘পীর, পীর’ করতে থাকুন তারপর মরার পর সব কিছু পেয়ে যাবার সংবাদ দান করা হয়। এরা সুফিবাদের নাসুত, মালাকুত, জাবরুত এবং লাহুত মোকামগুলোর কিছুই জানে না এবং জানা থাকলেও ভাসা ভাসা মৌখিক কতগুলো কথা জানে, কিন্তু আসল কথাগুলোর কিছুই জানে না। এরা আরও মারাত্মক এবং এদের ফাঁদেই পা দুটো একবার আটকালে আর ছুটে যাবার উপায় থাকে না। এরা জানে না যে, লাহুত মোকামে যখন কোনো সাধক আল্লাহর রহমতে (আল্লাহর রহমত ছাড়া অসম্ভব) প্রবেশ করতে পারেন তখন দেখতে পান, আপন পীর বা গুরু ডান দিক দিয়ে চলে যান (রূপক তথা মেজাজি ভাষায়) এবং আপনার মাঝে লুকিয়ে

থাকা ধোঁকা দেবার প্রাচীন সর্দার খান্নাসরূপী শয়তানটি বাম দিক দিয়ে পালিয়ে যায় (রূপক তথা ম্লেজাজি ভাষায়)। তখন সাধক কেবল নিজেকেই দেখতে পান। তখনই এক এক সাধক এক এক রকম কথা বলে ফেলেন। কোনো সাধক বলে ফেলেন, ‘আমিই সত্য’; কোনো সাধক বলে ফেলেন, ‘এই জুব্বার মাঝে আল্লাহ ছাড়া কেহ নাই’; কোনো সাধক বলে ফেলেন, ‘আমিই আমার পীর, আমিই আমার মুরিদ’; কোনো সাধক বলে ফেলেন, ‘তিনিই আমি, আমিই তিনি’ ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই জন্য ঘট করে মুরিদ হতে নাই। দেখে শুনে কিছুদিন বুঝে তারপর সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অবশ্য এখানেও তকদির নামক বিষয়টি দাঁড়িয়ে থাকে। এ যেন পদে পদে জ্বালা আর যন্ত্রণা। কেন এতগুলো কথা বলতে গেলাম? এই জাতীয় কথা তো আরও বলা হয়েছে। এ জন্য বললাম যে, ওহাবিরা সুফিবাদ মানে না এবং যারা সুফিবাদের পিলার তথা স্তম্ভ তাদেরকেই কাফের বলে এবং সোজা বলে দেয় যে, পীরপূজা ইসলামেতে নাই, তাদের কাছে হাজার মাসের জেহাদ হতে কদর রাব্রির মর্যাদাটি অধিক বললে কী মূল্যটা বুঝবে? এদের ব্যাখ্যা পড়লে এবং টেলিভিশনে এদের বয়ান শুনলে অবাক হবেন। অম্মুক ধর্মের অনুসারী একজন হাজার মাস জেহাদ করে গেছেন। সেই পবিত্র লোকটি কেমন করে এবং কীভাবে জেহাদ করে গেলেন? হাতে তলোয়ার নিয়ে (আগ্নেয়ান্ন তখন ছিল না) যেখানেই কুফুরী (?) করা দেখতেন সেখানেই

একা ঝাঁপিয়ে পড়তেন জেহাদে। বা! কী সুন্দর শিশুর মতো কথা! উনি তলোয়ার নিয়ে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন আর যারা কুফুরি (?) করছে তারা হাত গুটিয়ে মার খেয়ে গেছে আশিটি বছরের উপরে। এও কি সম্ভব! কিন্তু সেই জেহাদি ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নি! কুফুরি করনেওয়ালারা একদ্র হয়ে কি একজন জেহাদিকে কিছুই করতে পারলো না? ওহাবিদের জেহাদটি হল তরবারির জেহাদ তথা বাহিরের জেহাদ। হ্যাঁ-ইহাও জেহাদ, তবে ছোট জেহাদ। তবুকের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর যখন সাহাবারা মহানবীর সামনে আসলেন তখন মহানবী সাহাবাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমরা ছোট জেহাদে জয়লাভ করেছ, এখন বড় জেহাদটি করতে শেখো। সাহাবারা বললেন, বড় জেহাদটি কেমন করে করবো? মহানবী বললেন, নিজের নফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাই হল বড় জেহাদ তথা জেহাদে আকবর। (হবহ নয়)। ঐ ইহদি সাধক আশি বছরের অধিক সময় ধ্যানসাধনা করে যা পেয়েছেন মহানবীর উন্নতেরা মাত্র পনের বছর ধ্যানসাধনাটি করে তার চেয়েও অধিক পাবার কথাটি বলে গেলেন। এখানে আবার পনের বছরের কথাটি কোথা হতে এল? মহানবী হেরাণ্ডহায় পনের বছর ধ্যানসাধনা করার পরই যখন যে রাত্রিতে সমস্ত রহস্যের দরজাগুলো খুলে গেল সেই রাত্রিটি কত বড় শক্তিশালী রাত্রি, কত বড় সৌভাগ্যের রাত্রি। সেই রাত্রিতে নাজেল করা হয় ফেরেশতাদের এবং একবচনে রুহ।

নাঙ্গেল অর্থ সব কিছুৰ রহস্য খুলে যায় সেই সাধকের কাছে। সুতরাং ইহা ব্যক্তিকেদ্বিক। মহানবী সমস্ত আলমের রহমত। সুতরাং সবাইকে এই রহমত বণ্টন করার কথাটি থাকতে হয়। তাই মহানবী একটি নির্দিষ্ট রাত্রিকে না বলে রমজানের শেষের দিকে বেজোড় রাতগুলোতে খোঁজার কথাটি বলেছেন। বেজোড় কেন বললেন? বেজোড় অর্থটি হলো এক। যেদিন সাধক খান্নাসরূপী শয়তানটিকে নফস হতে বের করে দিতে পারবেন সেদিনই সাধক বেজোড় তথা একের মাঝে অবস্থান করতে পারবেন। নফস আর খান্নাস দুই হয়ে যায় তথা জোড় হয়ে যায়, তাই জোড় রাতে নয় বরং খান্নাসকে দূর করলেই বেজোড় হয়, তাই বেজোড় রাতেই কদর রাত্রিকে খোঁজার কথাটি বলা হয়েছে। এত কথা এত বাক্য আর ভাষার শৈলী, অথচ সব কথার মাঝেই লুকিয়ে আছে মাত্র একটি কথা। আর সেই কথাটি হলো : নফসের সঙ্গে যে খান্নাসরূপী শয়তানটি অবস্থান করছে উহাকে তাড়িয়ে দাও, বের করে দাও, মুসলমান বানিয়ে ফেল, জিজির দিয়ে বেঁধে ফেল, উদউনা নয় বরং উদউনি তথা দুইজন নয় বরং একা হও তা হলে ডাকের জবাবটি সঙ্গে সঙ্গে পাবে ইত্যাদি কথাগুলোর মাঝে মাত্র একটি কথাই বলা হয়েছে আর সেটা হলো তোমার হৃদয়ে যে খান্নাসরূপী শয়তানটিকে পরীক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে উহাকে তাড়িয়ে দাও, উহাকে বের করে দিয়ে একা হতে চেষ্টা কর। দুই জন একটি হৃদয়ে বাস করলে জোড় হয়ে

যায়, তাই বের করে দিলে বেজোড় হয়ে যায় তথা একা হয়ে যায়। যেইমাত্র সাধক পনের বছর ধ্যানসাধনা করার পর কদর রাত্রিটি রহমতরূপে নাজেল হয় তখন সাধকের শাহারগের কাছেই রবরূপটি ধারণ করে থাকা আল্লাহর রূহরূপটির দর্শন হয় এবং রূহরূপটি উদ্ভাসিত হলেই ফেরেস্তুদের নাজেল হবার কথাটি প্রায়ই পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে যে,

এখানে কিছু পনের বছরের ধ্যানসাধনাটির কথা বলা হয় নি। বরং মহানবীর নিজের জীবনের হেরাণ্ডহার পনের বছর ধ্যানসাধনাটির উল্লেখ মাত্র। তাই মহানবী সবার জন্য একটি মেজাজি কদর রাত্রির কথাটি বলেছেন, কিছু সুনির্দিষ্ট করে বলেন নি যে, অমুক রাত্রিটিই কদর রাত্রি। অপরপক্ষে মহানবীকে সাহাবারা যখন বললেন যে, মসজিদুল হারাম হতে কোন মসজিদটি সবচেয়ে দূরে তথা দূরতম মসজিদ কোনটি? মহানবী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মসজিদুল আকসা। সাহাবারা বললেন, মসজিদুল আকসায় যেতে কত দিন লাগবে? মহানবী বললেন, চল্লিশ বছর। (হবহ নয়)।

এই হাদিসটিতে আর কোনো মেজাজি রাখা হলো না তথা রূপক কথাটি রইলো না। ওহাবিরা এই হাদিসটি না ফেলতে পারে, না মানতে পারে—কারণ হাদিসটি বুখারি এবং মুসলিম উভয়টিতে আছে। তাই

কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে চুপ করে থাকে। কারণ সুন্নি তো দূরের কথা ওহাবিরাও জানে যে, মেক্কা জি মসজিদুল হারাম হতে যদি কেউ কোনো যানবাহন ব্যবহার না করে পায়ে হেঁটেও যায় তো খুব বেশি হলে দুই মাস লাগতে পারে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে মহানবী বললেন যে, চল্লিশ বছর লাগবে। কেন চল্লিশ বছর বলা হলো? কারণ মহানবী নবুয়ত পেয়েছিলেন চল্লিশ বছরে। (এখানে মেক্কা জি চল্লিশ বছর। কারণ আদম যখন মাটি ও পানিতে অবস্থান করছেন তখনও মহানবী নবী ছিলেন)। সুতরাং মেক্কা জির সঙ্গেই হাকিকি রূপটি আছে। কেউ ধরতে পারে কেউ পারে না। এখানেও তকদির।

সুতরাং হাজার মাস সেই ইহদি সাধক মেক্কা জি তলোয়ার নিয়ে রাস্তা ঘাটে কারা কুফুরি করছে তাদের বিরুদ্ধে মেক্কা জি তলোয়ার না ধরে নিজের ভেতর যে খান্নাসরূপী শয়তানটি বাস করছে তার বিরুদ্ধে ধ্যানসাধনার তলোয়ারটি ধরেছিলেন। তা না হলে মেক্কা জি অর্থটি গ্রহণ করতে গেলে কাফেররা হাত গুটিয়ে বসে বসে মার খেত না। মহানবীর মেক্কা জি জীবনটার দিকে তাকালেই তো এর বহু জ্বলন্ত নমুনা আমরা দেখতে পাই। দেখতে পাই, কাফেররাই প্রথমে অস্বধারণ করেছে আর মহানবী সেগুলো প্রতিহত করেছেন। প্রতিটি যুদ্ধ কাফেরেরা চাপিয়ে দিয়েছিল মহানবীর উপর আর মহানবী সেই যুদ্ধগুলো প্রতিহত

করেছেন। এমন কি কাকেরদের সংখ্যা বেশি এবং মাত্র দুর্ভিক্ষেয় সাহাবা থাকতে রাত্রির অন্ধকারে মাগুলা আলীকে মহানবীর বিছানায় রেখে হজরত আবু বকর সিদ্দিককে নিয়ে হিজরত করতে হয়েছিল। যাবার পথে যে গুহাটিতে মহানবী আর হজরত আবু বকর লুকিয়ে ছিলেন সেই গুহার কাছেও কাকেরেরা এসেছিল, কিন্তু মাকড়সা আর কবুতরের ডিম দেখে আর সেই গুহাতে প্রবেশ করে নি। আর একজন ইহুদি সাধকের তরবারি নিয়ে ঘুরে ঘুরে জেহাদ করার কথাটি কেমন শোনায়? শত প্রশ্ন থাকার পরও আমরা মেজাজি বয়ানটিকে মেনে নিলাম এ জন্য যে, সবার পক্ষে ধ্যানসাধনার আকবরি জেহাদটি করা সম্ভব নয়। পাঠশালার ছাত্রের হাতে আদর্শলিপি মানায়, কিন্তু কাজি নজরুল ইসলামের ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি মানায় না আর মানায় না আল্লামা ইকবালের ‘শিকোয়া আর জবাবে শিকোয়া’ কবিতাটি। পাঠশালার ছাত্রদেরকে জোর করে এসব কবিতা বুঝানোর চেষ্টা করাটা যেমন নিছক বোকামি তেমনি পাঠশালার আদর্শলিপি জোর করে জ্ঞানীদের হাতে তুলে দেওয়াটাও বোকামি। এই বোকামি করার দরুণ সমাজ জীবনে বহু ভুল বুঝাবুঝি হয়, হাতাহাতি হয়, এমন কি খুনাখুনি পর্যন্ত হয়। বাহাস নামক অস্ত্রটি ধারণ করে অথচ বাহাস করার কথাটি কোরানের কোথাও পাই নাই, বরং পেয়েছি মোবাহেলার কথাটি। অথচ ওহাবি আর সুন্নিদের মাঝে কেমন করে বা বাহাস হয়? কারণ ওহাবি আর

সুন্নিরা সম্পূর্ণ দুই মেরুতে অবস্থান করছে। আবার শিয়ারা অন্য মেরুতে অবস্থান করছে। আবার মোতাজিলারা সম্পূর্ণ অন্য মেরুতে অবস্থান করছে। সুতরাং বাহাস হয় কী করে? বাহাস করাটাও তো বোকামি। আগে বায়তুল মোকাররমের প্রবেশপথের উপর নিয়ন সাইনে লিখা ছিল আল্লাহ, মোহাম্মদ। তারপর অজ্ঞাত কারণে ওহাবিদের দর্শন আল্লাহ আকবার শোভা পাচ্ছে, মোহাম্মদ নামটি আর রাখা হলো না। যে ওহাবিরা মহানবীকে বড় ভাইয়ের মত ইচ্ছিত করার উপদেশ খয়রাত করে তাদের পক্ষে আল্লাহর পাশে মোহাম্মদ নামটি রাখার কী করে আশা করেন? আশা করাটাই তো বোকামি। এ নিয়ে তবু অনেক বাহাস হয়েছে এবং প্রতিটি বাহাসে ওহাবিরা হেরে গেছে। কিন্তু হারার পরও কি সামান্য পরিবর্তন হয়েছে? না হয় নি। কেন হয় নি? তকদিরের লিখন। বদলানো যায় কি না এর উত্তরটি পাঠকই দেবে।

কোরানের সূরা বাকারার দুইশত পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন, ‘মানজাল্লাজি ইউক্রেদুল্লাহা কারদান হাসানান’, ‘কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে?’ ‘ফাইউদায়েফাহ লাহ আদআফান কাসিরাতান’, ‘সুতরাং তিনি উহা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দেবেন।’

কোরানের এই আয়াতটি একটি গবেষণার বিষয়। কারণ আল্লাহ ঋণ চাচ্ছেন। কার কাছে? তাঁর বান্দার কাছে। কর্জ চাওয়া অথবা ধার চাওয়া শব্দটিও ব্যবহার করা যায়। আমরা ঋণ শব্দটি নিলাম কারণ কর্জ তথা ধার

চাইলে যা দেওয়া হয় তা-ই পরিশোধ করতে হয়। এখানে পরিশোধের কথাটি না বলে বলা হলো, এই ঋণের পরিবর্তে আল্লাহ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আসলে যে ঋণটি দেওয়া হবে সেই ঋণের পরিবর্তে বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কত গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে? সংখ্যার নির্দিষ্ট হিসাবটি দেওয়া হলো না, বরং বলা হলো বহু গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এখন প্রশ্নটি হল সেই ঋণের বিষয়টি কী? মালের জাকাত তথা সাদকা? না অন্যকিছু? প্রথমে মালের জাকাতটিকেই ধরে নিলাম। মালের জাকাতটি যদি লোক দেখানো না হয় অথবা দুনিয়াবি প্রশংসা পাবার জন্য না হয়, বরং কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি পাবার আশায় দেওয়া হয়, তো অবশ্যই উহা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবেন। এ রকম আন্তরিক মালের জাকাত দিতে পারলে অবশ্যই বহু গুণ বৃদ্ধি দেবেন।

লক্ষ করুন, মালের জাকাত অথবা ধনসম্পদ কথাটি বলা হয় নাই। বরং বলা হলো, কে সেই মানুষটি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে। এখানেও একটি কথা থেকে যায় আর সেটা হলো, কেবলমাত্র ঋণ দেবার কথাটি বলা হয় নি, বরং ঋণ দেবার পেছনে একটি বিশেষণ

লাগিয়ে দিয়েছেন। বিশেষণটির নাম হলো উত্তম। সুতরাং উত্তম ঋণ দেবার কথাটি বলা হলো। উত্তম ঋণ দেওয়া যে সবার পক্ষে সম্ভব নয়, বরং অতি অল্প লোকের পক্ষেই সম্ভব তা বাক্যের মাঝেই আছে। তাই বলা হলো কে সেই ব্যক্তি তথা এমন কেউ কি তোমাদের মাঝে নাই যে আল্লাহকে উত্তম ঋণটি দিতে পারে? আল্লাহকে ঋণ দেওয়াটাই বিশেষ কষ্টকর, তার উপর উত্তম ঋণটি তো খুবই কষ্টকর। তাই ভাষাটির ভাবধারাটি অনেকটা এ রকম যে, তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ নাই যার আল্লাহকে উত্তম ঋণটি দেবার যোগ্যতা আছে? খুব কম লোকেই এহেন উত্তম ঋণটি দিতে পারবে জেনেই আল্লাহ বলছেন, কে সেই ব্যক্তি? এই ‘কে সেই ব্যক্তি’ বলতে হাতে গোনা যায় যারা পারবে। মালের জাকাত তো প্রায় ধনবান ব্যক্তিকেই কন্মবেশি দিতে দেখি। সেটা মৃত্যুর ভয়েই হোক আর জ্ঞানাত পাবার আশায় হোক অথবা কিছু গরিব মানুষের সামান্য উপকারে আসাই হোক অথবা সমাজের বুকে সম্মান পাবার আশায় হোক অথবা লোকে জানুক অমুকে অনেক মালের জাকাত দেয়। এই কথাগুলো বুঝবার উপায় কী? এই কথাগুলো বুঝবার কোনো উপায় নাই, কারণ মালের জাকাত যারা দেয় তাদের অন্তরের খবরটি একমাত্র আল্লাহ জানেন এবং আল্লাহ যাদেরকে অন্তরের খবরটি জানিয়ে দেন তারা জানতে পারে। যাদেরকে আল্লাহ এই অন্তরের খবরটি জানিয়ে দেন তাঁরাই আল্লাহর ওলি। আল্লাহর ইচ্ছাটি ওলির ইচ্ছা।

ওলির অন্য কোনো ইচ্ছা থাকলে সে ওলি নয়, বরং ওলি নামের কলঙ্ক। তাই কোরান অন্যত্র বলেছে যে, আপনার হাত আমার হাত, আপনার পাথর ছুড়ে মারা আমিই মেরেছি। হাদিসে আছে, বান্দা নফল ইবাদত-বন্দেগিতে আমার এত নিকটে এসে পড়ে যে, সেই বান্দার হাত আমার হাত হয়ে যায়, বান্দার জিহ্বা ও কথা আমার কথা হয়ে যায়, চোখ আমার চোখ হয়ে যায় আর সেই চোখে আমি দেখি, বান্দার কান আমার কান হয়ে যায়, সেই কানে আমি শুনি। তা হলে এই বিষয়টি একদম পরিষ্কার যে, আল্লাহ প্রতিটি বান্দার শাহারগের নিকটেই আছেন আর আছেন বলেই বান্দার ধ্যানসাধনায় আল্লাহকে জাগ্রত করে তোলেন, মূর্তিমান রূপে ধরা দেন। তাই এই সকল সফল ধ্যানসাধনার বান্দাদেরকে আল্লাহর চেহারা তথা ওয়াজহুল্লাহ তথা বান্দানেওয়াজ তথা সারাপা তথা দায়ার তথা নররূপী নারায়ণ বলা হয়। ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা এসব কথা মানে না এবং যারা মনের অজান্তে ওহাবি দর্শনটিকে বুকে ধারণ করে আছে তারাও মানে না। এই মানার মাঝেও একটা নিগেটিভ সৌন্দর্য আছে। কারণ রাত আছে বলেই দিনের কদর। যদি ছয় মাস দিন আর ছয় মাস রাত হতো, এমন দিন অথবা রাতের এতখানি কদর থাকতো কি না আমার জানা নাই। তাই ‘কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম খণ প্রদান করবে?’ কথাটির দ্বারা আল্লাহর ওলিদেরকে বুঝানো হচ্ছে। দুনিয়াতে মানুষ মানুষকে খণদান

করে আর ঋণের বদলে একটু বেশি গ্রহণ করলেই উহাকে রেবা তথা সুদ বলা হয়। আর সুদ খাওয়াটা সারাসরি হারাম। এখানে কিছু আম্মানতের কথাটি বলা হয় নাই। কারণ দুনিয়ার ব্যাংকে যে টাকা গচ্ছিত রাখি তা কিছু কখনোই ঋণ নয় এবং অর্থনীতির প্রশ্নে উহাকে ঋণ না বলে বলা হয় আম্মানত। দুনিয়ার ব্যাংক আম্মাদের গচ্ছিত আম্মানত শিল্প কারখানায় ঋণ হিসাবে দেন। এই ঋণ হতে ব্যাংক একটা নির্ধারিত মুনাফা পায়। তবে ইসলামিক ব্যাংকের নির্ধারিত মুনাফাটিকে লভ্যাংশ বলা হয়, কিছু অন্যসব ব্যাংকের মুনাফাটিকে মুনাফা না বলে সুদ বলা হয়। এর কারণ কী? কারণটি আর কিছুই নয়, বরং সোজা কথায় বলে দেওয়া যায় যে, কোরান কোনো বইয়ের দোকান তথা লাইব্রেরি হতে কিনতে গেলে কোরানের দাম কত বলা যাবে না। কারণ দুনিয়ার ধন সম্পদ নিয়ে কোরান কেনা যায় না, তাই দাম না বলে বলতে হবে হাদিয়া। সুতরাং বলতে হবে এই কোরানের হাদিয়া কত? পক্ষান্তরে অন্য যে কোনো

বই কিনতে গেলে বলতে পারেন যে, বইটির দাম কত? এক কথায় কোরান কিনলে হবে হাদিয়া, আর সাধারণ বই কিনলে হবে দাম। ইসলামী ব্যাংকে ফিকস্‌ড ডিপোজিটের নির্ধারিত আয়টুকুকে বলতে হবে মুনাফা, পক্ষান্তরে অন্য যে কোনো ব্যাংকে ফিকস্‌ড ডিপোজিটের নির্ধারিত আয়টুকুকে বলতে হবে সুদ। আবার কোরানের সূরা

বাকারাত্তে অন্য একটি স্থানে আছে যে, ‘যা আমরা নিজেরা গ্রহণ করবো না তা অন্যকে দেওয়া যাবে না।’ এখানে এই আয়াতে আল্লাহর খাস বান্দাদেরকে আরও একটু জটিল আরও একটু বিব্রত বোধ করার অবস্থানে দাঁড় করানো হল। কারণ জাকাতের শাড়ি-লুঙ্গি কমদামের হয় যা জাকাত দানকারীরা ভুলেও পরিধান করে না। আমরা যে খাবার খাই না অন্যকে সেই খানা দিতে পারি না ইত্যাদি বিষয়গুলো আল্লাহর খাস বান্দাদের পর্যন্ত বিশেষ করে এই যুগে এক মহাফাঁপড়ে ফেলে দেয়, এক মহাচিন্তায় ফেলে দেয়, যদিও বান্দা মুখ ফুটে বলে না, কিন্তু বিবেক দাঁত বের করে বোবার মত দংশন করতে থাকে। মানুষ কিছু দিয়ে কিছু আশা করে। কিছু আশা না থাকলে বিরক্তি আর পরকালের ভয়ে কিছু দায়সারা গোছের দান করে। গিভ অ্যান্ড টেক দিয়েই দুনিয়াটা চলেছে। তা সেই গিভ অ্যান্ড টেকের মাঝে ঠকলেও খুশি থাকে। যেখানে টেক নাই সেখানে গিভ থাকতে চায় না। এটাই মানুষের স্বভাব। কারণ খাল্লাসরূপী শয়তানটি যতই চালাকি করুক না কেন, জেনে রাখো আমিই (আল্লাহ) সবচেয়ে বড় চালাক। তাই আল্লাহ তাঁর বান্দার কাছে ঋণ চাইছেন এবং এই ঋণটি শর্তযুক্ত ঋণ তথা উত্তম (বেস্ট : সুপারলেটিভ ডিগ্রি) ঋণ। এই উত্তমের মাঝেই ঋণগ্রহণের বিরাট রহস্যটি লুকিয়ে আছে। সবার পক্ষে এই বিষয়টি বুঝা বড়ই কষ্টকর ।

আর কষ্টকর বলেই সবাই না বলে বলা হচ্ছে ‘কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম খণ দেবে?’

তাই খাজা গরিব নেওয়াজ মঈনুদ্দীন চিশতি তাঁর অমর গ্রন্থ আসরারে হাকিকিতে মালের জাকাত এবং জাকাত বিষয়টি সামান্য কিছু কথা দিয়ে এত অপূর্ব করে বলেছেন যে অবাক হয়ে যাই। (ওহাবিরা খাজা বাবার নামটি শুনলে এলার্জিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং সেটা ফাঁকফোকর পেলেই বলতে থাকে, আর সুন্নিরা বিভ্রান্ত না হলেও তাদের মনের ভেতর দাগ কাটে। ওহাবিরা এত সুন্দর যুক্তি-তর্ক দিয়ে বুঝায় যে কিছু লোক তো খপ্পরে পড়তেই পারে)। শ্রদ্ধেয় সৌদি আরবের মুসলমান ভাইয়েরা ওহাবি ফেরকার অনুসারী এবং এদের ব্যাপক প্রচার ও বিকায় আলেমদের (বিক্রি হয়ে যাওয়া আলেমেরা) টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে প্রচার করার চং দেখলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এরা সুন্নি নামধারণ করে ওহাবি ফেরকার ফাঁদে ফেলার আশ্বাস করছে। পাখি দিয়ে পাখি ধরার মতো। মালের জাকাত এবং হাকিকি জাকাত বিষয়টির উপর খাজা গরিবে নেওয়াজ কী বলেছেন তাঁর প্রিয় প্রধান খলিফা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীকে নিচে তারই কিছুটা তুলে ধরলাম।

মহানবী আরও বলেন , ‘হে ঔমর, শরিয়ত মোতাবেক দুই শত দিনারের মধ্যে মাত্র পাঁচ দিনার জাকাত দান করা ফরজ। অথচ যারা তরিকতের অনুসারী তথা তরিকত মানে অথবা মেনে চলে (আহলে তরিকত) তাদের জন্য দুই শত দিনারের মধ্যে পাঁচ দিনার নিজের জন্য রেখে বাকি সবটুকু দান করা ফরজ। মনে রেখো, জাকাত স্বাধীন (আজাদ) ব্যক্তির উপর ফরজ। যারা গোলাম এবং ক্রীতদাস তাদের উপর নয়। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত নফসের খাহেশের গোলামি হতে মুক্ত হতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত সে আজাদ হতে পারে না। যে পর্যন্ত সে নফসের খাহেশের গোলামি হতে আজাদ হতে না পারে সেই পর্যন্ত তার উপর কী করে জাকাত ফরজ হতে পারে? অতএব বান্দার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নফসের খাহেশের তাবেদারি থেকে আজাদি হাসিলপূর্বক জাকাতে হাকিকি আদায় করার যোগ্যতা (কাবেলিয়াত) অর্জন করা।

‘জাকাত অবস্থাপন্ন সুস্থমস্তিষ্ক (আকেল) ও সাবালক ব্যক্তির উপর ফরজ। পাগল (দিওয়ানা) এবং নাবালকের উপর জাকাত ফরজ নয়। যে ব্যক্তি গাফলতি ও নফসানিয়াতের শয়তান প্রভাব বিস্তার করে আছে সে আরেফে এলাহিগণের কাছে দুধ-পান-করা শিশুর মতো। যারা

আরেক্ষণে মোকামে বাস করে তারা একেবারে অথর্ব বলে মনে করে। ফলে তার উপর হাকিকি জাকাত কী করে ফরজ হতে পারে? কাজেই বান্দার প্রধান কর্তব্যটি হলো নফসানিয়াতের অন্ধকার হতে মুক্তি অর্জন করে আরেক্ষণে এলাহি মোতাবেক আকল (জ্ঞান) ও আজাদি হাসেল করা। এতে সে জাকাতে হাকিকি আদায় করার উপযুক্ততা লাভ করবে। শরিয়ত যে জাহেরি জাকাত ফরজ করেছে তার উদ্দেশ্য হলো ধনী ব্যক্তির জাকাতের উসিলায় গরিব, আতুর ও মিসকিনকে সাহায্য করবে এবং এতে তাদের অভাব কিছুটা কাটবে।

‘হে উমর, গঞ্জে হাকিকির (হাকিকতের সম্পদ) অধিকারী ছাড়া জাকাতের হাকিকি বিষয়টির কারো কোনো জ্ঞান নাই। গঞ্জে হাকিকি মূলত সেররে রবুবিয়াত (রবের গোপন রহস্য)। আরেক্ষণের দেল (অন্তর) এই সেররে রবুবিয়াতের গঞ্জিনা (ধনাগার) সদৃশ্য। কাজেই আরেক্ষণের উপর ফরজ হলো-তারা তাদের গঞ্জে হাকিকি হতে আসরারে এলাহি-রূপ জাকাত অজ্ঞ ও গোমরাহদেরকে দান করবে। কারণ এইরূপ দান পাবার উপযুক্তদেরকে দান করাই প্রকৃত জাকাত এবং এটাই হাকিকি জাকাত।’ (দিওয়ান-ই-মঈনুদ্দিন ৪৪২ পৃষ্ঠা)। প্রথমেই বিষয়টি পরিষ্কার করে রাখা ভালো যে, খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি যে মহানবী হজরত উমর ফারুককে উপদেশ দিচ্ছেন এই কথাগুলো হাদিস বলে মনে হবে এবং খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি তাঁর প্রধান খলিফা

খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীকে বার বার বলেছেন যে, তাঁর কথাগুলো হাদিস। কেমন করে হাদিস হলো এই বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে বাবা কুতুবুদ্দিনকে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, যারা খাজা বাবার আশিক এবং তরিকতের অনুসারী তারা মাথা নত করে মেনে নেবেন, কিন্তু ওহাবি ফেরকার অনুসারীরা তথা যারা সুফিবাদ তথা অধ্যাত্মবাদ মানে না তারা মানা তো বহু দূরের কথা বরং বাহ্যিক বিরূপ মন্তব্য করবে। কারণ খাজা মঈনুদ্দিনের এসব মহামূল্যবান উপদেশ কোনো হাদিস গ্রন্থে পাওয়া যাবে না। তাই ওহাবিরা ইহাকে হাদিস না বলে প্রলাপ (?) -ও বলতে পারে এবং বলবে। কারণ যিনি বড় পীর বলে পরিচিত এবং হাফলি মাজহাবের অনুসারী সেই হজরত আবদুল কাদের জিলানিকে তারা সবচেয়ে বড় কাকের (?) বলে ফতোয়া দিয়েছে। হাফলি মাজহাবে ইমাম আহমদ হাফল সাহেব একটিও অধ্যাত্মবাদের হাদিস গ্রহণ করে নিতে পারেন নি, যার জন্য একবার অভিমান করে বড় পীর সাহেব হাফলি মাজহাব ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিশেষ কারণে করেন নি। ওহাবিরা যখন সুন্নিদের কাছে বাহাসে হেরে যায় তখন হাফলি মাজহাবের অনুসারী বলে প্রচার করে। কারণ ওহাবিরা কোনো মাজহাব মানে না। না মানার প্রশ্নে যেসব যুক্তি-তর্ক প্রদর্শন করে তা পড়লে সাধারণ পাঠক মনে করতে চাইবে যে, ওহাবিরাই সঠিক এবং যারা মাজহাব মেনে চলে তারা বোকা। যদি বলেন যে, চার

মাজহাব কি কোরান-হাদিস বহির্ভূত কথা বলেছেন? ইমাম আবু হানিফা তো সাফ বলে দিয়েছেন যে, আমার কথাগুলো যদি কোরান-হাদিসের বলয়ের বাইরে থাকে এবং পছন্দ না হয় তো মেনে নিয়ো না। এত সুন্দর কথা বললে কী হবে? যারা আগেই মনস্থির করে ফেলে যে মানবো না, তাদেরকে কী করে মানাবেন? ধন্যবাদ পাবার যোগ্য পরম শ্রদ্ধেয় জেহাদুল ইসলাম সাহেব। কারণ গুনেছি যে, উনি দিওয়ানে গাউসুল আজম বইটিরও বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বেঁচে থাকলে উনি হয়তো ওলিদের বহু মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদ করে যেতেন। কারণ বাংলার বুকে কোনো পীর সাহেব বিখ্যাত ওলিদের মূল্যবান গ্রন্থগুলোর অনুবাদ করতে আজও এগিয়ে এলেন না। বাজার কেবল ওহাবিদের বই ও প্রচারে ছেয়ে গেছে। তরিকার যারা অনুসারী তারা কি চুপি চুপি মালের জাকাত সেই সব লিখকদেরকে দিতে পারেন না, যারা লিখনির মাধ্যমে নফসের খাহশের গোলামি হতে মুক্তি পাবার কথাগুলো লিখে যান? অন্তত বই ছাপাবার জন্য তরিকতের অনুসারীরা কি মালের একটি ক্ষুদ্র অংশ দান করতে পারেন না? গোলামের জন্য, পাগলের জন্য এবং নাবালকের জন্য যে মালের জাকাত নাই তা সবার জানা থাকার কথা। যারা নফসের খাহশের গোলামি করে যাচ্ছে তারা তো বড় গোলাম তথা আকবরি গোলাম। খান্নাসরূপী শয়তানটি তো প্রতিটি মানুষের অন্তরে বাস করে এবং এই শয়তানটি পবিত্র নফসটিকে বাহারি কুমন্ত্রণা দিয়ে শয়তানের

বড় গোলাঙ্গে পরিণত করছে। অথচ বুঝেও মালুম পাই না। জানে ধূমপান বিষপান, তবু জেনে শুনে বিষপান করছে। তাই সবাইকে বলছি না। সবাইকে বলবার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যারা আহলে তরিকত তথা তরিকতের অনুসারী তারা কি মেরাজি জাকাতের একটি ক্ষুদ্র অংশ দান করে অন্ধকার হতে আলো দেখাবার সামান্য দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন না? লোক দেখানো ইবাদত যারা করে তাদের জন্য ‘ওয়াইল’ নামক দোজখটি নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে—কোরানের এত বড় মূল্যবান কথাটি জানবার পরও সমাজের ঠুনকো সম্মান পাবার আশায় ভুলে যায়। কিন্তু যারা তরিকতের অনুসারী তারা মোটেই সাধারণ নয়। কারণ তরিকত বিষয়টি জানতে হলে আগ্রহ লাগে, স্থানে স্থানে ঘুরতে হয়, বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় এবং তারপরই তরিকার অনুসারী হতে পারে। তাই যারা তরিকতের অনুসারী, যারা অধমের বইগুলো পড়ে প্রচার হবার যোগ্য মনে করেন কেবল তাদেরকেই একান্ত অনুরোধ করবো যে, অধমকে মেরাজি জাকাতের একটি ক্ষুদ্রাংশ দান করে আমার পাশে দাঁড়ান। গবেষণায় মগ্ন থাকবো, না বাজারে গিয়ে অর্থ উপার্জন করবো? গবেষণায় মগ্ন থাকবো তা যতই কষ্ট আর যাতনা সহ্য করতে হয় করবো। শাহ সুফি সদর উদ্দিন চিশতী সাহেব জীবনভর গবেষণা করে যে কোরান দর্শন নামে তফসির বের করে গেছেন তাও তো মেরাজি জাকাতের মাধ্যমে উৎসাহ দান করে গেছেন কিছু তরিকত-

পত্তীয়া। আজ তাঁর রচিত বইগুলো এবং কোরান তফসির হতে সমাজের বুকে যারা তরিকতের অনুসারী তারা কিছুটা হলেও ভরসা পায়, সাহস পায় এবং

উৎসাহ পায়। আমলগত পার্থক্য আছে ও থাকবেই, কিন্তু সুফিবাদের মূল বিষয়গুলোর চমৎকার সমাধানগুলো পাঠকদেরকে বিরাট উৎসাহ দান করে।

জাকাত বিষয়টি লিখতে গিয়ে একটি কথা লিখাটা দরকার মনে করেছিলাম, কিন্তু ভুলে যাবার পর আবার মনে পড়াতে লিখতে হলো, আর সেই বিষয়টি হলো : প্রয়োজনের বাড়তিটা ব্যয় করে ফেলবে তথা দান করে দেবে। এটা কিন্তু কোরানের আদেশ। হাদিস নয় যে পছন্দ না হলেই দুর্বল হাদিস বলে অবহেলা করবেন। প্রয়োজনের বেশি থাকলে দান করে দিলে মালের জাকাত দেবার কথাটি থাকছে না। অনেকটা দাসপ্রথার মত। দাস-দাসীদের উপর কী রকম আচার-আচরণ করতে হবে তার বহুল আলোচনা কোরান-হাদিসে দেখতে পাই আবার সেই সঙ্গে দাসদাসীদের মুক্ত করে দেবার অনেক রকম উপদেশ পাই। এখন প্রশ্নটি হল, যখন দাসপ্রথাটিই আর থাকবে না তখন দাসদাসীদের উপর আচার আচরণের কথাটি থাকে কোথায়? অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, মেজাজি দাস-দাসীদের কথাটি বলছি, হাকিকি দাস-দাসীর কথা নয়।

কারণ যারা আপন আপন নফসের খাহেশের দাস অথবা দাসী হয়ে
আছে তাদেরকে কী করলে মুক্ত করা যাবে সেটা সুফিদের কথা। সুতরাং
বিষয়টা সুফিবাদের। হাকিকি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করাটাই হল
সুফিবাদ নিয়ে আলোচনা করা। আবার হাকিকি কথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ
করতে গেলে ব্যাখ্যার মেজাজি তথা জাগতিক মূল্যটি সমাজের দৃষ্টিতে
শূন্য, কিন্তু সুফির দৃষ্টিতে অনেক মূল্যবান বিষয়। কারণ সুফিবাদটাই
প্রেম-ভক্তি-ভালোবাসার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। মহানবীর দাঁত
মোবারক শহিদ হবার দরুন করন প্রদেশের এক মাজ্জুব (মাজ্জুব
আবদালদের কোনো প্রকার ইবাদত-বন্দেগি নাই—মেশকাত শরিফ ১১
খণ্ড) সমস্ত দাঁতগুলো ভেঙ্গে ফেললেন। মহানবীর দুটো দাঁত ভেঙ্গে গেছে
বলে সব মুসলমানদের দুটো করে দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে হবে—এ রকম এ
জাতীয় সুন্নত পালনের কথাটি আমার জানা নাই। মিষ্টি খাওয়া, মধু
পান করা, কালিজিরা খাওয়া, লাউয়ের তরকারি খাওয়া ইত্যাদি
বিষয়গুলোর কমবেশি জানা থাকার কথা, কারণ এগুলো মহানবীর
সুন্নত; কিন্তু দুটো দাঁত ভেঙ্গে ফেলতে হবে বলে কোনো সুন্নতের কথাটি
পাই নাই। কারণ দাঁত ভাঙ্গার বিষয়টি হলো প্রেম, যাহা সবার জন্য
হতে পারে না। কারণ প্রেম করা যায় না, বরং প্রেম হয়ে যায়। বৈষয়িক
দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে, জাগতিক দৃষ্টিকোণ হতে দেখতে পাই যে, ইহার
কোনো মূল্যায়ন হয় না, কিন্তু প্রেমের বাজারে এই দাঁত ভাঙ্গার

বিষয়টিতে মহানবী এত বেশি দাম দিয়েছেন যে, নিজের জুকা মোবারক কোনো সাহাবাকে না দিয়ে করন প্রদেশের মাজ্জুব হজরত ওয়ায়েস করনিকে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেই পবিত্র নির্দেশটি পালন করা হয়েছিল। একজন মাজ্জুব এত বড় পাওয়াটা মহানবী হতে পাবেন, কেউ ভাবতেও পারেন নি। সুতরাং প্রেম দিয়ে হিংসাকেও অনেক সময় জয় করা যায়। প্রেম দিয়ে মহানবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি সাহাবারা না পেয়ে তাবেয়িন ওয়ায়েস করনি পেলেন।

সত্যি জ্ঞানীদের জন্য এসব বিষয় হতে অনেক কিছু পাবার নিদর্শন রয়ে গেল। আব্বাসীয় বাদশা (খলিফা নয়-নামে, কামে নয়) মোতয়াক্কিল ছিল একজন জালেম বাদশা। পড়লেই জানতে পারবেন যে, কাবার গেলাপ কেমন নিষ্ঠুর আচরণে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং আরও অনেক জঘন্য কাজ করেছে। ‘আনাল হক’ (আমিই সত্য) যিনি বলেছিলেন, সেই বিশ্ববিখ্যাত ওলি হজরত মনসুর হাল্লাজকে এই বাদশাই অনেকটা জোর করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। কাজিরা দিতে চান নি, কিন্তু বাদশার সামনে কাজির কোনো মূল্যই নাই। দুই একটা ঘটনার বিরল নিদর্শন রেখে যাওয়াটাকে সার্বজনীন মনে করে সবার পাতে তুলে দেবার কৌশলটি একটি রাজনীতির কৌশল। সবার কাছে বাহবা পাওয়া এবং ন্যায় বিচারের প্রতীক দাঁড় করিয়ে কী যে ভয়ঙ্কর গর্ব করে। এই গর্ব দেখে হাসবো না চিৎকার করবো ভাবতে পারি না। কোন জনমে

কোনো একটি দৈবাত কাজির ন্যায় বিচারের ঘটনাটি পড়বার পর সে কী প্রচার! হায় রে! ন্যায় বিচারের জোয়ার বইছে ইত্যাদি। আর আমরাও সেই রকমই। বেগুন কিনলে গুঁটকিতে মানায়, আলুতে তেমন মানায় না।

সাদকা নামক মালের জাকাতটি মেজাজি এবং তা হাকিকি জাকাতের একটি অনুষ্ঠান মাত্র। ‘এই অনুষ্ঠান মাত্র’ বিষয়ই ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং করাটা সমীচীন। কারণ মেজাজি জাকাতের এই অনুষ্ঠানটি সমাজে চালু না থাকলে হাকিকি জাকাত বলে যে কিছু আছে বা থাকতে পারে এটা অনেকের পক্ষেই বুঝা কষ্টকর হত। ইমাম হোসেনের পরিবার-পরিজন নিয়ে মহরম মাসে শহিদ হয়ে যাওয়ার নির্মম ঘটনাটি শ্রদ্ধেয় শিয়া ভাইয়েরা মাতম করার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ধরে রেখেছেন, যার দরুন কারবালার নির্মম ঘটনাটি প্রতি বছর ভুলে গেলেও মনে করিয়ে দেয়। সুতরাং যারা অনুষ্ঠানের কথা শুনে নাক সিঁটকায় তারা সামাজিক মূল্যায়নটি করতে

পারে না। এ বিষয়টিতে শ্রদ্ধেয় শিয়া ভাইদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদটি জানাতে হবে। আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, মাতৃভাষার জন্য যারা জীবনদান করে গেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারি নামক মেজাজি অনুষ্ঠানটি পালনের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে তাদের কথা কমনবেশি অনেক কিছু মনে করিয়ে দেয় এবং আমাদের পরে যারা

আসবে তারা এই মেজাজি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু জানতে পারবে এবং অনেক প্রশ্ন করতে শিখবে। ধূয়া দেখলে যেমন আগুন আছে বলে মনে হয় তেমনি অনেক প্রশ্ন আসল বিষয়টির দিকে নিয়ে যাবে। সুতরাং এই একুশে ফেব্রুয়ারির মেজাজি অনুষ্ঠানটিকে বাদ দেওয়া যায় না। বাদ দিলে হাকিকি তথা আসল বিষয়টি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে, নতুবা সবার পক্ষে আম্রভাবে জানবার মাধ্যমটি থাকছে না। প্রতিটি স্বরণীয় অনুষ্ঠান মেজাজি হলেও হাকিকি বিষয়টি জানবার বিরাট বিরাট পশু রেখে যায়। এই প্রশ্নের ফাটল দিয়ে প্রবেশ করে হাকিকি তথা আসল বিষয়টি তুলে ধরে। এখানেই মেজাজি অনুষ্ঠান পালনের পরম সার্থকতা। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবসগুলো পালন করছি, কিন্তু যারা স্বাধীনতার কেবল বিরোধিতাই করে নি, বরং মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের ধরিয়ে দিয়েছে, ইত্যাদি যত প্রকার জঘন্য আকাম কুকাম করেছে তাদেরকে ঘৃণা দেবার একটি মিনার বা স্তম্ভ বানিয়ে রাখার জন্য লালবাগের সংসদ সদস্য মাননীয় হাজি সেলিম সাহেব সংসদে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছিলেন। কিন্তু তখনকার মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কোনো অজ্ঞাত কারণে বিষয়টির সামান্য গুরুত্ব না দিয়ে বরং দরদির সাজে হেসেছিলেন। হাসির পর যে কাঁদতে হয় এটা উনার জানা ছিল বলেই অনেক কেঁদেছেন। কথায় বলে বেহায়ারা যেমন কাঁদতে জানে আবার গদিতে বসলে আরাম

পেয়ে হাসতেও পারে। সংসদ সদস্যের নামটি লিখে দিলাম, কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর নাম লিখলাম না। কারণ যারা বুদ্ধিমান তাদের জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট। মীর জাফরের কোরান স্পর্শের প্রতিজ্ঞায় সিরাজ বিশ্বাস করেছিলেন আর সেই বিশ্বাসের জের কেবল মীর মদন, মোহন লাল, আর সিরাজকেই খেসারত দিতে হয় নাই, বরং জেনারেল ডায়ারের পাখি শিকার করার মতো মানুষ খুন হয়ে দুইশত বছর ব্রিটিশের গোলামি করার খেরাসত দিতে হয়েছে এবং ধর্মের বিভাজন করে রাখা ব্রিটিশ চালাকির ফাঁদে আজও আমাদের অনেকের পা আটকিয়ে আছে। কোরান বলছে, যে জাতি তার নিজের কপাল নিজে পরিবর্তন করে না সেই জাতির কপাল (ভাগ্য) আল্লাহ পরিবর্তন করেন না। এত বড় মূল্যবান কথাগুলো শোনার পরও যারা মূল্য দিতে জানে না, তাদের উপর আল্লাহর রহমত কেমন করে নাজেল হয়? ধন-সম্পদের লোভ আর ক্রমতার মোহ জাঁদরেল জ্ঞানীদেরকে পর্যন্ত বেইঁস করে ফেলে। মিথ্যার পর মিথ্যা কথা শুনিয়ে জনতার কাছে সাধু সাজে। জনতা ঠকতে থাকে। তারপর একদিন জনতা বুঝতে পারে, ধরতে পারে বিবর্তনবাদের কিছু সিঁড়ি পেরিয়ে, তখনই গণতন্ত্র আপন মূর্তিতে উদ্ভাসিত হতে থাকে। কারণ প্রতিটি মানুষের সঙ্গে শয়তান খান্নাসরূপ ধারণ করে নিত্যদিন কলুষিত হবার কুকথা শোনায়। কেন শয়তানকে দেওয়া হল? শয়তানের ধোঁকা হতে মুক্তি পাবার চেষ্টা চালিয়ে যাও। কারণ শয়তানটিকে

তোমার সঙ্গে তথা তোমার মনের মাঝে না দিলে আমার (আল্লাহর) কোনো পরীক্ষা থাকে না। ফেরেশ্তাদের নফসও নাই রুহ নাই, তাই পরীক্ষাও নাই। যদি পরীক্ষায় পাশ করতে পারো তা হলে ফেরেশ্তারাও তোমার হকুম ইচ্ছতের সঙ্গে পালন করবে। কারণ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশ্তাদের নাজেল করা হয় এবং স্বয়ং রুহ আপন রূপে উদ্ভাসিত হয়।

এবার মেজাজি জাকাতের সামান্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। আর সেই বিষয়টা হলো : মানসুর হাল্লাজের বিচার চলছে। কাজিরা বিচার করছেন। সেদিনের বড় বড় কাজিরা বিচার করছেন। এক কাজি নয় বরং দশ-বারো জন কাজি। আধুনিককালের জজ কোর্ট নয়। কারণ জজ কোর্টে একজন বিচার করে। বরং সুপ্রীম কোর্ট বলা যায়। পাকিস্তান এবং ভারতের সুপ্রীম কোর্টে বিচার করা হয় নয়জন বিচারক দিয়ে। ইউরোপ আর আমেরিকাতে এগারোজন বিচারক বিচার করেন। কাজিদের মাঝে এক কাজি মেজাজি জাকাত বিষয়ে তথা শরিয়তের জাকাত বিষয়ে মানসুর হাল্লাজকে একটি প্রশ্ন করলেন। প্রশ্নটি হলো ‘বলুন তো, বিশ দিনারের জাকাত কত দিতে হবে?’ মানসুর হাল্লাজ কোনো চিন্তা না করে সোজা বলে দিলেন, ‘কেন, বিশ দিনারের জাকাত দিতে হবে সাড়ে বিশ দিনার।’ কাজি তো এ রকম কথা শুনে থ’ মেরে গেলেন। অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, ‘এ রকম আজগুবি কথা আপনাকে

কে শিখিয়েছে?’ মানসুর হাল্লাজ বললেন, ‘কেন, এ তো সোজা কথা, এই কথাটি আমি হজরত আবু বকর সিদ্দিকের কাছ থেকে শিখেছি। হজরত আবু বকর সিদ্দিক তাঁর জম্মানো চল্লিশ হাজার দিনারের সবটুকু আল্লাহর রাহে (পথে) খরচ করার জন্য মহানবীর কদম মোবারকের কাছে (পদতলে) রেখে দিয়েছিলেন।’ তখন কাজি আবারও প্রশ্ন করলেন, তা হলে তো বিশ দিনারের জাকাত বিশ দিনার হলো। আপনি তো আধা দিনার বাড়িয়ে বললেন। এই আধা দিনার কথাটি কোথায় পেলেন?’ মানসুর হাল্লাজ বললেন, ‘আমি যে বিশ দিনার জম্মিয়ে রেখেছি, এই জম্মিয়ে রাখার অপরাধে আধা দিনার জরিমানা দিতে হবে। কারণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও আমি কেন বিশ দিনার জম্মাতে গেলাম। এই জম্মানোটাকেই আমি অপরাধ মনে করি বলে আধা দিনার বেশি নয়, বরং জরিমানা হিসেবে দেব। কারণ যারা মাল জম্মা করে রাখে এবং গুণে বেছে রাখে তাদেরকেও হতামার শাস্তি ভোগ করতে হবে, তাই আধা দিনার জরিমানা দিয়ে দায়মুক্ত হতে চাই।’ মানসুর হাল্লাজের এই ব্যাখ্যা ও কথা শুনে কেবল এক কাজিই অবাক হন নি, বরং যত কাজি বিচার করতে এসেছে সবাই অবাক হয়ে গেলেন। মানসুর হাল্লাজের কথায় স্পষ্ট বুঝা গেল যে, জম্মা করা যাবে না। কাজিদের মনে দয়া হলো এবং শাস্তি দেওয়া হতে বিরত থাকতে সিদ্ধান্ত নেবে মনে করেছিল। কিন্তু আব্বাসীয় বাদশা মোতাওয়াঙ্কিলের

চাপে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে বাধ্য হলো। প্রকৃত ইতিহাসটি বড়ই নির্মম এবং তঞ্চকতার কুফল। যেমন বিজ্ঞানী গ্যালিলিও বলেছিলেন যে, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরছে। যারা বলে যে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে গ্রহ-নক্ষত্র ঘুরছে তারা বোকা এবং কিছুই জানে না। ইউনে কাসিরের আদি তফসিরটি যদি পাওয়া যায় তো দেখতে পাবেন সূরা ফাতিরের একচল্লিশ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে লিখেছেন যে, পৃথিবী স্থির এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরছে। বুদ্ধিমান অনুবাদক ভাল করেই জানেন যে, হুবহু রাখতে গেলে কেউ পড়বে না, আর পড়লেও ইউনে কাসিরের জ্ঞানের বহর দেখে হি হি করে হাসবে। বেশির ভাগ মানুষ দলগত বিষয়টি ভালবাসে। তাতে যত ভুলই হোক না কেন। অথচ কোরান দলগত চিন্তাধারার ওপর বার বার কুঠারাঘাত করেছে। মানুষ পড়ছে, জানতে পারছে, বুঝতে পারছে, কিন্তু যেইমাত্র ফেরকাবাজির দলগত প্রশ্নটি আসে সেইমাত্র নিরপেক্ষতা হারিয়ে বেইঁস হয়ে পড়ে। তা ছাড়া মালপানি যেখানে অপকর্ম সেখানে। কারণ মালপানির শোক পুত্র মরে যাওয়া হতে বেশি শোক। তাই শাহ সুফি সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী, অধর্মের শিক্ষাগুরু, বার বার একটা কথা উপদেশের ভাষায় বলতেন : মশারির ডেতর জিকির করা খুবই সহজ, কিন্তু টাকার স্তুপের উপর ইমান ঠিক

রাখা বড়ই কঠিন। আজ তার রচিত কোরান তফসির কোরান দর্শন
তিন খণ্ডে নব জাগরণের অভয়বাণী শুনিয়ে যাচ্ছে।

শেষ কথা : মোরাকাবা

প্রতিটি বিষয়ের মাঝে একটি মাত্র উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে। আর তা
হলো, খান্নাসরুপী শয়তানটি মানুষ এবং জ্বিনের (জীব-জানোয়ার নয়)
পবিত্র নফসের ভিতর পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে।
উহাকে বাহির করে দাও, উহাকে মুসলমান বানিয়ে ফেল, আপন
নফসের 'তৃ'-টি তথা আন্নিতৃটিকে (আন্নিকে নয়) উৎসর্গ করে দাও,
হাস্তি মিটিয়ে ফেল, খুদিকে কোরবানি দাও, আহমকে দূর করে দাও,
ইগো তথা ইগো সেক্ট্রিসিটির বলয় হতে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা কর,
মায়ার অদৃশ্য বন্ধন ছিঁড়ে ফেল ইত্যাদি কত রকম ভাষায়, ভঙ্গিতে,
শৈলীতে একই কথা বার বার বলা হয়েছে। অথচ বুঝে নেবার জ্ঞানের
অভাবে বুঝেও বুঝতে পারি না, এটাই আল্লাহর হেকমত। এটাই বুঝিয়ে
দেয় যে আল্লাহ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলদাতা। নফস পবিত্র। শিশুর নফস
পবিত্র। নফসের সঙ্গে খান্নাসকে যোগ করে দিলেই হয় অপবিত্র। যখন
সাধক ধ্যানসাধনা তথা মোরাকাবার মধ্য দিয়ে মোৎমায়েত্তা করতে
পারেন তখনই জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদটি দেখতে পায়। হজরত
ইসা (আ.) তাই বলেছেন যে, তোমরা শিশুর মতো না হতে পারলে স্বর্গে

যেতে পারবে না। শিশুর নফস পবিত্র বলেই শিশুর উপমাটি তুলে ধরেছেন। নফস হল উদউনি তথা একা। নফস যোগ খান্নাস হলো দুই এবং দুই হলেই আল্লাহ ডাকের জবাব দেন না। কারণ উদউনি তথা একা আর রইলো না। উদউনা তথা দুইজন হয়ে গেল। তাই কোরানের সূরা মোমিনের ষাট নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে, তোমরা আম্মাকে একা (উদউনি) ডাকো, ডাকের জবাবটি সঙ্গে সঙ্গে পাবে। আর যদি তোমরা একা না ডেকে দুইজনে ডাকো (নফস যোগ খান্নাস) তো ডাকের জবাবটি জীবনেও পাবে না এবং ডাকের জবাব দেবার বিধানটি রাখা হলো না। তারপর কেউ যদি মনগড়া কথা বলতে চান অথবা দুইজন ডাকলেও ডাকের জবাব পাওয়া যায় বলেন তো অধমের বলার কিছু রইলো না। কোরানের এই আয়াতে বাকিতে পাওয়া যাবে বলা হয় নাই। বাকির নামটি যে ফাঁকি এই কথাটি কোরান আম্মাদের বলে দিচ্ছে। দুনিয়াতে যে অন্ধ থাকবে আখেরাতেও সে অন্ধই থাকবে। সুতরাং সর্বযুগে, সর্বকালে, সর্বধর্মে সুফিরাই বার বার বলে দিচ্ছেন যে, বাকির নাম ফাঁকি। সুফিরা বারবার আশ্বাস করছেন যে, আসো, ধ্যানসাধনা করো যার যার গুরুর দেওয়া প্রয়োগ-পদ্ধতিতে এবং এতে যদি কিছু না পাও তো গুরুটি বদলিয়ে ফেল। যে গুরু তোমাকে বাকিতে পাবার অজিফা পাঠ করাতে শিখিয়েছে সে গুরুই নয়, বরং গুরু নামের কলঙ্ক। ধ্যানসাধনাটি তোমাকেই করতে হবে, তবে গুরুর দেওয়া

প্রয়োগপদ্ধতিতে। সাধনা করে কিছুই পেলে না তো গুরু বদলিয়ে ফেল। অন্য গুরুর মুরিদ হও। কারণ গুরু এখানে মুখ্য বিষয় নয়, বরং রহস্যলোকের দর্শন লাভ করাটাই মূল বিষয়। গুরু ধরে মুরিদ হয়ে গুরুর প্রশংসার গীত সারাজীবন তোমাকে গাইতে বলে নি। বরং গুরু ধরে মুরিদ হয়ে ধ্যানসাধনা করে রহস্যলোকের দর্শন লাভ করে গুরুর প্রশংসার গীত গাইতে বলা হয়েছে। দর্শনের ইম্মান পাবার অজিফা শেখায় সুফিরা। অনুমানে ইম্মান অন্ধ, তাই নুন হতে চুন খসে গেলেই অনুমানের ইম্মানের দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। ফাঁকিবাজ বলে এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা ধ্যানসাধনা ছাড়াই রহস্যলোকের দর্শন করতে চায়। এই ফাঁকিবাজরাই চেতন গুরু খুঁজে বেড়ায়, যাতে বিনা কষ্টে বিনা পরিশ্রমে ইংলু আর কোয়ালিটি আইসক্রিমটি হাতে তুলে দেবার মত দিব্যজ্ঞান (রহস্যলোকের জ্ঞান) লাভ করতে পারে। এই ফাঁকিবাজ নামক শ্রেণীটি আছে বলেই তো এত বৈচিত্র্য, এত কথা, এত সমালোচনা আর এত বাহারি রং-এর নাচন-কুদন দেখতে পাই। সুফিরা যে মোরাকাবা তথা ধ্যানসাধনাটি শিখিয়ে দেন সেই ধ্যানসাধনাটি করতে হয় চব্বিশ ঘণ্টা তথা সব সময়; তবে একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হয়। সব সময়ের ধ্যানসাধনাটির আর এক নাম হলো দায়েমি সালাত। এই দায়েমি সালাতে যারা নিমগ্ন থাকেন তাদেরকে কোরানের সূরা মারেজের তেইশ নম্বর আয়াতে ‘মুসল্লি’ বলা হয়েছে। অবশ্য আমরা সকল নামাজিকেই

মুসল্লি বলবো। নামাজ মানুষকে সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত করে দেয় এবং যারা নামাজ পড়েও দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত হতে পারলো না তাদেরকেও মুসল্লি বলবো। যদিও আমার এই কথায় বেশির ভাগ মানুষ একমত হতে পারবে না, বরং গালি দিতে চাইবে। জানি, আমার কথার বিরুদ্ধে অনেক দলিল ধরতে চাইবে এবং দলিল তুলে ধরতে পারবে, কিন্তু আর একটু উপরে উঠতে পারলেই দেখতে পাবে আল্লাহর বিকাশধারার শৈলীতে কোনো ত্রুটি নাই। কোরানের একটি আয়াত তুলে ধরতে চাই। আলে ইমরান সূরার এক শত পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ওয়াম্মা কানা লে নাক্সীন্ আনতামুতা ইল্লা বেইজ্নীল্লাহে কেতাবান মুআজ্জালান’ অর্থাৎ ‘এবং আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কোনো নফ্সের মৃত্যু হইতে পারে না। কেননা, উহা (মৃত্যু) কিতাবে নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইয়াছে।’

জগতের যত প্রকার সঙ্গীত আছে সব সঙ্গীত মাত্র একটি নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা। এই ছকের বাহিরে যাবার কারো কোনো ক্ষমতাই নাই। সেই নির্দিষ্ট ছকটির নাম হলো, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সাঁ। জগতের যত প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞান আছে, যত প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আছে, যত প্রকার নূতন নূতন আবিষ্কার হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে, যত প্রকার আদেশ নিষেধ আছে, যত প্রকার ভালো-মন্দ আছে, সবই মাত্র একটি ছকে

বাঁধা। সেই ছকটির নাম নফস তথা আন্নি যোগ খান্নাসরূপী শয়তান এবং রুহ তথা পরমাত্মা। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিষয়টি ভালো, কিন্তু গবেষণায় পাওয়া গেল পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া। পক্ষেটিভের পাশেই নেগেটিভ। ভালোর পাশেই মন্দ। এই সংঘাতময় গতির মাঝেই মানব সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। একটা অদৃশ্য আশার নেশা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে সবাইকে। অথর্বও আশার নেশায় বেঁচে আছে। মনে করে, অনেক কিছু করবে, অনেক কিছু আমার হবে, কিন্তু কিছুই তার হবে না। সব মায়ী, সব ফাঁকা সঙ্গীতের কাজ, কাছে টানতে চায়, কিন্তু আশার নেশাটা কেটে গেলেই সব কিছু পরিষ্কার বুঝতে পারে। মৃত্যু নামক ঘটনাটি যখন নফসের উপর ঘটে তখনই বুঝতে পারে। তাই সুফিরা জীবিত থাকতেই মৃত্যু ঘটনার মজাটি বুঝতে পারে। যাকে বলা হয়, মরার আগে মরে যাও। ‘মৃতু কাবলা আন্তা মৃতু’। নফসের সঙ্গে শয়তান থাকবেই। এটাই বিধির বিধান। সুফিরা ধ্যানসাধনার মাধ্যমে যখন অব্যাহত শয়তানটিকে মুসলমান বানিয়ে ফেলতে পারেন তখনই রহস্যলোকে (জান্নাত) প্রবেশের অনুমতি লাভ করে। এর আগে ভোগের ঘূর্ণায়মান চক্রে বার বার ঘুরতে হবেই। সুফিরা জানেন যে, আন্নি (নফস), শয়তান (খান্নাস) এবং রুহ (আল্লাহ) এই তিনের নির্দিষ্ট ছকের সব রকম খেলা চলছে। এই তিনের ছক ছাড়া খেলাটি অচল। সুতরাং এই খেলার যিনি মালিক তিনি যদি খেলাটি বন্ধ না করেন তাহলে কারো কিছু করার অধিকার নাই। ইমামুল আউলিয়া

বায়াজিদ বোস্লামি বলেছিলেন যে, ধ্যানসাধনার একটি উঁচু স্তরে উঠে খুশি হয়ে বললেন, ‘রব, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট।’ জবাবে রব বললেন, ‘বায়াজিদ, তুমি সত্য কথাটি এখনও বলতে পারো নি।’ এবার বায়াজিত আরও কঠোর ধ্যানসাধনায় মগ্ন হতে শুরু করে রইলেন বেশ কিছুদিন। সহসা বলে ফেললেন, ‘আমিই সুবহানি-সব শান আম্মারই’। এটাই সত্য কথা, এটাই শেষ কথা, এটাই ধ্যানসাধনার একমাত্র বিষয়টি পাওয়া। বায়াজিদের ধ্যানসাধনার উঁচু স্তরেও শয়তানের কিছুটা গন্ধ অবশিষ্ট ছিল বলেই ‘তুমি সত্য কথাটি এখনও বলতে পারো নি’ বলে দেওয়া হলো। কিন্তু যখন শয়তান সম্পূর্ণরূপে নফস হতে বিদায় গ্রহণ করলো তখনই বলা হলো, ‘আমিই সুবহানি-সব শান আম্মারই’। এই কথাগুলো বুঝবার এবং গ্রহণ করার পেছনে অনেক জনমের অর্জিত তকদির বেহায়ার মত দাঁড়িয়ে থাকে। হ্যাঁ-এই বেহায়া তকদিরটিও বদলিয়ে যায় যদি কোনো ওলির বিশেষ দয়া ও রহমত বর্ষিত হয়। অন্যথায় অহঙ্কারের চক্রে বার বার ঘুরতে হবেই।

শয়তান শিথিয়ে দেয়, খোদা বাহিরে থাকে। খোদাকে বাহিরে খোঁজ। বাহিরে খোদার গুণাবলি আছে, জাত-রূপটি নাই। জাত-রূপটি থাকে মানুষের অন্তরে। তাই মানুষ ছাড়া খোদার পরিচয় জানবার বিধান নাই। মানুষকে ফেলে দিয়ে বাহিরে খোদা খোঁজাটাই শয়তানের কুমন্ত্রণা। এই

কুমন্ত্রণার ফাঁদে মনের অজান্তে পড়ে যেতে হয়। কত রূপক ভাষায় বলা হয়েছে যে, খোদা বান্দার কাছে এসেছিল বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে কিছু বান্দা খোদাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ‘আমিই এসেছিলাম তোমার দুয়ারে কিছু চাইতে।’ অবাক হয়ে বান্দা বলবে, ‘তুমি আবার কখন চাইতে এসেছিলে?’ ‘অভাবের তাড়নায় হাত পেতেছিলাম, কিছু না দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলে।’ ‘ঐ অভাবী মানুষটার রূপ ধরে কেমন করে এলে?’ ‘মানুষের রূপ ধরে বার বার আসি, কিছু শয়তানের কুমন্ত্রণায় বুঝতে পারো না।’ মানুষ বিহনে খোদাকে পাওয়া যায় না। কারণ মানুষের মাঝেই খোদা জাতরূপে বিরাজমান। মানুষ বিহনে শয়তানকে পাওয়া যায় না, কারণ মানুষের মাঝেই শয়তান বিরাজমান। মানুষ ছাড়া শয়তান আর কোথাও থাকে না (জ্বিনের কথাটি ইচ্ছা করেই এখানে উল্লেখ করা হলো না)। সমগ্র সৃষ্টি তৌহিদে বাস করে। তৌহিদের ভেতর শয়তান থাকার বিধান নাই। বাদ্যযন্ত্র তৌহিদে বাস করে। সুতরাং বাদ্যযন্ত্র শয়তানের বাহন নয়। বরং যিনি বা যারা বাদ্যযন্ত্র বাজায় তারা শয়তানের বাহন হতে পারে। কারণ মানুষ ছাড়া শয়তানের থাকার আর একটি স্থানও নাই। সুতরাং সৃষ্টিরাজ্যের কোনো জিনিস শয়তানের বাহন হতে পারে না, যতক্ষণ না মানুষের হাতে থাকে। কারণ মানুষ ছাড়া শয়তান নাই। মানুষ ছাড়া খোদার জাতরূপী পরিচয় নাই। সেফাতরূপী পরিচয়ে মানুষ ছাড়াও থাকতে পারে। এখানেই দার্শনিক হেগেল আর

কমিউনিজমের আবিষ্কারক মার্কস-এর মাঝে বিস্তর ব্যবধান। সিফাতকেই জ্ঞাত মনে করে মার্কস আত্মাটিকে অস্বীকার করেছেন। আবার সৈনিক-ধর্মটি খোদাকে চিনবার পথে আপেক্ষিকতার ভূমিকা পালন করে। সৈনিক-ধর্ম পালনের পথে উভয়েই থাকে। খোদার পথ এবং শয়তানের পথ দুটোই খোলা থাকে। পূর্বজন্মের কর্মফল দুটো পথের একটিতে নিয়ে যাবে। এটাকেই তকদির বলা হয়। সুতরাং জন্মান্তরবাদ যিনি বুঝতে পারেন নি তিনি ধর্মের কিছুই বুঝতে পারেন নি। ধর্মের অনুষ্ঠানে অণু-পরিমাণ সত্য আছে বলেই অনুষ্ঠানটি রাখা হয়। পূর্ব জন্মের কর্মফল ধর্মে অনুষ্ঠানটি বুঝা এবং না বুঝার উপর নির্ভরশীল।

মানুষের দেহটি খোদার সিফাত। মানুষের জীবাত্মাটি (নফস)-ও সিফাত। দেহটি হল স্থূল সিফাত। জীবাত্মা তথা নফসটি হল সূক্ষ্ম সিফাত। খাল্লাসরূপী শয়তানটি হল জীবাত্মা তথা নফসটিকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে একটি অনস্তিত্ব (নন একজিসটেনস)। হোমিও ঔষধে নবম শক্তিতে ঔষধের অস্তিত্ব থাকে না, থাকে কেবলমাত্র অ্যালকোহল। তা হলে দুইশত এবং হাজার শক্তিতে কিছুই নাই, কিন্তু শক্তির তাগুব বাড়তে থাকে। দশ হাজার এবং লক্ষ শক্তিতে কেবল প্রচণ্ড শক্তিটাই থাকে, কিন্তু ঔষধের অস্তিত্ব থাকার প্রশ্নই উঠে না। খাল্লাসরূপী শয়তানের অস্তিত্ব নাই, কিন্তু শক্তির ভয়ঙ্কর তাগুব আছে বলেই ভয়ঙ্কর

যুদ্ধ হয়। মায়ার নেশায় মত্ত হয়ে মানবতার অপমান করা হয়। মায়ার নেশায় ভণ্ডামি করা হয় আবার মায়ার নেশায় অপরের ঘাড়ের ভণ্ডামির অপবাদটি চাপিয়ে দেয়। রাজনীতি যারা করে তারা তো একশত ভাগের উপর ভণ্ডামি করে জনতার কাছে সাধু সাজে। স্বপ্নেও এরা মিথ্যা কথার ভণ্ডামি করে। অথচ দরদি সাজে। দেশপ্রেমিক সাজে। কত কথার মালা তৈরি করে সহজ সরল মানুষগুলোকে ধোঁকা দেয় এই অনন্তিতৃ নামক খান্নাসরূপী শয়তানটিকে নফসের সাথে তথা জীবাত্মার সঙ্গে জুড়ে দেবার কারণে। তাই বার বার শয়তান বিষয়ের উপর কোরান সাবধান করে দিচ্ছে। কেউ শোনে কেউ শোনে না। কেউ ধরি মাছ না ঝুঁই পানির মতো বিশ্বাস করে। এই মৃত্যু ঘটনাটি ঘটার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কর্মফল লিখে রাখা হয়। তারপর সেই কর্মফল অনুযায়ী আর একটি দেহধারণ করতে হয়। অনেক সময় মানবকুলে জন্ম নেবার কর্মফলটি হারিয়ে ফেলে। জীবকুলের দেহটি ধারণ করতে হয়। তাই লোভ-মোহ জয় করাটা চাটুখানি কথা নয়। সুতরাং শয়তান, ইবলিস, মরদুদ আর খান্নাস কখনই খোদার সীফাত নয়। বরং অভিশাপ আর ধ্বংস।

দেহটি স্থূল সীফাত। নফসটি তথা জীবাত্মাটি সূক্ষ্ম সীফাত। স্থূল সীফাত দেহটি হলো স্থূল বাস্তব। যাহা চোখে দেখা যায় তাহাই স্থূল তথা মোটা। স্থূল দেহটি মাটির তৈরি। দুনিয়ার অবস্থানটি মাটি। মাটির দুনিয়া

ম্ৰাটিৰ দেহটি আকৰ্ষণ কৰে। ম্ৰাটি ম্ৰাটিকে আকৰ্ষণ কৰাটো স্বাভাৱিক। এক সময় জীৱাত্মা তথা নফ্‌স যখন ম্ৰাটিৰ দেহ হতে বিদায় গ্ৰহণ কৰে তখন মূল ম্ৰাটিৰ দেহটি পড়ে থাকে। দেহটি তখন আৰ এক নামধাৰণ কৰে। লাশ বলে ডাকা হয়। সূক্ষ্ম নফ্‌স তথা জীৱাত্মা সূক্ষ্ম ৰাজ্যে অবস্থান গ্ৰহণ কৰে। সূক্ষ্ম ৰাজ্যটিকে অনেকে ৰহস্যলোকে অবস্থান কৰাৰ কথাটি বলে। অনেকে চাৰ্বাক আৰ নিটশেৰ মত সূক্ষ্ম নফ্‌স আৰ সূক্ষ্ম ৰাজ্যে অবস্থান কৰাৰ কথাটি অস্বীকাৰ কৰে। অবশ্য না বুঝেই এ ৰকম কথাটি বলে। তাইতো যুগে যুগে মুন-খমি-ওলি আল্লাহৰা ধ্যানসাধনা কৰে পৰম্পৰে পৰিচয় জানবাৰ আশ্বান কৰে যাচ্ছেন। এই আশ্বানেৰ নামই সুফিবাদ। সুতৰাং সুফিবাদে সংকীৰ্ণতাৰ স্থান নাই। গোড়ামি আৰ সৈনিক ধৰ্ম্মেৰ কোনো স্থান সুফিবাদে নাই। তাই তো বু' আলী শাহ কলন্দৰ, বশৰে হাফি আৰ বাংলার সুফি সম্ৰাট বাবা লালন শাহ সুফিবাদেৰ দুয়াৰে সৈনিক ধৰ্ম্মটিকে আসতে দেন নি। অনেকে আবার সুফিবাদ আৰ সৈনিক ধৰ্ম্মটিকে পাশাপাশি ৰেখেছেন। সুফিবাদেৰ দুয়াৰে সৈনিক ধৰ্ম্মটিকে তাকিয়াৰূপে ৰাখলে দোষ নাই, কিন্তু হাৰ্কাৰূপে ৰাখলে সে সুফি হতেই পারে না। বরং সুফিবাদেৰ মাঝে গুপ্তগোল বাধিয়ে দেবার প্ৰথাটি চালু কৰা হয়। অবশ্য সব কিছুই নিয়ন্তেৰ উপৰ নিৰ্ভৰ কৰে। কেউ বুঝতে পারে, আবার কেউ পারে না। পূৰ্বজন্মেৰ কৰ্মফল বুঝিয়ে দেবে, আবার বুঝতে দেবে না। সুফিবাদেৰ প্ৰকৃত অনুসারীদেৰকে

বাকিতে পাবার কথাটি ভুলেও বলবে না এবং বলতে পারে না। মুরিদ বা অনুসারীদেরকে শিখিয়ে দেবে যে, কেমন করে রহস্যলোকের বিষয়গুলো জানতে পারবে, বুঝতে পারবে। অথচ যারা সৈনিক ধর্মের অনুসারী তারা তাদের অনুসারীদের কাছে সব বিষয়গুলো বাকিতে বিক্রি করে। তথা মরে যাবার পর সুখ, আনন্দ ইত্যাদি বিষয়গুলো পাবার নিশ্চয়তা দান করে। সৈনিক ধর্ম বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তাদের কথাগুলো শুনলে মনে হবে এরাই সব কিছু জেনে ফেলেছে। যে কোনো প্রশ্নের উত্তর গড়গড় করে দিতে পারে। আগেও তাই ছিল এবং এখন তো আরও ভয়ঙ্কর। আগে বলতো, পৃথিবী স্থির আর সৌরজগত পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং এই কথাটি প্রমাণ করার জন্য হাদিস নাম দিয়ে অখাদ্য কথা লিখতো, বলতো আর প্রচার করতো। এখন এরা এসব কথা ভুলেও বলে না। কিছুদিন আগে টান্দে মানুষের স্পর্শ কথাটি হেসে উড়িয়ে দিত এবং কত দলিল পেশ করতো। মনে হয়, এখনো কিছু লোক আছে যারা টান্দে মানুষের গমন কথাটি বিশ্বাস করে না। এরা মোবাইল ফোনটা বড় দুঃখ কষ্ট নিয়ে হাতে নেয়, কারণ বিজ্ঞান এদেরকে হাতে নিতে বাধ্য করে। এরা হালাল সাবান গায়ে মেনে জান্নাতে যাবার বিজ্ঞাপন দেয়। এরা যা কিছু বলবে সব কথার সারমর্মটি হল বাকি। পনেরটি বছর নির্জনে একা ধ্যানসাধনা করার পরই যে নবুয়ত পেলেন, কোরান পেলেন এবং জিবরিল আমিনের দর্শন পেলেন এবং এগুলো যে নগদ পাওয়া গেল সেই

কথাটি ভুলেও বলবে না। এরা বান্ধার হক, এতিমের হক, এরা বন্যা, ঝড় খাওয়া মানুষের সাহায্য মেরে দিয়ে হজ করে হাজরে আসোয়াদে চুমু দিয়ে সব রকম পাপমুক্তির আশা করে। এরা কোটি মানুষের হক মেরে দিয়ে পঁচাচ মারা দর্শনটি গুনিয়ে দিয়ে পবিত্র সাজতে চায়; কিন্তু খোদার দরবারে এ রকম আশাড়ে গল্পো-মার্কো দর্শনটি কি চলবে? পাবে কি কোনো পরিব্রাণ? কোরান হাদিস পড়ুন আর পড়ুন অধর্মের লিখা মারেফতের গোপন কথা নামক বইটি। বইটি শোষক, জালেম, আর মতলববাজদের মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল, যার দরুণ একদিন নিষিদ্ধ হবার ফরমান জারি করেছিল। বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল অনেক অপবাদ আর অভিযোগ নিয়ে। কিন্তু মাননীয় বিচারক বেকসুর খালাস দিয়েছিলেন। বিচারকের নামটি হয়তো জীবনগে ভুলতে পারবো না। আজ উনি, শুনেছি যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় ফজলে কবীর।

কোরানে আছে, যারা নামাজ পড়ে তাদের কপালে নামাজের একটি চিহ্ন ফুটে উঠে। কপালের ঘষা খাওয়া কালো দাগটিই যদি নামাজের চিহ্ন বলে ধরে নেই তো, আগের নবীদের উম্মতরা নামাজ তথা সালাত কায়েম করেছে কিন্তু কপালে কালো দাগটি ছিল না। তা হলে কি মহানবীর উম্মতের বেলায় শুধু বুঝতে হবে। কিন্তু কোরানে তো সব

সালাতি তথা নামাজির কপালে চিহ্নটি ফুটে উঠার কথাটি বলা হয়েছে।
তবু আমরা কপালের ঘষা খাওয়া কালো দাগটিকে নামাজের চিহ্ন বলে
ধরে নেব। কিন্তু দায়েমি সালাতে যিনি যারা আছেন তাদের বেলায় কী
বলা হবে? ওয়াক্তিয়া নামাজে কপালে কালো দাগ পড়তে পারে, কিন্তু
দায়েমি সালাত তথা চব্বিশ ঘণ্টার সালাতে যারা থাকেন তাদের কপালে
কেন কালো দাগটি নাই? কোরানের সূরা মারজের তেইশ নম্বর আয়াতে
বলা হয়েছে যে, তিনিই মুসল্লি যিনি দায়েমি সালাত
পালন করেন। দায়েমি সালাতের রুকু-সেজদা থাকে না, এটা কমবেশি
সবাই বুঝতে পারে। তা ছাড়া ওয়াক্তিয়া সালাতেও যাদের দাঁড়াবার শক্তি
নাই তাদেরকে বসে নামাজ আদায় করতে বলা হয়েছে। এমন কি বসে
নামাজ আদায় করার শক্তি যাদের নাই তাদের গুয়ে গুয়ে নামাজ আদায়
করার কথাটি বলা হয়েছে। এই বিষয়গুলো ভাল করে জানা না
থাকলেই ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে। যারা দায়েমি সালাতে মাস্ত হয়ে
মাজ্জুব হয়ে আছেন তাদেরকে ওয়াক্তিয়া সালাত পালন করছে না বলে
নানা প্রকার অপবাদ দেওয়া কি ঠিক মনে করেন? জোর করে চাপিয়ে
দেওয়ার কথাটি কি কোরানের একটি আয়াতে আছে অথবা দেখাতে
পারবেন? বরং ধর্ম বিষয়ে কোনো প্রকার জোর জবরদস্তি নাই বলে কি
কোরানের সূরা বাকারাতে নাই? তা হলে বলপ্রয়োগ করার কথাটি
কোথায় পেলেন?

জীবাত্মাটি কবরেও যায় না এবং শ্মশানেও যায় না। জীবাত্মাশূন্য মানব দেহটি তথা লাশটি কবরে যায় এবং শ্মশানে যায়। তবে হাকিকি কবরটি কী? প্রতিটি মানুষের জীবন্ত দেহটি তথা জীবাত্মার উপস্থিতি থাকা অবস্থায় দেহটিকে কবর বলা হয়। সুতরাং প্রতিটি জীবন্ত দেহ এক একটি কবর। এই জীবন্ত দেহ-কবরে কত প্রকার যে রোগ-যাতনার শাস্তি হয় তাও কি বলতে হবে? কবরে আজাব তথা শাস্তি ভোগ করতে হবে-এই কথাটি সত্য। কিন্তু কবর কী এবং কবর বলতে কী বুঝায় তা আগে বুঝে নিতে হবে। একটি জীবন্ত দেহটিই জীবাত্মার কবর। এই কবরকে হাকিকি কবর তথা আসল কবর বলা হয়। আর জীবাত্মা নাই অথচ দেহটি আছে সেই দেহটিকে লাশ বলা হয়। লাশটি মুসলমান কারণ লাশ তৌহিদে বাস করে। সুতরাং যাহা তৌহিদে বাস করে উহার শাস্তির মুখোমুখি হবার প্রশ্নটিই উঠে না। শাস্তি পাবে জীবাত্মা তথা নফস। মৃত্যু নামক ঘটনাটির আশ্বাদ তথা মজা পাবে জীবাত্মা তথা নফস। বিচারের মুখোমুখি হতে হবে নফস তথা জীবাত্মার। মৃত্যু নামক ঘটনাটি ধ্বংস নয়, বরং আশ্বাদন। এই সব রকম বুট-ঝামেলা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হলো রুহ তথা পরমাত্মা। অধম লিখক যেসব কথা লিখছি এগুলো পড়ে মোটামুটি একটা হাল্কা ধারণা পেতে পারেন। এই হাল্কা ধারণা যে বিশ্বাস বা ঈমানটি আনবে উহাও হাল্কা। কোরানের ভাষায় এই জাতীয় ঈমানকে এলমুল ইয়াকিন বলা হয়েছে।

হাল্কা এ জন্য বলতে হল যে, এই ইম্মানটি অন্ধবিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে। অন্ধবিশ্বাস সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না। তাই রহস্যলোকের প্রত্যক্ষ দর্শনটিই হল স্থির বিশ্বাস। এই প্রত্যক্ষ দর্শনটি যার হয়ে গেছে তার ইম্মান আর ভেঙ্গে যাবার ভয় থাকে কোথায়? যে বিষয়টি গোপন ছিল উহাই যখন আর গোপন না থেকে দর্শনীয় বিষয়ে পরিণত হলো তখন ইম্মান বা বিশ্বাস হারাবার কথাটি আত্মবিরোধী কথা হয়ে যায়। অন্ধবিশ্বাস বা ইম্মান বিষয়ে আল্লাহর ওলিরা বার বার সাবধান করেছেন, বলেছেন, সাবধান ইম্মানটি যেন হাসতে হাসতে, খেলতে খেলতে, বলতে বলতে হারিয়ে না যায়। কারণ অন্ধ বিশ্বাস বড়ই নাজুক। ঠুনকো কাঁচের মত। সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু যে বিশ্বাস বা ইম্মান হাতে নাতে দেখতে পেয়েছে, ধরা দিয়েছে সেই ইম্মান বা বিশ্বাস হারাবার প্রশ্নই উঠে না। এই দর্শনের ইম্মানটি কেমন করে হবে এই প্রশ্নের উত্তরটি দেবার জন্যই একটি মোরাকাবা তথা ধ্যানসাধনার ফর্মুলাটি দিলাম। মাত্র একশত বিশ দিন একটানা এই মোরাকাবাটি করে দেখুন-হয়তো নিরাশ হবেন না। রহস্যলোকের কিছু কিছু বিষয় যে দেখতে পাবেন, বুঝতে পারবেন তা প্রায় অনেকটা নিশ্চিত। অধম লিখকের কথামতো মাত্র একটি মোরাকাবা করে দেখুন-অবশ্যই রহস্যলোকের কিছু নিদর্শন দেখতে পাবেন। ধরে নিলাম-কিছু দেখতে পেলেন না, তা হলে আমাকে ম্লিথ্যুক বলে গালি

দেবেন। তবে এটুকু দেখে নিবেন যে, মোরাকাবাটি যেভাবে করতে বলা হয়েছে সেভাবে করতে পেরেছি কি না। সেই বিচারের ভারটি আপনার উপর ছেড়ে দেওয়া হলো। তবে কথামতো আন্তরিক হয়ে মোরাকাবাটি করতে পারলে অবশ্যই রহস্যলোকের অনেকখানি দেখতে পাবেন। সুফিবাদ তো বহু দূরের কথা, আল্লাহর উপর হাল্কা ইম্মানওয়ালাকে চুক্তিতে ধ্যানসাধনাটি করার কথা বলে একশত বিশ দিন ধ্যানসাধনার ফুলে গিয়ে ধ্যানসাধনাটি করে আমার কাছে এসে হাউ মাউ করে কেঁদে বলে ফেললেন যে, মোরাকাবাটি একটি মহা সত্য। আমার কোনো প্রশ্ন করার আগেই ধ্যানসাধনার কর্মফলটি যে কী অদ্ভুত বিস্ময়কর তার বয়ান শুনে আমি নিজেও অবাক হয়ে যাই। কারণ ধ্যানসাধনার কর্মফলটি কখনোই এক রকম হয় না। যার যার মনের অনুভূতি এবং গভীরতার মাপকাঠিতে এক এক রকম হতে বাধ্য। মাত্র ত্রিশজন একটানা এক শত বিশদিন ধ্যানসাধনা করেছেন। তারা সবাই রহস্যলোকের কিছু না কিছু দর্শনলাভ করেছেন। তবে এই ত্রিশজনের বর্ণনার মধ্যে কারো সঙ্গে কারো মিল পাওয়া যায় নি। এই ত্রিশজনই যে আমার মুরিদ তা নয়। অন্য পীরের মুরিদ এবং একজন পীর সাহেবও ধ্যানসাধনাটি করেছেন। আমি বলেছি যে, নূতন করে আমাকে পীর ধরতে হবে না, কেবলমাত্র শিক্ষাপ্তরুপে গ্রহণ করুন। কারণ শিক্ষাপ্তরুপে গ্রহণ করাতে কোনো ভয় নাই। আবার এই ত্রিশ জনের

মধ্যে দুইজন মাওলানা। দুজনই টাইটেল পাশ। একজন অন্য পীরের
মুরিদ অপরজন ওহাবি আকিদায় বিশ্বাসী। ওহাবি আকিদায় বিশ্বাসী
মাওলানা সাহেব অনেকটা চ্যালেঞ্জরূপে গ্রহণ করে ধ্যানসাধনাটি
করেছেন। তিনি একশত বিশ দিন সাধনাটি করার সঙ্গে সঙ্গে আরও
একশত বিশদিন ধ্যানসাধনাটি করার পর আরও করতে চেয়েছিলেন।
প্রথমে অনুমতি দেই নাই। বরং মোরাকাবাটির মাহাত্ম্য এবং গুরুত্ব
প্রচারের কর্তব্যটি পালনের অনুরোধ করলাম। কিন্তু বিশেষ অনুরোধে
আরো একশত বিশ দিন মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করার অনুমতি
দিলাম এবং পুরো এক টানা এক বছর ধ্যানসাধনাটি করেছেন। উনি
বলেন যে, বাহিরের দৃশ্যমান জগতের রহস্যই অনেক, কিন্তু মোরাকাবার
ধ্যানসাধনার জগতটি আরও বড় আরও বিশাল এবং ব্যাপক। এই
মোরাকাবার ধ্যানসাধনার মাধ্যমে যে রহস্যলোকের প্রত্যক্ষ জ্ঞানটি
অর্জিত হয় ইহাকেই কোরানের ভাষায় স্তরভেদে আইনুল ইয়াকিন এবং
হাক্কুল ইয়াকিন বলা হয়। এই একিন ভেঙ্গে যাবার তথা হারিয়ে যাবার
তথা পালিয়ে যাবার আর কোনো প্রকার প্রশ্নই উঠে না। এই সাধকদের
বেলায় ইমান হারাবার ভয়-ভীতি ও উপদেশগুলোর আর কোনো
প্রয়োজন হয় না। অনুমানের বিশ্বাস তথা ইমান তথা এলমুল ইয়াকিন
এবং প্রত্যক্ষ দেখার ইমান তথা হাক্কুল ইয়াকিনের মাঝে আকাশ-পাতাল
ব্যবধান। হাক্কুল ইয়াকিনের মাঝে আর কোনো সন্দেহ-সংশয়, ভয়-

ভীতি থাকার প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই ইমান যিনি লাভ করতে পেরেছেন তিনিই মোমিন এবং মোমিনের সঙ্গে আল্লাহ আছেন বলে কোরান ঘোষণা করেছে। আমানুর সঙ্গে আল্লাহ আছেন বলে কোরান একবারও বলে নি। সুতরাং আমানু এবং মোমিনের মাঝে বিরাট পার্থক্যটি দেখতে পাই।

এখন আমরা মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি লিখে দিলাম। মোরাকাবাটি করার জন্য প্রথমেই চাই একটি নির্জন পরিবেশ। সেই নির্জন পরিবেশে একটি ছোট ঘর বানিয়ে ধ্যানসাধনাটি করতে হয়, তাই আমরা একটি নির্জন স্থানে মোরাকাবার ধ্যানসাধনার একটি স্কুল তৈরি করেছি এবং বর্তমানে মৌলজন সাধকের জন্য আলাদা আলাদা মোরাকাবার ঘর তৈরি করেছি। একটি পৃথক বাবুর্চিখানা এবং একটি খাবার ডাইনিং হল তৈরি করেছি। সাধকদের খাবার তালিকায় মাছ, মাংস এবং ডিমের কোনো স্থান নাই। সাধকদেরকে এহরামের পোশাক পরতে হবে তথা কাটা কাপড়ের লুঙ্গি এবং কাটা কাপড়ের একটি চাদর পরতে হয়। সাধনারত অবস্থায় কোনো প্রকার জীবহত্যা করা যাবে না। একমাত্র বিষাক্ত সাপ বা এই জাতীয় জীব ছাড়া। যতদিন ধ্যানসাধনাই করুক না কেন, তা যদি একবছরও হয় তবু চুল, নখ, দাড়ি, ফেলা যাবে না। তবে একান্ত বিশেষ কারণে এই নিয়মের কিছুটা এদিক-সেদিক করা যায়।

সাধনারত অবস্থায় কোনো প্রকার কথা বলা একদম নিষেধ। কাগজ কলমের মাধ্যমে লিখে জানাতে হবে। তবে লিখাপড়া জানা না থাকলে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলা যাবে। মাগরিবের আজানের সঙ্গে সঙ্গে সাধককে তার নিজের সাধনার ঘরে প্রবেশ করতে হবে এবং নিজের শরীরের ক্ষমতা অনুযায়ী গুরু ধ্যানসহ বিশ-ত্রিশ মিনিট আল্লাহ জিকিরটি করতে হবে। একটানা করতে না পারলে খেমে খেমে করা যাবে। জিকিরের পরপরই এক হাজার দানার একটি তসবি হাতে নিয়ে গুণে গুণে এক হাজার বার গুরু ধ্যানসহ পড়তে হবে ‘ইয়া হাসান মইনউদ্দিন... ইয়া কানাবুদু ওয়া ইয়া কানাস তাইন।’ এরপর একটি একশত দানার তসবি হাতে নিয়ে গুরু ধ্যানসহ গুণে গুণে দুইশত বার পড়তে হবে ‘সাল্লাল্লাহু নাবীয়ানা সাল্লাল্লাল্লাহু মুহাম্মাদীন, ইয়া গাউসে খোদা মুশকিল কুশা আল মাদাদ কিজিয়ে।’ এই অজিফা পাঠ করার সময় ঘরের বাতি নিভিয়ে ফেলতে হবে। কারণ অন্ধকার ছাড়া সাধনা হয় না। মহানবীকেও রাতের অন্ধকারে মেরাজে নিয়ে গিয়েছিলেন। দিনে নয়। সাধকদের জন্য দিনের বেলায় কোনো সাধনার অজিফাপাঠ নাই। এর পরপরই গুরু ধ্যানসহ পাঁচশত বার এই অজিফা পাঠ করতে হবে ‘ইয়া আলী, ইয়া মুশকিল কুশা আলী, ইয়া পাঞ্চাতন পাক আলী, ইয়া সনিজাত আলী।’ এরপর সাধককে আবার একহাজার দানার তসবিটি হাতে নিয়ে গুরু ধ্যানসহ এক হাজারবার এই অজিফাটি পড়তে হবে,

‘কুলনা ইয়ানারু কুনী বারদাও ওয়া সালান্নুন আলা ইব্রাহিম।’ এরপর আবার সাধককে এই অজিফাটি এক হাজারবার পড়তে হবে ‘ইয়া কাহহারু ইয়া জাল্লে জালালুহ’। এরপর আবার একশত দানার তসবিটি হাতে নিয়ে গুণে গুণে গুরুর ধ্যানসহ তিনশত তেরবার আয়তুল কুরসী তথা সূরা বাকারার দুইশত পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতটি পড়তে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এই অজিফা পাঠের সময় ঘরে রাখা কিছু হালকা খাদ্য পানি গ্রহণ করা যাবে এবং বাহিরেও ঘুরাফেরা করা যাবে এবং পায়খানা, পেসাব ও প্রয়োজনীয় কোনো

কাজ থাকলে তাহাও করা যাবে। নিজবাড়িতে মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি না করাই ভাল। তবে ট্রেনিং হিসাবে করা যায়। মোরাকাবার ধ্যানসাধনার সময় কোনো প্রকার বই-পুস্তক, খবরের কাগজ পড়া সম্পূর্ণরূপে হারাম। গান-বাজনা হালকা শুনা যায় তবে না শুনাই ভালো, কারণ গুরুর ধ্যানটি কেটে যেতে পারে। সাধকদের আরও মনে রাখতে হবে যে, সাধনারত অবস্থায় যোনাঙ্গের কোনো প্রকার ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। খান্নাসরুপী শয়তান মানুষকে প্রতি পদেপদে ধোঁকা দেয় এবং মোরাকাবার সাধকদের ধোঁকা দেবার জন্য খান্নাসরুপী শয়তান উঠে পড়ে লেগে যায়। কারণ খান্নাসরুপী শয়তান কখনোই গুরুপূজা করে না এবং গুরুপূজার কথাটি শুনলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে এবং কত প্রকার যে নূতন নূতন বাহানা তৈরি করে তার ইয়াত্তা

নাই। ধর্মের নামেই এরা ধর্মের মাথায় বার বার আঘাত করে। এরাই মূর্তিমান ওহাবিরা নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করাটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। অথবা বাহানার তেলেসম্মতি যুক্তিতর্ক দাঁড় করায়। এরাই ইসলামের নামে, ধর্মের নামে, কোরান-হাদিসের অপব্যাক্যার দোহাই দিয়ে জিহাদের নামে জঙ্গিবাদ তৈরি করে। যর্কিনধু যে রকম মধু নয়, এদের মনগড়া কোরান- হাদিসের ব্যাক্যাত্ত প্রকৃত ব্যাক্যাত্ত নয়। এরা জগতের সমস্ত ওলি-আউলিয়াদেরকে অস্বীকার করে। এদের প্রতারণার ফাঁদে পা রাখা হতে সবাইকে তথা সুফিবাদে বিশ্বাসীদেরকে সাবধান থাকতে হবে এবং এদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার করাটিকে প্রয়োজন মনে করি। সুফিবাদে বিশ্বাসীদের খুব কম করে হলেও কিছুটা সাহায্য সহযোগিতা করা কর্তব্য মনে করি। আমাদের নিজ হাতে গড়া এই মোরাকাবার ধ্যানসাধনার স্কুলটির উন্নয়নের প্রয়োজনে সুফিবাদে বিশ্বাসীদের একান্ত অনুরোধ করছি যে, আসুন, নিজ চোখে মোরাকাবার স্কুলটি দেখে যান এবং সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না আপনিই বিবেচনা করুন।

মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটির প্রথম পর্বটি বইতে লিখে জানিয়ে দিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের বিষয়গুলো গোপনীয় বলেই না লিখে যারা ‘শাহ সুফি’ খেতাবপ্রাপ্ত এবং কমপক্ষে তিনটি মোরাকাবা করেছেন তাদের নাম ঠিকানা লিখে দেওয়া হয়েছে। এই সাধক খলিফাদের কাছ থেকেই

দ্বিতীয় পর্বের বিষয়গুলো জেনে নিতে পারেন যদি ধ্যানসাধনা করার আগ্রহটি থাকে। সাধারণত খেলাফতকে পাঁচ প্রকারে ভাগ করা যায়। ধ্যানসাধনা ছাড়া যাদেরকে খেলাফত দেওয়া হয়েছে তারা আম্ম খলিফা তথা অতি সাধারণ খলিফা। এই সাধারণ খলিফাদের কাছে ধ্যানসাধনার বিষয়টি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করা বৃথা। তাই এরা সাধারণ খলিফা। যারা এক, দুই বা তিনবার মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি করেছেন তারাই খাস খলিফা। আর যারা একটানা চার মাস, ছয় মাস, নয় মাস বা এক বছর ধ্যানসাধনা করেছেন তারাই খাস সুল খাস খলিফা। এদের কাছে প্রচারিত হবার প্রশ্নই উঠে না। যে মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি কিছুদিন আগের ওলিরাও করে গেছেন আজ সেই মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটি কেতাবেই দেখতে পাই। বাস্তবে সমগ্র বাংলাদেশে কোনো পীর-ফকির একটি মোরাকাবার ধ্যানসাধনার স্কুল খুলেন নি। বাবা জ্ঞান শরিফ শাহ সুরেশ্বরী শতবর্ষ আগে এই মোরাকাবার ধ্যানসাধনাটির গুরুত্ব এতখানি দিয়ে গেছেন যে ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়। অবাক হতে হয় তাঁর রচিত বই নূরে হক গজে নূর, সিররে হক জামে নূর, মাতলাউল উলুম, আইনাইন, সফীনায়ে সফর ইত্যাদি বাংলা ভাষায় এবং উর্দু ও ফারসি ভাষায় রচিত বইগুলো পড়লে। জয় বাবা জ্ঞান শরিফ শাহ সুরেশ্বরী। জিন্দাবাদ বাবা জ্ঞান শরিফ শাহ সুরেশ্বরী। পায়েরদাবাদ বাবা জ্ঞান

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ইতিহাস নয় সুফিবাদের রহস্য বইটি প্রকাশে যারা আর্থিক সহযোগিতা
করেছেন তাদের নামের তালিকা

১. মাহবুবুর রহমান, পিতা-মোতালেব সরকার, দড়িপুরা, নিমগাঁও,
জয়নগর, শিবপুর, নরসিংদী। ২. নূরুন নাহার, স্বামী-আবদুল হক,
শাহজাদপুর, ক-৬২/২ বাড়ি, ঢাকা। ৩. রফিকুল ইসলাম,
পিতা-হাজি মো. নূরুল ইসলাম, মৌগাছি, বানেশ্বর, চারঘাট,
রাজশাহী। ৪. জাহেরা বেগম, পিতা-আবদুল মজিদ মৌল্লা, দুগাচী,
জয়পুরহাট। ৫. শিরীন আক্তার, পিতা-হাজি হাবিবুল্লাহ, শাহজাদপুর,
বাড়ি, ঢাকা। ৬. রেজাউল হক মৌল্লা, পিতা-তসিমউদ্দিন মৌল্লা,
চকেকসব, বালুবাজার, মান্দা, নগাঁ। ৭. আলাউদ্দিন, পিতা-আবদুল
আউয়াল, দুর্গারামপুর, বাঞ্ছারামপুর, বি. বাড়িয়া। ৮. মনিরউদ্দিন,
পিতা-মো. ইয়াকুব আলী, বগাজান, ভালুকা, ময়নসিংহ। ৯. হোসেন
আলী, পিতা-আরশ আলী ভাণ্ডারী, খুনের চর, মৌল্লার হাট,
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ১০. নজরুল ইসলাম, পিতা-সিরি মিয়া ভাণ্ডারী,
মন্ডের চর, মৌল্লার হাট, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ১১. প্রদীপ চন্দ্র শীল,
পিতা-নিখিল চন্দ্র শীল, আসাদপুর, ঘনিয়ার চর, হোমনা, কুমিল্লা।
১২. মো. খুরশিদ মিয়া, পিতা-ইরান মিয়া, শিবনগর, চন্দনপুর,
মেঘনা, কুমিল্লা। ১৩. এছহাক মিয়া, পিতা-সুলতান মিয়া,

মোল্লাকান্দি, খাসমহল (বালুরচর), সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ। ১৪. ম্যাওলানা হোসাইন আহমেদ, পিতা-কাজি মো. ইউনুস, আসাদনগর, বাঞ্ছারামপুর, বি. বাড়িয়া। ১৫. জয়নাল আবেদীন, পিতা-মো. বাচ্চু মিয়া, আসাদনগর, বাঞ্ছারামপুর, বি. বাড়িয়া। ১৬. নজরুল ইসলাম খোকন, পিতা-মোসলেমউদ্দিন, খোশকান্দি, ধারিয়ার চর, বাঞ্ছারামপুর, বি. বাড়িয়া। ১৭. ফাতেমা আক্তার লিজা, পিতা-জাকির হোসেন, শালগারিয়া, পাবনা। ১৮. মো. হাফিজুল ইসলাম, পিতা-মোজাহার আলী, হরহরিয়াপাড়া, জয়নগর, ফুলবাড়িয়া, দিনাজপুর। ১৯. আমির হোসেন, পিতা-নজরুল ইসলাম, চুনিয়াপাড়া, দেওয়ানগঞ্জ, জাম্মালপুর। ২০. ফরহাদ হোসেন, পিতা-সেলিম কাজী, দিঙ্গলিয়া, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ। ২১. নাছিরউদ্দিন, পিতা-ইসমাইল হোসেন, চাউলাকাটি, চাখার, বানারীপাড়া, বরিশাল। ২২. আবদুল হক, পিতা-রোস্তম শেখ, দ্বীপপুর, মেঘুলা, দোহার, ঢাকা। ২৩. কাজী মোহাম্মদ হোসেন, পিতা-হাজি আহমদ উল্লাহ, খাসীপুর দরবার শরিফ, আহমদনগর, চাটখিল, নোয়াখালী। ২৪. রেজাউল আলম, পিতা-শামসুল আলম, লাক্সলমোড়া, দৌলতপুর, ছাগলনাইয়া, ফেনী। ২৫. মেহেদী মাসুদ, চ-১৩৯ গোপীপাড়া, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা। ২৬. জীবন সিদ্ধিকী, পিতা-বাবর আলী, জিন্নতপুর, ওয়াহেদপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা। ২৭.

আয়েশা আক্তার, স্বামী-কাজি আফাজউদ্দিন, মুহরিপটি, চুনকুটিয়া
পূর্বপাড়া, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ২৮. নাজমা পারভীন, পিতা-আবদুস
সাত্তার মিয়া, লক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর। ২৯. সৈয়দ ফরহাদ নাসিম (সজল),
পিতা-মনসুর আলী দেওয়ান, কানপুর, আক্কেলপুর, জয়পুরহাট। ৩০.
সৈয়দ আবদুল লতিফ (লুলু), পিতা-হাজি সৈয়দ আবদুল বারী
দেওয়ান, ১৬৬, কেয়ার ফিলি রোড, হীথ, কার্ডিফ, গ্রেট ব্রিটেন। ৩১.
মনজু বেগম, পিতা-হরমুজ আলী, হাজিপাড়া, উত্তর বাজড়া, ঢাকা।
৩২. গোলাম মোস্তফা, হাজিপাড়া, উত্তর বাজড়া, ঢাকা। ৩৩.
অধ্যাপক আবদুল হালিম মিয়া, পিতা-মোজাফ্ফর হোসেন মিয়া,
ভেওয়ামারা, সিরাজগঞ্জ। ৩৪. ডা. শাহজাহান মৃধা, পিতা-আনোয়ার
হোসেন, দিঘিরপাড়া, পাতরাইল বাজার, ভাঙ্গা, ফরিদপুর। ৩৫. ইমাম
হোসেন দেওয়ান, চেয়ারম্যান, কেদারপুর ইউনিয়ন, নড়িয়া,
শরিয়তপুর। ৩৬. সালেহা খাতুন, পিতা-টান মিয়া মিয়াজী, কালীপুর
বাজার, মতলব উত্তর, চাঁদপুর। ৩৭. অধ্যাপক সিরাজউদ্দিন ভুঁইয়া,
পিতা-মফিজউদ্দিন ভুঁইয়া, চরসুজাপুর, কারারচর, শিবপুর, নরসিংদী।
৩৮. মো. আবু তাহের, পিতা-মো. আকাস আলী, ধন্যপুর,
বড়ইতলা, লক্ষ্মীপুর। ৩৯. সানজিদা আক্তার শোভা, পিতা-শাহাদাত
আলী ভুঁইয়া, মল্লিকপুর, আশারামপুর, রায়পুরা, নরসিংদী। ৪০.
মোফাজ্জল হোসেন তোফাজ্জল, পিতা-হুবদার খান, দক্ষিণ শিমুলিয়া,

মেঘুলা, দোহার, ঢাকা। ৪১. সাজ্জাদ হোসাইন নবাবুগ, পিতা-সালাহউদ্দিন, সল্লাবাদ, মনোহরদী, নরসিংদী। ৪২. আবদুল করিম, পিতা-আবদুল বারেক, সোনাকান্দা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা। ৪৩. অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান, পিতা-মো. চান মিয়া, চিকাদী, মনোহরদী, নরসিংদী। ৪৪. ফাইজুল ইসলাম লেনিন, পিতা-আবুল কালাম আজাদ, চাটখিল, নোয়াখালী। ৪৫. শাহিদা বেগম, স্বামী-আকরামুল ইসলাম, কুমায়গাড়ি, নওগাঁ। ৪৬. আবুল হোসেন, পিতা-নিজামউদ্দিন মল্লা, বিদুপাড়া, বগুড়া। ৪৭. আমজাদ হোসেন, পিতা-আবদুল মল্লাফ সারেং, মেদিনীমণ্ডল, লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ। ৪৮. ডা. মো.

সোহেল রানা, পিতা-আবদুল মালেক, খৈলসিদ্ধুর, ওয়ারসী পাইকপাড়া, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। ৪৯. ডা. আকরাম হোসেন, পিতা-আবদুল হাই, কারারচর, দক্ষিণ খান, শিবপুর, নরসিংদী। ৫০. আনোয়ারা বেগম, পিতা-খলিলুর রহমান, মৌগাছি, বানেশ্বর, চারঘাট, রাজশাহী ৫১. মো. শাহেদ মল্লা, পিতা-আবদুল বাসেত মল্লা, মল্লিকপুর, আশারামপুর, রায়পুরা, নরসিংদী। ৫২. ডা. আরমান মাহমুদ, পিতা-লাল মিয়া, নোয়াকান্দা, পলাশ, নরসিংদী। ৫৩. হারুন অর রশিদ, পিতা-হোসেন আলী, নোয়াকান্দা, পলাশ, নরসিংদী। ৫৪. সোফিয়া রুমী, পিতা-আতাউর রহমান, ছাতড়া, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

৫৫. মাসুদুর রহমান, পিতা-মো. হাবিবুর রহমান, পূর্ব নেপালপুর, আমাইড, পত্নীতলা, নগুগাঁ। ৫৬. মো. শামসুদ্দিন সরকার, পিতা-ইয়ার মো. সরকার, ৪৫০ পশ্চিম ভুরুলিয়া, ডুয়েট, গাজীপুর ১৭০০। ৫৭. শামসুদ্দিন ফকির, পিতা-রমজান ফকির, গুহলক্ষ্মীপুর, ফরিদপুর। ৫৮. রাজীবুল হক, পিতা-শাহাদাত আলী ভুঁইয়া, মল্লিকপুর, আশারামপুর, রায়পুরা, নরসিংদী। ৫৯. মো. জামাল হোসেন, পিতা-রমিজউদ্দিন, রঘুনাথপুর, ছালিয়াকান্দি, তিতাস, কুমিল্লা। ৬০. বাকেরুল মুজাহিদ সেলিম, পিতা-মুসলেমউদ্দিন, কাশিপুর, পাঁচপুকুরিয়া, তিতাস, কুমিল্লা। ৬১. আনোয়ার হোসেন, পিতা-আবুল কাশেম, দুর্গাপুর, ছালিয়াকান্দি, তিতাস, কুমিল্লা। ৬২. তাজুল ইসলাম কাজল, পিতা-বজলুর রহমান, বাকশীমুল, বুড়িচং, কুমিল্লা। ৬৩. ডা. ইব্রাহিম, পিতা-চান মিয়া, পলতি, মতইন, সেনবাগ, নোয়াখালী। ৬৪. ফরিদ শেখ, পিতা-আজাহার শেখ, নাখরাজ পাড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ। ৬৫. মিজা নূরে আলম তারা, পিতা-মিজা চুন্নু মিয়া, নিউ ইসলামপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ। ৬৬. নূর আলম বাদশা, পিতা-ফজলুল হক, চিকন্দী, চোট সন্দী, শরিয়তপুর। ৬৭. নাজমুল হক, পিতা-ফজলুল হক, ২০৫ আশকোনা, উত্তরা, ঢাকা। ৬৮. নিলুফার ইয়াসমিন, স্বামী-আজিজুল ইসলাম সরকার, টেসুরিয়া পাড়া, পাউলদিয়া, ইছাপুরা, সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জ। ৬৯.

অ্যাডভোকেট মীর্জা বাসিরউদ্দিন, পিতা-শাহেদ আলী মাস্টার,
দমদমা, মুগরাপাড়া, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ। ৭০. মো. রাজ,
পিতা-হাজি মো. তরিকুল্লাহ, আগানগর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৭১.
ইব্রাহিম খলিল, পিতা-মফিজউদ্দিন, নোয়াকান্দা, পলাশ, নরসিংদী।
৭২. ইসরাত হোসেন পারভীন, স্বামী-আব্দুল বুর হোসেন (শাহীন),
নাখড়াজ পাড়া টাঙ্গাইলবাবগঞ্জ। ৭৩. ফাহীম হোসেন, পিতা-মো.
জাক্কার হোসেন, নাখড়াজ পাড়া, টাঙ্গাইলবাবগঞ্জ। ৭৪. প্রফেসর
আবদুর রাজ্জাক, পিতা-ইয়াসিন ঢালী, ছোটসন্ধি, চিকনদী,
শরিয়তপুর। ৭৫. মহীউদ্দিন রাহেল, পিতা-আহম্মদ সোবহান, পশ্চিম
মহাদেবপুর, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম। ৭৬. জামাল হোসেন,
পিতা-রমিজউদ্দিন, রঘুনাথপুর, ছালিয়াকান্দি, তিতাস, কুমিল্লা। ৭৭.
আমজাদ হোসেন, পিতা-মো. মকবুল হোসেন, গোপালপুর, একদন্ত,
আটঘরিয়া, পাবনা। ৭৮. আবুল হাশেম, পিতা-হাজি মো. কদম
আলী, নোয়গাঁও, দক্ষিণ বাজার, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, ৭৯.
মকিবুল হক, পিতা-রহিমউদ্দিন খলিফা, থানাপাড়া, সারদা, চারঘাট,
রাজশাহী। ৮০. শাহাদাত আলী ভুঁইয়া, পিতা-মিন্নত আলী ভুঁইয়া,
মল্লিকপুর, আশারামপুর, রায়পুরা, নরসিংদী। ৮১. হুমায়ুন কবির,
পিতা-সফিজউদ্দিন, বাউলিয়া, চালিতালিয়া, গলাচিপা, পটুয়াখালী।
৮২. মো. সুজাত আলী খান, পিতা-সবদের আলী খান, দক্ষিণ

শিমুলিয়া, মেঘুলা, দোহার, ঢাকা। ৮৩. ওয়াজেদ আলী শাহ, পিতা-ওসিমউদ্দিন শাহ, তেলিপাড়া, নন্দনপুর, পুটিয়া, রাজশাহী। ৮৪. সিরাজুল ইসলাম, পিতা-আবদুল গণি মিয়া, হরিপুর, চাটমোহর, পাবনা। ৮৫. মো. আনোয়ার হোসেন ঢালী, পিতা- সফিউদ্দিন ঢালী, কালীপুর, মতলব, চাঁদপুর। ৮৬. রওশন হোসেন বাপ্পী, পিতা- আবদুর রাজ্জাক, লক্ষ্মীকুঞ্জ, বাড়ি-৫, রোড-৩৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২। ৮৭. লুৎফর রহমান বাবু, পিতা-মো. আলী ভুঁইয়া, গোপালপুর শর্ট রোড, ফরিদপুর। ৮৮. অলোক কুমার সরকার, পিতা-ঈশ্বর মাধব চন্দ্র সরকার, গুলশানপুর, ফরিদপুর। ৮৯. নজরুল ইসলাম নজর, পিতা-হাজি আফসার উদ্দিন, ১২ কাজী আব্দুর রউফ রোড, বোকনপুর, ঢাকা। ৯০. মোস্তফা খান আরমান, পিতা-রমজান বেপারী, কালীগঞ্জ, গুভাঢ্যা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৯১. খন্দকার মো. আলতাফ, পিতা-খন্দকার মুনসুর আলী, হ-৬৮/১ উত্তরবাড়ী, ঢাকা-১২১২। ৯২. মো. শামসুজ্জামান, পিতা-শমসের আলী, মোরারপাড়া, বক্শীগঞ্জ, জামালপুর। ৯৩. জহিরুল হক, পিতা-দুদু মিয়া, ভাওয়ারভিটি, আবদুল্লাহপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। ৯৪. মোসলেম উদ্দিন সরকার, পিতা- আমির আলী সরকার, ভগবানপুর, বাসুদেবপুর, পলাশবাড়ি, গাইবান্ধা। ৯৫. শফিকুল ইসলাম করিম, পিতা- ইয়ার আলী বিশ্বাস, পূর্ব আলীপুর, ফরিদপুর। ৯৬. জাহাঙ্গীর

আলম, পিতা-সোহরাব হোসেন, কুড়াতলী, খিলক্ষেত, ঢাকা। ৯৭.
নিলুফার ইয়াসমিন, পিতা-আবদুর রহিম, বিরাজনগর, শিবপুর,
নরসিংদী।

শাহ সুফি লকবপ্রাপ্তদের নামের তালিকা

সর্বনিম্ন একটানা চারমাস যারা মোরাকার ধ্যানসাধনা করেছেন
তাদের প্রত্যেকের নামের আগে শাহ সুফি পীর বাবা কেবলমাত্র কাবা
এবং নামের শেষে আল-সুরেশ্বরী লকব দেওয়া হয়েছে।

১. শাহ সুফি পীর বাবা কেবলমাত্র কাবা আজম শাহ আল সুরেশ্বরী,
পিতা-ইউসুফ আলী, গোয়াল চান্ট বাসস্ট্যান্ড, ফরিদপুর। ২. সৈয়দ
তারিক আল-সুরেশ্বরী, পিতা-সৈয়দ ওয়ারিস হোসেন, ১৭১, উত্তর
বাড্ডা, ঢাকা। ৩. ময়েজ উদ্দিন মো. আবদুর রশিদ আল-সুরেশ্বরী,
পিতা-আবদুল হাই, পশ্চিম ঘাটলা, বড়বাড়ি, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
৪. ডা. মোহাম্মদ আলী আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ফজর আলী মৌল্লা,
নিজুরী, রডাইত বাজার, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ৫. আনোয়ার মুসি
আল-সুরেশ্বরী, ডোলারহাট, চাপাই নবাবগঞ্জ। ৬. শাহ আলম মৌল্লা
রিপন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আবু হোসেন মৌল্লা, সদর রোড,
জয়পুরহাট। ৭. খোরশেদ আলম আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ইয়াকুব আলী

খান, রাজাম্বেহার, দেবিদ্বার, কুমিল্লা। ৮. কারী মো. সুলতান ওয়াদুদ আল-সুরেশ্বরী, পিতা-শেহের উদ্দিন চিশতী, ম্বেজডালাম, পবা, রাজশাহী। ৯. আলী হোসেন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-হাফেজ আলী বেপারী, পূর্ব লালপুর, কালীপুর বাজার, মতলব, চাঁদপুর। ১০. আবদুল গণি মাতব্বর আল-সুরেশ্বরী, পিতা-গগন মাতব্বর, খাম্মারপাড়া, বান্দবদৌলতপুর, মাদারীপুর। ১১. আবদুল কুদ্দুস কারী আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আজমত আলী, মোয়াইল, বোনকুয়া, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ১২. ইয়াকুব আলী শেখ আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ইউনুস আলী শেখ, বগাজান, বড়াইত, ভালুকা, ময়মনসিংহ। ১৩. জাহিদুল ইসলাম আল-সুরেশ্বরী, পিতা-নুরুল ইসলাম, ম্বেজডালাম, পবা, রাজশাহী। ১৪. মণ্ডলানা কাজি আফহার উদ্দিন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-কাজি বদরউদ্দিন, চাকুলিয়া, নগরকুণ্ডা, সাভার, ঢাকা। ১৫. ইসহাক মিয়া আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আবদুর রাজ্জাক মিয়া, বাউশিয়া, বাউশিয়া বাজার, গজারিয়া, মুন্সিগঞ্জ। ১৬. মণ্ডলানা আবুল বাশার আল-সুরেশ্বরী, পিতা-আবদুল কুদ্দুস, কালিয়ার ভাস্কা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ। ১৭. মমতাজ মাস্টার আল-সুরেশ্বরী, পিতা-হাজি মিয়াজান আলী, দুগাচী, দরগাতলা হাট, জয়পুরহাট। ১৮. আবুল হোসেন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-নিজাম উদ্দিন মোল্লা, বিদুপাড়া, রামেশ্বরপুর, বগুড়া। ১৯. নজরুল ইসলাম আল-সুরেশ্বরী,

ডোলারহাট, চাপাই নবাবগঞ্জ। ২০. আতাউর রহমান আল-সুরেশ্বরী, পিতা-সেফাতুল্লাহ প্রামাণিক, বালুবাজার, মাদ্রা, নওগাঁ। ২১. মোমেনজা খাতুন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ওয়াহিদ উদ্দিন মণ্ডল, দুগাচী, দরগাতলা, জয়পুরহাট। ২২. জুলহক আলী আল-সুরেশ্বরী, পিতা-হাজি আবদুস সাত্তার মণ্ডল, আঁচলগাতি, পূর্ব বংকিরাট, লাহিড়ী মোহনপুর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ। ২৩. নজিবুর রহমান আল-সুরেশ্বরী, পিতা-ইসা মাস্টার, কাহালুবাজার, কাহালু, বগুড়া। ২৪. মাস্তানা আনোয়ার হোসেন আল-সুরেশ্বরী, পিতা-মাফেল হাওলাদার, চরপুরসন্ধি, বাগদি, মোকসেদপুর, গোপালগঞ্জ। ২৫. আবদুল খালেক আল-সুরেশ্বরী, পিতা-মো. ইসহাক সর্দার, চরপুকুরিয়া, উদয়কাঠী, পিরোজপুর। ২৬. মো. শাহীনুর আহমদ চৌধুরী আল-সুরেশ্বরী, পিতা-সারাজ চৌধুরী, শ্মশানঘাট রোড, হবিগঞ্জ। ২৭. মো. মঈনউদ্দিন খান আল-সুরেশ্বরী, পিতা-মো. সিরাজ খান, কালিয়ারভাঙ্গা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ। ২৮. শ্রী প্রকাশ চন্দ্র রায় আল-সুরেশ্বরী, পিতা-জয়েন্দ্র নাথ রায়, গোহারা, ছাতনী, হাকিমপুর, দিনাজপুর। ২৯. মোহাম্মদ আলী আল-সুরেশ্বরী, পিতা-মো. আইউব আলী, হাকিমপুর, হাজিপুর, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। ৩০. বসিরউদ্দিন আল-সুরেশ্বরী, পিতা- আবদুল লতিফ মিয়া, বারঘরটোলা, জিনজিরা, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

